প্রাচীন ভারত

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

১৯১৪ সন।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্ম যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলিতে জয় পরাজয় শব সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগ যুক্ত চিতে
সর্ব্ব ফল স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ কবিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্ম বন্ধু অতিথি অনাথে;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুন্য কর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ, স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

রবি।

উপহার।

গিরীন্দ্র যাঁর মুকুট রূপে শিরে শোভা ধরে;
বারীন্দ্র যাঁর রাঙ্গা চরণ ধৌত সদা করে ;
বিন্ধ্য যাঁহার কটিভূষণ, গঙ্গা কণ্ঠমালা ;
ছয় ঋতু যাঁর পূজায় রত সাজায়ে ফুলের ডালা,
মলয় সদা চামর লয়ে ব্যজন করে যাঁয়,
শ্রীপদে যাঁর সোনার কমল লঙ্কা শোভা পায়।
কোটী কোটী সন্তানেরে লয়ে যিনি বুকে,
ক্ষুধার অন্ন তৃষার বারি যোগান সদা মুখে।
রূপে গুণে ধরাতলে তুলনা নাই যাঁর,
সেই মোদের এই ভারতমাতা, কর নমস্কার।

বিজ্ঞাপন।

১৯০২.খৃষ্টাব্দে সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উপদেশে বৈদেশিক পর্য্যটকদের বিবরণী অবলম্বনে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সময় হইতে সাহিত্য, প্রবাসী, আরতি, উপাসনা, সুপ্রভাত, দেবালয় প্রভৃতি মাসিক কাগজে তৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণ এই সমস্ত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রাচীন ভারত নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। একাদশ বৎসর পূর্ব্বে যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম তাহা অদ্য পরিসমাপ্ত হইল। ঈদৃশ কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত ক্ষমতার অভাব বশতঃ বহু ত্রুটী সংঘটিত হইয়াছে; তজ্জন্য সাহিত্য সমাজে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পাঠক পাঠিকাগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে প্রাচীন ভারতের মহত্ত্ব এবং মহিমা উপলব্ধি করিলেই সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। সুমতি-সম্পাদক পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এই গ্রন্থের সমস্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িত। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। উপহারে যে পদ্যটী দেওয়া হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "ছবি ও কবিতা" হইতে উদ্ধৃত।

টাঙ্গাইল।
১৫ই জুন, ১৯১৪ সন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সূচীপত্র।

ভারত মহিমা।

গ্রীক লিখিত ভারত বিবরণ।

হিরোডোটস।

(৮৫—৯১)

গ্রীক লিখিত প্রথম বিবরণী—ভারতবর্ষের রাজস্ব—ভারতের নানা জাতি ও ভাষা—ভারতীয়গণ কর্তৃক স্বর্ণ সংগ্রহ—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা—সিন্ধু নদ।

টিসিয়াস।

(৯১—৯৬)

পারস্থ দরবারে টিসিয়াস—টিসিয়াসের ইতিহাস—টিসিয়াসের ইতিহাসে ভারত তত্ত্ব—ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থা—কৃষ্ণত্ব, আয়ু ও শিকার কাহিনী—পশ্চিম ভারতের রাজশক্তি—আর্য্য ও অনার্য্য।

আলেকজণ্ডারীয় যুগ।

(৯০—১০৮)

আলেকজণ্ডারের ভারত অভিযান—আলেকজণ্ডারের সহচর লেখকগণ—ভারতীয়গণের শৌর্য্য বীর্য্য—মহারাজ পুরু—রণ সজ্জা—ভারত বাসীর স্বজাতি প্রেম—ভারতে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী—ভারতীয় রাজন্যবর্গ—বসন ভূষণ—সৌন্দর্য্যানুরাগ—জ্ঞান স্পৃহা—সতীদাহ—সময় গণনা—এরিয়ান।

মেগাস্থিনিস।

(১০৮—১৩১)

গ্রীক ইথিওপিয়া—ভারতবর্ষের সহিত গ্রীক জাতির পরিচয়—মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা—জীব জন্তু—শস্য ও ধাতু—ভারতবর্ষের উৎকর্ষতা—আচার ব্যবহার ইত্যাদি—পোষাক পরিচ্ছদ বিবাহের উদ্দেশ্য—রাজশরীর রক্ষয়িত্রী নারী, রাজার আচার ব্যবহার—বিচার, মৃগয়া কুসীদ, অপরাধীর দণ্ড—বিদেশীয়দের প্রতি রাজানুগ্রহ—রাজকার্য্য বিভাগ, রাজকর, শুল্ক—সৈন্য বিভাগ—বর্ণ ভেদ, সপ্তজাতি—দার্শনিক—কৃষক শ্রেণী—পশুপালক—শিল্প ব্যবসায়ী—যুদ্ধ ব্যবসায়ী—পরিদর্শক—মন্ত্রি মণ্ডলী—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ—স্ত্রী শিক্ষা—ইহকাল ও পরকাল—দার্শনিক অভিমত—ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের আচার ব্যবহার—শ্রমণগণের শ্রেণী বিভাগ—বুদ্ধদেব—আত্মহত্যা—পাটলীপুত্র—নদ নদী।

প্লিনি।

(১৩১—১৩৮)

প্লিনি—গ্রীক সংগ্রহ, গ্রীক বিবরণী—ভারত বাণিজ্য—পশু পক্ষী—ভারতবাসী—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বৃক্ষ ও শস্য।

ভারত বাণিজ্য।

(১৩৯—১৪৫)

অজ্ঞাতনামা লেখক—বাণিজ্য পথ—আমদানী রপ্তানীর তালিকা—বাণিজ্য বন্দর—দক্ষিণ দেশ—অজ্ঞাতনামা লেখকের বিবরণের অসম্পূর্ণতা—রাজ ভবনে বিলাসিতা।

ষ্ট্রাবো।

(১৪৫—১৬৩)

ষ্ট্রাবোর ভূগোল বৃত্তান্ত—ষ্ট্রাবোর ভূগোলের ভূমিকা—প্রাকৃতিক বিবরণ—ভারতবর্ষের নগর ও প্রদেশ সকলের বিবরণ—মগধ রাজ্যের বিবরণ—ভারতবাসীর আচার ব্যবহার—সুরাপান—ভারতবাসীর কষ্ট সহিষ্ণুতা—সাধুর বিবরণ—প্রকৃতিপুঞ্জের আচার ব্যবহার—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ—ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য।

টলেমি।

(১৬৪—১৭৪)

টলেমির ভূগোল বৃত্তান্ত—ভারতবর্ষের সীমা নির্দ্দেশ—গুজরাট—মহারাষ্ট্র—পশ্চিম উপকূল—কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ স্থান—উড়িষ্যা—গঙ্গানদী—কাশ্মীর—উত্তর ভারত—নাসিক—মগধ রাজ্য—বঙ্গদেশ—রাজবংশ ও রাজ্য সমূহের বিবরণ।

বৈদেশিক সাহিত্যে ভারতবর্ষ।

(১৭৫—১৮৫)

ডিওন—ডিওনের ভারত বিবরণ—বার্দিসানেস, ব্রাহ্মণ চিত্র—ক্লিমেনেস এবং প্যালডিয়াস—ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের পারলৌকিক বিশ্বাস—ধর্ম্ম বিশ্বাস, মূর্ত্তি পূজা—চতুর্ব্বর্ণ: বিদেশগামী ভারত বণিক—কসমস, ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিবরণ—ধর্ম্ম বিষয়ে রাজন্যবৃন্দের উদারতা, খৃষ্ট ধর্ম্ম—জোহানেস ষ্টোবস, বিচার প্রণালী।

মগধ সাম্রাজ্য।

দুইটি রাজ্য।

বঙ্গদেশ।

উড়িষ্যা ও গঞ্জাম।

দক্ষিণ ভারত।

বোধিসত্ত্ব—মালকূট—মালকূট সঙ্ঘারাম, মহেন্দ্র—চন্দন বৃক্ষ—গোতলক পর্ব্বত—কঙ্কন—মহারাষ্ট্র—মহারাজ পুলকেশী—ধর্ম্মবিশ্বাস—অজন্তা গুহা—ভরু-কচ্ছ—মালবদেশ—মালববাসীর জ্ঞানানুরাগ—মহারাজ শিলাদিত্য—পণ্ডিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—বল্লভী রাজ্য—ধ্রুবপদ রাজা—সৌরাষ্ট্র—গুর্জ্জর দেশ—উজ্জয়িনী।

সিন্ধুদেশ।

(৩১১—৩১৩)

আর্য্য ও অনার্য্য মিশ্রণ—সিন্ধুদেশ—লোক চরিত্র—সিন্ধুরাজ—একটি জাতির বিবরণ।

ভারতীয় সভ্যতা।

(৩১৩—৩৩২)

ব্রাহ্মণ ভূমি—চতুঃসীমা, আয়তন—সময় গণনা, ঋতু ইত্যাদি—নগর ও পল্লী—সঙ্ঘারাম—আসন বসন ভূষণ—পরিচ্ছন্নতা—লেখা, ভাষা, পুস্তক, বেদ, অধ্যয়ন—বৌদ্ধমত, বৌদ্ধশাস্ত্র—জাতি, বিবাহ—রাজ পরিবার, সৈন্য, অস্ত্র শস্ত্র—আচার ব্যবহার, বিচার প্রণালী ইত্যাদি শিষ্টাচার ঔষধ, মৃত দেহের সৎকার—শাসন কার্য্য—বৃক্ষাদি, কৃষি, খাদ্য, পানীয়, পাক প্রণালী।

আই-ত সিঙ্গ।

(৩৩৩—৩৪৭)

আই-ত সিঙ্গের ভারত যাত্রা—তাম্রলিপ্তিতে আই-ত সিঙ্গ—দস্যু হস্তে আই-ত সিঙ্গ—তীর্থ পর্য্যটন, স্বদেশ যাত্রা—অবশিষ্ট জীবন—ভারত বিবরণী ভারতবর্ষ—ফল শস্য ইত্যাদি—জলাশয়—স্নান—চিকিৎসা শাস্ত্র, স্বাস্থ্য ইত্যাদি—পোষাক পরিচ্ছদ—ছত্র—ভোজনপাত্র—ব্রাহ্মণ—আত্মহত্যা—বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা—বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতা—বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও কৃষি—সঙ্ঘারাম—বৌদ্ধ ভোজ—বৌদ্ধ উপাধ্যায়—নালন্দা বিহার।

আরব্য বিবরণী।

(৩৪৭—৩৫৯)

ভারত ইতিহাসের তিন বিভাগ—আরব্য বিবরণী—ছয় জন লেখক—সোলেমান—ইবন খুরদতবা—অলমস্‌দি—অল ইস্তখিরি—ইবন হোকল—অল ইদ্রিসি—ভারতবর্ষ, অনন্ত সাধারণত্ব—রাঘমণ্ডল—বল্লার—জুরজ—তাফন—রুমি—কাসবিন

অল বেরুনী।

উপসংহার।

সংশোধন পত্র।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৬	আনমান্‌সুরের	আলমানসুরের
২১	১২	মানই	মালই
২২	২১	পজাব	পঞ্জাব
২৯	১০	হিন্দুদেশে	সিন্ধুদেশে
৩৬	২	আমাদের	অশোকের
৩৯	১৩	বাল্ক	ব্যাকট্রিয়া অর্থাৎ বাল্ক
৫৪	১৯	লঙ্কা	লাভকস
১০৪	১৫	কুন্তল	কুণ্ডল
১০৫	৮	তৎকালে	তৎফলে
১০৭	১	করিতেন	করিবেন
১০৮	৪	জয় স্ত্রী	জয়শ্রী
ঐ	৬	ভোজী	ভোজী,
১১২	২৪	আমাদের	তাহাদের
১১৬	২২	কোন	কেবল
১৪৭	১০	লেয়ার কক	নিয়ার কস
১৬৬	৩	সঞ্জয়	সঞ্জন
ঐ	১৪	অন্ধ	অন্ধ্র
১৬৭	১০	মৌছিরিস	মৌজরিস
১৬৯	১৭	সিউদস্তমল	সিউদস্তমন
ঐ	২২	শ্রামণ	গ্রামন
১৯২	৫	সমূহে	সমূহ
১৯৭	১১	নৈরঞ্জন	নৈরঞ্জনা

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৫	৮	অপকীর্ত্তি	অমলকীর্ত্তি
২৫৪	ফুট নোট	শক্রস্থানে বন্দিনী	শত্রুহস্তে বন্দী
২৭০	১৯	এত	শত
৩০৯	১৩	দ্রুবপদ	ধ্রুবপদ
৩১১	৯	উপবিষ্ট	উপনিবেশিত
৩১৯	১৯	উদ্দেশ্য	তাহা উদ্দেশ্য
৪০২	২২	বান্ধ	বাল্ক
৪০৩	২৩	কোঙ্কন	কঙ্কন

এতদ্ব্যতীত অনেক ভুল আছে, কিন্তু অর্থ পরিগ্রহে অসুবিধা হইবে না বলিয়া এই সংশোধন পত্রে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা হইল না।

বৌদ্ধতীর্থ নামক নিবন্ধে [ ] এই চিহ্নের অন্তর্গত অংশ হিউ-এন্‌থ্‌ সঙ্গের গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই।

যে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে,

তৎসমুদয়ের নাম।

Hindu Civilisation under the British Rule (P. N. Bose)
Ancient India (R. C. Dutt)
Indo Aryans (Rajendra Lal Mitra)
Prosperous British India (Digby)
History of India (Elphinstone)
India, what can it teach us? (Maxmuller)
Hindu Superiority (Harbilas Sadra)
History of India, Vol I (Beveridge)
Chips from a German Workshop (Max muller)
India as known to Ancient & Mediæval Europe (Prafulla Chandra Ghosh)
Indian Shipping and Maritime Activity (Radha Kumud Mukerjee)
History of India (Har Prasad Sastri)
Full Report of the Proceedings at a Public Meeting on the question of Sea Voyage, 1892
Life of Asoka (Vincent. A. Smith)
The Civilisation of the East (Temple Primer Series)
Beeton's Dictionary,
Indian Review, 1910.
Sanskrit Literature (Macdonell)
The Dawn Magazine, 1910
Ancient India (Vincent. A Smith)
The Life of Buddha (Rock Hill)
Indian Wisdom (M M Williams)
Journal of the Buddhist Text Society.
Buddhism as a Religion (Hackmann)
Chinese Buddhism (Edkins)
Religion in China (Edkins)
Buddhist India (Rhys David)
Selections from the Calcutta Review
Buddhism (Rhys David)
Manual of Buddhism (H Kern)
Buddhist Sermons (B H Oung)
Travels of the Buddhist Pilgrims (S. Beal)
Buddhist Record of the Western World (S. Beal)
Ancient Geography (Cunningham)
I—Tsing (Thakakusu)
Ancient India. Its Invasion by Alexander the Great. (McCrindle)
Commerce and Navigation of the Erthyrean Sea (Mc Crindle)
Ancient India as described by KTesias (Mc Crindle)

Ancient India as described by Magasthenes & Arrian (Mc Crindle)
Ancient India as described in Classical Literature.
Alberuni (English Translation)
History of India Vol I (Elliot)
মনুসংহিতা (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়)
হিন্দুশাস্ত্র (রমেশচন্দ্র দত্ত)
প্রদীপ, ২য় খণ্ড। নব্যভারত (১৩শ খণ্ড)
বাল্মিকী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত (প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
নানা প্রবন্ধ (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) জাহ্নবী পত্রিকা।
গম্ভীরা (হরিদাস পালিত)
অশোক চরিত (কৃষ্ণ বিহারী সেন)
রামায়ণ (বর্দ্ধমান রাজবাটী)
মহাভারত (প্রতাপচন্দ্র রায়)
নব্য রসায়ন (ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়)
ভারতবর্ষের ইতিহাস (রজনীকান্ত গুপ্ত)
ভারতবর্ষের ইতিহাস (মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী)
ভারতবর্ষের ইতিহাস (রমেশচন্দ্র দত্ত)
বৌদ্ধ-ধর্ম্ম (সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর)
বুদ্ধচরিত (কৃষ্ণকুমার মিত্র)
বিবিধ প্রবন্ধ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
প্রবাসী, ৭ম ভাগ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪।
ভারতী, ১৩১৬।
হিন্দু জাতির বাণিজ্য বিস্তার ও সমুদ্র যাত্রা (অক্ষয় কুমার দত্ত)
মহাপর্ব্বর নির্ব্বাণ সূত্র (ব্রজগোপাল নিয়োগী)
প্রবন্ধ মঞ্জরী (রজনীকান্ত গুপ্ত) বিভা (১ম খণ্ড)
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (অক্ষয়কুমার দত্ত)

প্রাচীন ভারত
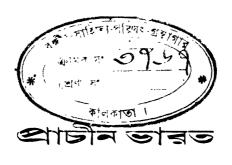
ভারত-মহিমা

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে,
জ্ঞানধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী।

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

আদিম কালে ভারতীয় আর্য্যগণ বিস্ময়-মুগ্ধ নেত্রে প্রাকৃতিক লীলা দর্শন করিতেন; তৎসমুদায়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারা সর্ব্বত্র চৈতন্যময় এবং ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা অনুভব করিতে সমর্থ হন। তাহারা মনুষ্যের মঙ্গলকর প্রাকৃতিক অধিষ্ঠাতৃগণকে দেব নাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের উপাসক হইয়াছিলেন। ঋষিগণ উপাস্য দেবতার স্তোত্রাদি রচনা পূর্ব্বক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষা প্রদান করিতেন। পরবর্ত্তী কালে ঐ সমুদয় স্তোত্রাদি সঙ্কলিত হইয়া ঋগ্বেদ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদই পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ, তাহাতে ভারতের আদি সভ্যতার চিত্র প্রতিফলিত আছে। ঋগ্বেদের

স্তোত্রাদি কোন সময় রচিত এবং তারপর কোন সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় রূপে নির্ণয় করা সম্ভব পর নহে। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ সঙ্কলিত এবং তাহার বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ফলতঃ ভারতীয় সভ্যতা অতীব পুরাতন বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ভারত মহিমা

ভারতের অতীত গৌরব তিমির রাশিতে আচ্ছন্ন। সেই অন্ধকারে বর্ত্তিকা হস্তে প্রবেশ করিলে পরিদৃষ্ট হয় যে, সমগ্র পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যতার উৎসস্থলে ভারতবর্ষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইউরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্গণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পুরাকালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধর্ম্ম ও জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

আধুনিক সভ্যতা

বর্ত্তমান কালে ইউরোপ এবং আমেরিকার সভ্যতা অতি উজ্জ্বল। নবোদিত জাপানও দ্রুতবেগে সভ্যতালোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার নামান্তর মাত্র। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন ও কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করে। বহু শতাব্দী ধরিয়া চীন ও জাপানের সভ্যতা এক সূত্রে গাথা ছিল; চীন জাপানকে সকল বিষয়ে অনুপ্রাণিত করিত। এখন জাপান পাশ্চাত্য জাতি সমূহের সংস্রবে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ব্বগুরু চীনকে পশ্চাতে ফেলিয়া "ধরাতল ভারতিয়া" সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছে। কিন্তু প্রায় সার্দ্ধ এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন, জাপানে যে ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান জাপানী সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে।

ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের আধুনিক সভ্যতার প্রখর দীপ্তির সম্মুখে প্রাচীন সভ্যতা নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুরাকালে হিন্দু, মৈশরিক, গ্রীক, ইহুদ, ব্যাবিলোনিয়ান, ফিনিসিয়ান, পারসীক, এসিরিয়ান, রোমক, চীন প্রভৃতি জাতি সভ্য পদবীতে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন সভ্যতা

চীন বহুকালের সভ্যদেশ; অন্যূন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীনের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের যে বিবরণ বিদ্যমান আছে, তাহাতে জানা যায় যে, তৎকালে চীনের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। দুর্ভিক্ষ, শঠতা, নরহত্যা প্রভৃতি সমাজকে বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাদৃশ দুঃসময়ে মহাতেজা কংফুচের অভ্যুদয় হয়। তিনি স্বদেশের মঙ্গল কামনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া নীতি-তত্ত্ব ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সাধনায় চীন সুসংস্কৃত হইয়া উঠে। কংফুচ দার্শনিক তত্ত্বের উপর পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জনসাধারণ দার্শনিক-তত্ত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম এবং অনুসরণ করিতে অসমর্থ বলিয়া কংফুচ-প্রচারিত গভীর উপদেশ সমূহ চীনবাসীদের মধ্যে অক্ষুণ্ণভাবে কাজ করিতে পারে নাই। তাঁহার তিরোভাবের পর চৈনিক সমাজ আবার বিকৃতাঙ্গ হইয়া পড়ে। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে উপনীত হইয়া সে দেশবাসীদের মানসিক বৃত্তিসকল পুনর্ব্বার সংস্কৃত করিয়া তোলে; তাহার ফলে ধর্ম্মনীতি ও জ্ঞানের প্রভাব প্রতিষ্ঠালাভ করে। অদ্যাপি কংফুচীয় মতের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে বদ্ধমূল রহিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কেবল চীন নহে, মঙ্গোলিয়া

চৈনিক সভ্যতা

জাতি-অধ্যুষিত দেশমাত্রেই বৌদ্ধধর্ম সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। জাপানের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ম্মা, শ্যাম, মধ্যএসিয়া, নেপাল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেশে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহাই সমগ্র মঙ্গোলিয়া জাতির সভ্যতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ব্যাবিলোনিয়ান, ফিনিসিয়ান, এসিরিয়ান প্রভৃতি জাতির সভ্যতা অতীব পুরাতন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহাদের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষাও পুরাতন। এই সকল জাতির সহিত পুরাকালে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল, এই কারণ তাহাদের সহিত ভারতবাসী আর্য্যগণের ভাবের আদান প্রদান চলিত। ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষেই মানবজাতির মানসিক বৃত্তি সমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। ঈদৃশ মানসিক বলসম্পন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ব্যাবিলোনিয়ান, ফিনিসিয়ান, এসিরিয়ান প্রভৃতি জাতি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ বশতঃ উৎকৃষ্টতর জাতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তীক্ষ্ণদর্শী পুরাতত্ত্ববিদ রেনান নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার জন্য সিরিয়া ও ব্যাবিলন দেশে গমন করিতেন। বস্তুতঃ ব্যাবিলন এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। *

ব্যাবিলন প্রভৃতি

* ব্যাবিলনে ভারতীয় প্রভাব বিষয়ক বিবরণ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে দ্রষ্টব্য।)

ব্যাবিলিয়ান এবং এসিরিয়ান সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। নানাবিধ সূর্য্য প্রতিমা ও সূর্য্য পূজার প্রাধান্যই ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। ঋগ্বেদে ব্যাবিলনের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ দেশে ভারতীয় প্রভাব বিস্তারের আনুষঙ্গিক প্রমাণও বিদ্যমান আছে। জর্ম্মনতত্ত্ববিদ হিউগো বিনক্লার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ফলকে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সময় হইতে ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে হিতাইত পতি সুবিব লিউম এবং মিতনি-পতি জস্তিউ অজ নামক ব্যাবিলনের দুই নৃপতির মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধির প্রসঙ্গে মিতনিপতির উপাস্য দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে।

পারস্য দেশের সঙ্গেও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত ছিল

পারসীক সভ্যতা

হিন্দুগণ তরবারি হস্তেও পারস্য দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই কারণ, আমরা পারস্য দেশে হিন্দু-সভ্যতার অনেক চিহ্ন দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ ও পারসীকের ধর্ম্মনীতি ও আচার ব্যবহারের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর বেদ ও পারসীকের আবেস্তা, এই দুই গ্রন্থের দেবতার নাম, শৌর্য্যবীর্য্যের গাথা, বলীদান ক্রিয়া, গার্হস্থ্য পদ্ধতি এবং ধর্ম্মচর্য্যা সম্পর্কীয় নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়া হগসাহেব লিখিয়াছেন, বেদ এবং আবেস্তার পুরাতন অংশে এরূপ অনেক কথা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এক দল লোক বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া উঠে এবং এই দলের প্রভাব পারসীক ধর্ম্মের গঠন কালে কার্য্যকর হয়। কোন সময়ে আবেস্তার ধর্ম্ম গঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। তবে এই মাত্র নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, পারসীক ধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে ভারত-বর্ষে সর্ব্বদেবতার উপরে ইন্দ্রের প্রাধান্য ছিল।

হিরোডোটস বলিয়াছেন যে, পারসীকগণ সূর্য্যের পূজা করিত। প্রাচীন ইন্দোসিথিক মুদ্রাতেও মিথ্রদেবের মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। বেদে মিত্র ও বরুণ নামে দুইটি দেবতার বিষয় লিখিত আছে; এই দুই দেবতার নাম মিত্রাবরুণ বলিয়া একত্র সমাহৃত হইয়াছে এবং এই উভয় দেবতার উদ্দেশে যুগপৎ বহুসংখ্যক সূক্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আবেস্তা শাস্ত্রে ও অর্তক্ষত্র নামক পারসীক নরপতির শিলারূপা শিলালিপিতে এবং হিরোডোটস ও প্লুটার্ক প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে পূর্ব্বতন পারসীকেরা মিথ্র নামক দেব বিশেষের উপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মিথ্র শব্দের অর্থ সূর্য্য ও বন্ধু। সংস্কৃত মিত্র শব্দেরও ঐ উভয় অর্থই প্রসিদ্ধ আছে। মিথ্র দেবতা অবনী মণ্ডলের সমুদয় অংশেই আলোক আনয়ন করেন। অতএব তিনিও সূর্য্যদেব বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।

একজন চিন্তাশীল লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার মূলে গ্রীক নাই, তাহা ইউরোপে অগ্রাহ্য। রোমক-সভ্যতা গ্রীক-সভ্যতা হইতে উদ্ভূত; তারপর গ্রীক ও রোমক-সভ্যতার অনুকরণে সমগ্র ইউরোপের সভ্যতা গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সভ্যতার গঠনকালে ইউরোপ ইহুদি-জাতির নিকটও ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপ ইহুদি-জাতির নিকট হইতে ধর্ম্ম, গ্রীক-জাতির নিকট হইতে দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা এবং রোমক জাতির নিকট হইতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আপন সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করেন।

ইউরোপীয় সভ্যতা

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নানা সৌসাদৃশ্য (*) বিস্ময়কর; ইহাও স্বীকার্য্য যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অন্ততঃ ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বৌদ্ধ-প্রভাব আরোপ করিবার পূর্ব্বে ইহুদিজাতি-অধ্যুষিত দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম উপনীত

খৃষ্ট ধর্ম্ম

(*) এই সৌসাদৃশ্যের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত-প্রণীত Ancient India নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

হইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিকাশ-সম্পর্কে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। আমরা তাদৃশ প্রমাণ পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মিশর হইতে মূল রস আকর্ষণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইবার বহুপূর্ব্বে মিশরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের জন্মস্থান প্যালেষ্টাইন্ বা সিরিয়াতেও বৌদ্ধধর্ম্মের কীর্ত্তি স্থাপিত ছিল। তদ্ব্যতীত ইউরোপীয় সভ্যতার আদিভূমি গ্রীসদেশেও বৌদ্ধ-প্রচারকগণ স্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইউরোপ ও আফ্রিকার সন্ধিস্থল আলেকজেণ্ড্রিয়ানগরীতে গ্রীক-দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনুশীলন হইত। তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে মিশরে বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধনীতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রও মিশরদেশে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এমোনিয়াস নামক একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত নিউপ্লাটানিক্ নামে এক নূতন দর্শনশাস্ত্রের প্রচার করেন। এমোনিয়াস মিশরদেশের রাজধানী আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তদীয় দর্শনশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব ভারতবর্ষের হিন্দু-দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বস্তুত প্রথম তিন শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্মের অঙ্গে গ্রীক, বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভারতের বৌদ্ধ ও আর্য্য-ধর্ম্মের নিকট ঋণী।

অতি প্রাচীনকালে নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণ শিক্ষার্থীর বেশে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন, এবং বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন। (ডাঃ এনফিল্ড প্রদর্শন করিয়াছেন, পিথাগোরাস, এনাক্সারকাস, পিরো প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রথম অবস্থায় ভারতবর্ষে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সকল দর্শনশাস্ত্রকর্ত্তা পরবর্ত্তী কালে যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের অনেকাংশ পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।) ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তা প্রসূত তত্ত্ব সকল সূর্য্য কিরণের ন্যায় "দীপ্তিপূর্ণ জ্যোতি রেখা"। স্লিগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক স্বীকার করিয়াছেন যে, দার্শনিক প্রতিভার প্রতিপত্তিতে

গ্রীক জ্যোতিষ্কগণ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবেত্তৃগণের নিকট হীনপ্রভ। সুতরাং ঐ সকল গ্রীক পণ্ডিতের চিন্তা প্রণালী তাঁহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। ফলতঃ হিন্দু ও গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। খ্যাতনামা কোলব্রোক সাহেব লিখিয়াছেন যে, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে হিন্দুজাতি ঋণ দান করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন নাই। একজন ফরাসী লেখক লিখিয়াছেন, প্রখ্যাত গ্রীক-লেখকগণের উদ্ঘাটিত তত্ত্বাবলীর প্রত্যেক অনুক্রমে হিন্দুদর্শনের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বারা যথেষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ সকল লেখক প্রাচ্যশাস্ত্রের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের অনেকে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া একেবারে প্রাচ্যবিদ্যার উৎসস্থল ভারতবর্ষের শাস্ত্রদ্বারা আপনাদের অভিমত সমূহ গঠন করিয়াছিলেন। চিরখ্যাত গ্রীক-পণ্ডিত পিথাগোরাস্ ভারতবর্ষে জ্ঞানান্বেষণে উপনীত হন এবং এদেশেই আর্য্য-ঋষিগণ-কর্তৃক উদ্ঘাটিত পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

গ্রীক দর্শন শাস্ত্র

দর্শন বা মনোবিদ্যার পরেই বিজ্ঞান শাস্ত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান, সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপাদান। রসায়ন-বিদ্যা বিজ্ঞানের প্রধান অংশ এবং সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে উহার প্রয়োজন গুরুতর। "এই রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় Chemistry বা রসায়ন Alchemy হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু Alchemy নামটী আরবী; ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, আরবদিগের নিকট হইতে ইউরোপবাসিগণ রসায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক ও সুশ্রুত এদেশের প্রধান চিকিৎসা গ্রন্থ। আরবেরা বিদ্যা

বিজ্ঞান শাস্ত্র

শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল মধ্যে চরক ও সুশ্রুত অনুবাদ করিয়া লন; এবং প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসিদিগের নিকট আপনাদিগের ঋণ স্বীকার করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত খলিফা হারুন-অল্-রসিদের সভায় দুই জন হিন্দু চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এল্‌-ফিন্-ষ্টোন সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, তাঁহারা গান্ধকিক অম্ল, যাবক্ষারিক অম্ল ও লাবণিক অম্ল, তাম্র, লৌহ, সীসক, রাং এবং দস্তার অম্লজানজ ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুৎপন্ন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। এই পদার্থ গুলির মধ্যে গান্ধকিক অম্লকে হিন্দুরা মহাদ্রাবক নাম দিয়াছেন এবং এ নামটী কেমন যুক্তি সঙ্গত, ডাক্তার রয়ালের লিখিত কয়েক পংক্তির নিম্নস্থ অনুবাদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে; "এই দ্রাবকের সহায্যে আমরা যাবক্ষারিক, লাবণিক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমরা শস্তায় সোডা হরিতকাদি উৎপাদন করিতে পারি। ইহা রঙ্গকরের প্রক্রিয়ায় আবশ্যক এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল কুনাইন্ প্রভৃতি মহৌষধি পাইতেছি। বস্তুতঃ যে সময়ে ইউরোপে অল্পব্যয়ে গান্ধকিক অম্ল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজাত সম্বন্ধে ইউরোপের মহত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে"। (১)

রসায়নের ন্যায় গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। বস্তুতঃ গণিত বিষয়েও ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিক্ষা দান করিয়াছেন।

---

(১) ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

আর্য্যঋষিগণ ধর্ম্মগত প্রাণ ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা তদ্গত চিত্তে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তদুপলক্ষেই নানা বিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যজ্ঞ-বেদী নির্ম্মাণ প্রণালী হইতে জ্যামিতি বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নানা প্রকার যজ্ঞ বেদীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ; জ্যামিতিক জ্ঞান ব্যতীত এই সকল যজ্ঞ বেদীর নির্ম্মাণ সম্ভবপর নহে। ফলতঃ, নানা আকার বিশিষ্ট যজ্ঞ-বেদীর নির্ম্মাণ-কৌশল জ্যামিতি বিদ্যার জন্ম প্রদান করে। ডাক্তার থিবয়ট লিখিয়াছেন, দুই বা ততোধিক বর্গ-ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তারপর সেই সকল বর্গ ক্ষেত্রের পরিমাণ ফলের সমান আর একটী বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে হইত। আবার কোন কোন স্থলে দুইটী বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তারপর তাহাদের পরিমাণ ফলের পার্থক্যের সমান আর একটী বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে হইত। কখন কখন বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে এবং আয়তক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইত। তদ্ব্যতীত বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের পরিমাণ ফলের সমান ত্রিভুজক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে হইত ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। কখন কখন এরূপ বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইত, যাহার ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের পরিমাণ ফলের সমান থাকিত। ঈদৃশ বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র এবং বৃত্তঅঙ্কনের ফলে কতক-গুলি জ্যামিতিক নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। এই সকল নিয়ম কল্পসূত্রে লিখিত রহিয়াছে। এই কল্পসূত্র খৃষ্টের জন্মের আট শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস্ ভারতবর্ষ হইতে জ্যামিতি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান দেখা যায়। জ্যামিতি শাস্ত্র ভারতবর্ষেই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। এইক্ষণে অন্যান্য গণিতশাস্ত্রে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়

জ্যামিতি বিদ্যা

পাটীগণিত

তাহা আমরা দেখাইতেছি। এইক্ষণ অধিকাংশ সভ্য জনপদে "যে সংখ্যা লিখন-প্রণালী চলিতেছে ভারতবর্ষই তাহার উৎপত্তি। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদয় সংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। ইউরোপবাসিগণ আরব বাসিদিগের নিকট পাটী-গণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। * * * বাহাউলদিন (একজন আরব-গ্রন্থকার) ভারতবাসিদিগকে দশগুণোত্তর প্রণালীর অঙ্কগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন। ভারতবাসীরা যে এই অঙ্কগুলির স্রষ্টা, ইহার প্রমাণ একখণ্ড আরবী কবিতাবলীর প্রস্তাবনা হইতে সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে, এজন্য বলা ভাল যে, সমুদয় আরবী ও পারসি পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাসিদিগকে স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ আছে।

কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসিদিগের সৃষ্টি।

বীজগণিত

বর্ত্তমান ইউরোপবাসীরা বীজগণিত মুসলমানদিগের নিকট পাইয়াছেন। * * * সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন মোহাম্মদ বেন মুসা আরবদিগের মধ্যে প্রথম বীজগণিত প্রকাশ করেন বলিয়া পরিচিত। তিনি আনমানসুরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন।" (১) ৭৪৯ হইতে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আনমানসুরের রাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের জন্ম; ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের মৃত্যু; এবং ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম। সুতরাং যে সময়ে আরবেরা প্রথম বীজগণিত প্রচার করিলেন, সে সময়ে এদেশে বীজগণিতের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, এবং আরব দেশের প্রথম বীজগণিত প্রচারকর্ত্তা ভারতবর্ষের সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

(১) ৺রাজ কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জ্যোতিষ শাস্ত্র

গণিতশাস্ত্রের অন্যতম শাখা জ্যামিতির ন্যায় জ্যোতিষ শাস্ত্রও আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মচর্য্যা উপলক্ষে সৃষ্ট হইয়াছিল। ডাক্তার থিবয়ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যজ্ঞে বলীদানের জন্য ঠিক সময় নির্দ্ধারণ জন্য নিয়ম উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই আর্য্যঋষিগণ জ্যোতিষ বিষয়ক পর্য্যবেক্ষণের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ঐ নিয়ম উদ্ভাবন জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহারা নক্ষত্রমালার মধ্য দিয়া চন্দ্রের গতি অবলোকন করিতেন। তদ্ব্যতীত সূর্য্যের পর্য্যায়গত গতি পরিদর্শন জন্যও একাগ্রচিত্তে নিরত থাকিতেন। (১)

ভারতীয় বর্ণমালা

"ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত, রসায়ন প্রভৃতি সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটী বর্ণমালা আছে। চীনদেশীয়, ফিনিসীয় এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় বর্ণমালা চীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা য়িহুদী, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব্বউপদ্বীপ, তিব্বত, সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, এইরূপ উচ্চারণ-স্থান ভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে।" (২)

(১) পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেবর সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ভারতীয়গণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্য ব্যাবিলিয়ান সভ্যতার নিকট ঋণী। রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

(২) ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ হইতে সমগ্র পৃথিবী কতদূর উপকৃত হইয়াছে, তাহা আমরা যথাশক্তি প্রদর্শন করিলাম। স্মরণাতীত কাল হইতে বৈদেশিকগণ নানাসূত্রে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয়েরাও বিদেশে গমন করিতেন। ইহার ফলে ভারতীয় বিদ্যা দেশান্তরে নীত হইয়াছিল। যে সকল কারণে এইরূপ গমনাগমন হইত, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

মন্তব্য

প্রধানতঃ ভারতীয় রাজন্যগণের দিগ্বিজয়, বৈদেশিকগণের ভারত আক্রমণ, বাণিজ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার উপলক্ষেই ভারতবর্ষের সহিত বিদেশের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

রামায়ণ এবং মহাভারতাদি প্রাচীনগ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে, পুরাকালে হিন্দু-নরপতিগণ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তন্নিবন্ধন অনেক সময় তাঁহারা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া বহির্দ্দেশেও গমন করিতেন।

ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের দিগ্বিজয়

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ ছাড়িয়া দিলেও আমরা ভারতীয় রাজন্যবর্গকে বিদেশাক্রমণে নিরত দেখিতে পাই। আমরা একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ২১০ খৃঃ পূঃ অব্দে সৌভাগ্যসেন নামক একজন ভারতীয় অধিপতি সাম্মিলিত সিরিয়ান ও ব্যাকট্রিয়ান সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ব্যাকট্রিয়ান অধিপতি গ্রীকরাজ এণ্টিওকাস নিহত হন। হিন্দুজাতির অধঃপতনের সূচনাকালেও তাঁহারা স্বদেশ অতিক্রম করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশের রাজা জয়পাল গজনী রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গজনী-রাজ সবক্তগীন গোরক্ত দ্বারা হিন্দু সৈন্যের পানীয় জল দূষিত করাতে এবং অকস্মাৎ প্রবল বেগে তুষার পাত

আরম্ভ হওয়াতে জয়পাল অকীর্ত্তিকর সন্ধি স্থাপন করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

পুরাকালে রাজ-গৌরব এবং বীরকীর্ত্তির স্পৃহাই ভারতীয় রাজগণের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য ছিল। আক্রান্ত নৃপতিগণ মস্তক অবনত করিয়া কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু কোন কোন স্থানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। ভারতীয় রাজন্যগণ ভারত-সীমার বহির্ভাগে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া বিজিত দেশ সকল স্বশাসনাধীন করিয়াছেন, এরূপ অনেক দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা এখানে কয়েকটী মাত্র সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই। হিন্দুজাতি পারস্য দেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ছিলেন, ইহারও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্লিনির মতে জেড্রিওসিয়া, আরাকোশিয়া, আরিয়া এবং পেরোপামিসাস্ নামক পারস্যের বিভাগ চতুষ্টয় হিন্দুজাতির শাসনাধীন ছিল। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থ হইতেও এই মতের সমর্থন করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, গ্রীকগণ হিন্দুদের হস্তে পারস্যের বিপুল অংশ অর্পণ করেন। (১) এতদপেক্ষা আধুনিক কালে হিন্দুগণ

(১) হিন্দুজাতি কর্তৃক পারস্যের বিপুল অংশে আধিপত্য স্থাপন এবং তজ্জন্য বহুসংখ্যক হিন্দুর অধিবাস ঘটিয়াছিল জন্যই আচার্য্য ম্যাক্সমুলার তদীয় Science of Language নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "it was more faithfully preserved by the Zoroastrians who migrated from India to the North West and whose religion has been preserved to us in the Zind Avesta, though in fragments only. * * * The Zoroastrians were a colony

ভারত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ।

হিন্দুরা . . -কর্তৃক বহুবার বিদেশে বিজয়-পতাকা প্রোথিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির বিদেশে আধিপত্য স্থাপনেরও অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও হিন্দুজাতি পরদেশ জয় অথবা পররাজ্য হরণের জন্য খ্যাত নহেন। পক্ষান্তরে বৈদেশিক-গণের ভারতাক্রমণ এবং ভারতরাজ্য-হরণই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং সর্ব্বশ্রেণীর ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ভারত-ভূমি রত্ন-প্রসবিনী বলিয়াই দুর্ভাগিনী। যখন যে বৈদেশিক রাজা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনিই লোভপরতন্ত্র হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। ফলতঃ ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক-জাতি-কর্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের ধন-রত্ন-লোভে পৃথিবীর বহু জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে উত্তর-পশ্চিম-স্থিত পার্ব্বত্য পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন জন্য চেষ্টা করিয়াছে। মৈশরিক, এসিরিয়ান্, গ্রীক্, পারসীক্, ইউচি, হুণ, আরব্য, তুর্ক প্রভৃতি বহু জাতি ভারতবর্ষে অসিহস্তে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা শীঘ্র বা কিঞ্চিৎ বিলম্বে সকলকেই স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। অথবা তাহারা ভারতীয় জাতির সহিত

from Northern India. সার উইলিয়ম জোন্স লিখিয়াছেন, "জেন্দের সংকলিত জেন্দা অভিধানের প্রত্যেক দশটি শব্দের অন্যূন ছয়টি শব্দ বিশুদ্ধ সংস্কৃত।" ভারতীয় আর্য্যগণ যে পারস্য দেশে উপনিবেশিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকে যে সকল ম্লেচ্ছ দেশে ক্ষত্রিয়গণ বাস করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার নাম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। টাইগ্রিস নদীর তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান কোশাই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতললামভূতা কাশী হইতে তথায় গমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় রাজন্যগণ প্রবল শত্রুকুলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার দৃষ্টান্ত সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না। ভারতবর্ষের এই আত্মরক্ষার বিবরণ অতি হৃদয়-গ্রাহী, আমরা সংক্ষেপে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

সিসোস্ত্রিস

স্মরণাতীত কাল হইতে রত্নাভরণা ভারত-মাতা বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন। যতদূর জানা যায়, তাহাতে সুদূর মিশর হইতে প্রথম আক্রমণ হইয়াছিল। এই আক্রমণকারীর নাম সিসোস্ত্রিস। ইনি মিশরের নরপতি ছিলেন। খৃষ্টের জন্মের দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিসোস্ত্রিসের আবির্ভাব হইয়াছিল। সিসোস্ত্রিস আরব প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া অতি পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অতুল ধন-রত্নের জন-শ্রুতি তাঁহাকে আকর্ষণ করে। তিনি ছয় লক্ষ পদাতিক ও চব্বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং সাতাইশ হাজার রথ সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষাভিমুখে ধাবিত হন। (তাঁহার ভারত-বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে এইমাত্র কথিত আছে যে, তিনি জয়-পতকা-হস্তে গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন।) তিনি দিগ্বিজয়ান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সময় ভারতবর্ষের স্থানে স্থান জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার প্রতিরোধ করিতে উত্থিত হইয়া শৌর্য্য বীর্য্য বা কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছিল, এই সকল স্তম্ভে অবস্থানুসারে তাহাদের গুণানুকীর্ত্তন বা নিন্দাবাদ উৎকীর্ণ ছিল।

সিসোস্ত্রিসের পরেই সেমিরমিসের আক্রমণ উল্লেখ-যোগ্য। সেমি-রমিস এসিরিয়ার রাজ্ঞী ছিলেন। এই বীর রমণী ভারতবর্ষ জয় করিয়া ভূতলে অতুল

সেমিরমিস

কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে অভিলাষ করেন এবং তজ্জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। তিনি সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার জন্য রণতরী নির্ম্মাণ-কল্পে ফিনিসিয়া, সিরিয়া এবং সাইপ্রাস হইতে সূত্রধর আনয়ন করেন। সেমিরমিস সমস্ত আয়োজন সমাধা করিয়া চতুঃসহস্র রণতরী সমভি-ব্যাহারে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পঞ্জাব-রাজ সত্যব্রত তাঁহাকে প্রচণ্ড বেগে বাধা প্রদান করেন। ইহাতে ভীষণ জল-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। উভয় পক্ষই বহুক্ষণ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে। কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী সেমিরমিসের দিকেই হেলিয়া পড়েন, হিন্দু-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। রাজ্ঞী সেমিরমিস বিজয়-গৌরবে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব তীরে উপনীত হন। কিন্তু এই স্থানে আবার তাঁহার গতিরোধ হয়। বীর্য্যবন্ত পঞ্জাবরাজ সত্যব্রত আপনার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে অবি-চলিত রহিয়া পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং এই সৈন্যসহ সেমির-মিসের উপর বজ্রের ন্যায় পতিত হন। হিন্দু-সৈন্য একবার আততায়ী সৈন্যের পরাক্রমে নির্য্যাতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রথমতঃ তাদৃশ সাহস প্রদর্শন করিতে পারে নাই। কিন্তু অবিলম্বে রণ-মত্ততা নিবন্ধন তাঁহাদের পূর্ব্ব শৌর্য্য ফিরিয়া আইসে, তাহারা প্রবল পরাক্রমে সেমির-মিসের রণ-হস্তী সকল আক্রমণ করে। এই আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সেমিরমিস সসৈন্যে পলায়ন করেন। রণক্ষেত্রে বহু সংখ্যক এসিরিয়ান সৈন্য চির-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার সময় অনেকে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া-ছিল। রাজ্ঞী স্বয়ং আহত হইয়াছিলেন। তিনি শত্রুহস্তে এই ভাবে লাঞ্ছিতা হইয়া ভগ্নচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং ভারতবর্ষ জয়

করিয়া জয়শ্রী লাভ করিবার সংকল্প চিরজীবনের জন্য পরিত্যাগ করেন।

(সিসোস্ত্রিস ও সেমিরমিসের ভারতাক্রমণের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মতদ্বৈত আছে। অনেকে পারস্যাধিপতি দারয়াবুসের আক্রমণকেই প্রথম বৈদেশিক আক্রমণরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দারয়াবুস বাহুবলে ভারতবর্ষের পশ্চিম অংশে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "কথিত আছে যে, ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার রাজস্বের তৃতীয়াংশ আদায় হইত ও ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাকে সুবর্ণখণ্ডে রাজস্ব প্রদান করিতেন।" (১)

ভারতে পারসিক

ভারতবর্ষে পারসীক প্রাধান্য কতদিন বিদ্যমান ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দের বহু পূর্ব্বেই ভারতবাসীরা পারসীক জাতির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছিল। কারণ, ঐ অব্দে গ্রীক-অধিপতি আলেকজণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং তৎকালে সে প্রদেশে পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য সমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই গ্রীক-আক্রমণ ভারত-ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অংশ। আমরা সংক্ষেপে গ্রীকজাতি-কর্তৃক ভারতাক্রমণের বিবরণ প্রদান করিতেছি।

আলেকজণ্ডার গ্রীসের অন্তর্গত মাকিডন প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। আলেকজণ্ডারকে শৌর্য্য-বীর্য্যের অবতার রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। আলেকজণ্ডার বাল্যকালে সিন্ধুনদের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষ দর্শন জন্য তাঁহার হৃদয়ে বাল-সুলভ কৌতূহল উদ্দিত হইয়াছিল। যৌবনেও তাঁহার এই কৌতূহল নিবৃত্তিলাভ করে নাই। এই কারণ তিনি

আলেকজণ্ডার

(১) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।)

রাজপদ লাভ করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং পারস্য জয় করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হন। আলেকজণ্ডার ৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দের বসন্তকালে ভারত সীমায় প্রবেশ করেন। তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে কতিপয় ক্ষুদ্র জনপদ অতিক্রম করিয়াছিলেন। অধিকাংশ রাজ্যের অধিবাসীই আলেকজণ্ডারের ভয়ে ভীত হইয়া ধন প্রাণ মান রক্ষার্থ পল্লী ও নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা গ্রীকবীরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিরাপদ হইয়াছিল। মাসনা প্রভৃতি কতিপয় স্থানের অধিবাসীরা অকাতরে যুদ্ধ করিয়া গ্রীক সৈন্যের হৃদয়ে বিভীষিকা উৎপাদন পূর্ব্বক অবশেষে শত্রুর সংখ্যাধিক্য-নিবন্ধন অবসন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল।

আলেকজণ্ডার প্রায় এক বৎসর কাল প্রাগুক্ত ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহে অতিবাহিত করিয়া সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশীলা রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তক্ষশিলার আধপতি আম্ভির সঙ্গে পূর্ব্বেই সন্ধিস্থাপিত হইয়াছিল; এই কারণ তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলেকজণ্ডার তক্ষশিলার রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য প্রতি-নিধি নিযুক্ত করিয়া মহারাজ পুরুর রাজ্য (বর্ত্তমান ঝিলাম, গুজরাট ও সাপুর জেলা) অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বিক্রমকেশরী পুরু বিজয় বা মৃত্যুর জন্য কৃতসংকল্প ৫০ হাজার সৈন্য ৩ শত রথ এবং ২ শত রণ-হস্তী সমভিব্যাহারে গ্রীক সৈন্যের গতিরোধ জন্য বিতস্তার তীরে আগমন করিলেন। আলেকজণ্ডার তাদৃশ বিপুল সৈন্য-সমারোহ দেখিয়া ভীত হইলেন; কিন্তু অচিরে আশ্বস্ত হইয়া সুকৌশলে শত্রু সৈন্যের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নদী অতিক্রম করিলেন। মহারাজ পুরু ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অসংখ্য সৈন্য, হস্তী ও রথ সহ গ্রীক-বাহিনীর সম্মুখে আসিয়া বীর দর্পে দণ্ডায়মান হন। বর্ত্তমান

চিনিয়াবালার অদূরে গ্রীক ও হিন্দু সৈন্যে প্রবল যুদ্ধ ঘটে। রণক্ষেত্রে বীর-শ্রেষ্ঠ পুরু এবং তদীয় সেনানীবৃন্দ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই। পুরু পরাজিত হইয়া বন্দী হন, তাঁহার দুই পুত্র রণ-ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন এবং বার হাজার হিন্দু সৈন্য অসি-হস্তে রণ-শায়ী এবং নয় হাজার শত্রু-হস্তে ধৃত হয়। গ্রীক-সেনাপতি বন্দীকৃত পুরু-রাজকে আলেকজণ্ডারের সমীপে আনয়ন করেন। গ্রীকাধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি এক্ষণ আমার নিকট কি প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা করিতেছেন?" মহারাজ পুরু উত্তর করেন, "রাজার মত।" আলেকজণ্ডার পূর্ব্বেই তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও রণ-কৌশল দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার তাদৃশ তেজোগর্ব্ব বাক্যে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। তিনি মহারাজ পুরুর ন্যায় পুরুষসিংহের সহিত শত্রুতা রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন পূর্ব্বক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেন। মহারাজ পুরুর সহিত মিত্রতা স্থাপন এবং আপনার জয়-চিহ্নস্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে নিকা নামক একটি সহরের প্রতিষ্ঠা করিয়া আলেকজণ্ডার পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হন।

অতঃপর তিনি পুরুর রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী গ্লড সাই নামক রাজ্য অধিকার করিয়া চন্দ্রভাগা অতিক্রম করিলেন এবং পুরুর ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঈদৃশ বিপদ পাতে দেশাধিপতি দূরতর স্থানে প্রস্থান করিলেন। আলেকজণ্ডার আহার্য্যাভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া দেশাধিপতিকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে ইরাবতী তটে উপনীত হইলেন এবং ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া অদ্রে ইস তাই জাতির রাজধানী পিমপ্রমা নগরী অধিকার করিলেন। এই স্থানে একদিন সসৈন্যে বিশ্রাম করিয়া সাগালা নামক স্থানে গমন

করিলেন এবং সেখানে প্রবল যুদ্ধে পরাক্রমশালী কাথাই জাতিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। আলেকজণ্ডার সাংগালা পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং শতদ্রুতীরে উপনীত হইলেন।

এই সময় তদীয় সৈন্য অনবরত যুদ্ধ ও পরি ভ্রমণ করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি মগধ ও গঙ্গারাঢ়ি রাজ্যের বিপুল সৈন্যবলের জনশ্রুতি তাহাদিগকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। তৎকারণ তাহারা আর অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হয়। তাহাদের মতে বাধ্য হইয়া আলেকজণ্ডার সিন্ধু নদের পথে জলযানে আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয়-গণ কর্ত্তৃক তাঁহার নৌ যাত্রার গতি পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মানই জাতি আর কতিপয় জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রচণ্ড পরাক্রমে আলেকজণ্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের সহিত আহবে আলেকজণ্ডার আহত হইয়াছিলেন; এই আঘাত এতদূর গুরুতর হয় যে, তাঁহার মৃত্যুর জনরব উঠিয়াছিল। অবশেষে আলেক-জণ্ডার বাহুবলে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া ৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের সীমা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে বেলুচিস্থানের মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া স্থলপথে গিয়াছিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য সিন্ধুনদের মোহনা হইতে সমুদ্র-পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

ভারতে গ্রীক

মহাবীর আলেকজণ্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, সেলুকাস নামক একজন সেনাপতি পারস্য দেশ অধিকার করেন। ইনি আপনার পূর্ব্ব প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হন। সেলুকাস আলেকজণ্ডার

কর্ত্তৃক বিজিত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া মগধ রাজ্যের প্রান্তদেশে আগমন করেন। এইস্থানে মগধ রাজ্যের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত বিজয়-শ্রী লাভ করেন, গ্রীকরাজ সেলুকাস পরাজিত হইয়া আপনার প্রিয়তমা কন্যাকে তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন করেন। মহারাজ গ্রীক-কুমারীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। গ্রীক-রাজ সেলুকাস সন্ধি স্থাপন করিয়া মগধ-রাজ্যে সুপ্রসিদ্ধ মেগাস্থিনিসকে দূতরূপে রাখিয়া স্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করেন।

সেলুকাসের পরলোক-গমনের পর তদীয় রাজ্য অল্পদিন মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেলুকাসের শাসিত রাজ্য নানা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ডিওডোটাস নামক একজন গ্রীক বীর ইহার কতিপয় অংশ একত্র করিয়া খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাক্‌ট্রিয়া বা বাহ্লীক নগরে এই রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। (১) ডিওডোটাসের উত্তরাধিকারিগণ দীর্ঘকাল রাজ্য-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ন্যূনাধিক ৮০ বৎসরের মধ্যেই মধ্য-এসিয়া হইতে অসভ্য তুরেণীয় ইউচিগণ ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক জাতির উপর প্রবল বন্যার জলের ন্যায় পতিত হয় এবং তাহার স্রোতের বেগে গ্রীক রাজ্য ভাসিয়া যায়। গ্রীকগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং নানা ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতে থাকেন।

"গ্রীক-জাতি কর্ত্তৃক আধুনিক পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের অনেক ভাগ যে অধিকৃত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। অন্যূন ত্রিংশৎ সংখ্যক গ্রীকজাতীয় অধিপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পঞ্জাবে

(১) ব্যাকট্রিয়া আফগানিস্থানের উত্তরে অবস্থিত ছিল। ব্যাকেট্রিয়ার বর্ত্তমান নাম বাল্ক।

ও যুক্ত প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার ভাউদিজী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মধ্য ভারতবর্ষে সাত জন গ্রীক-রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আটজন গ্রীক বা যবন রাজার উল্লেখ আছে।" (১)

এই সকল ক্ষুদ্র গ্রীক-অধিপতির অন্যতম মেনান্দর খৃঃ পূঃ ১৪১ অব্দে দেশ জয় করিতে করিতে অযোধ্যা প্রদেশে উপনীত হন। কিন্তু মগধের অধিপতি বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন। গ্রীক-অধিপতি পরাক্রমশালী শত্রুর ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া ভগ্ন-চিত্তে স্বরাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করেন।

মেনান্দরের সমসময়ে (খৃঃ পূঃ ১৫০) এণ্টিয়াল কি ডাস নামক আর একজন গ্রীক-নরপতি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে- নির্ম্মিত একটি স্তম্ভ গোয়ালিয়ার রাজ্যের দক্ষিণে ভিলসা নগরের অদূরস্থিত বেশনগরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্মৃতি-স্তম্ভটি বিষ্ণুর সম্মানার্থ ডিযনের পুত্র বিষ্ণু-সেবক হেলিয়াডরাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বেশনগরের গ্রীক-স্তম্ভ ভারতে গ্রীক-প্রভাব এবং গ্রীকগণ-কর্তৃক হিন্দু দেবোপাসনার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছে।

ইহার পর আমরা গেণ্ডোফেরাস নামক একজন গ্রীক-রাজার বৃত্তান্ত জানিতে পারি। গেণ্ডোফেরাস পঞ্জাবের একাংশে রাজত্ব করিতেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার মুদ্রাসকলে খৃষ্ট-ধর্ম্মের চিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৫০ অব্দে গেণ্ডোফেরাসের রাজত্ব বর্ত্তমান ছিল। ফলতঃ গ্রীক-বীর আলেকজণ্ডারের সময় হইতে প্রায় ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত গ্রীক-জাতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল। কোন সময়ে কি কারণে এই সম্বন্ধের

(১) বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড।

বিলোপ ঘটে, তাহা নির্দ্দেশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক, তুরেণীর ইউচিগণ ব্যাকট্রিয়া রাজ্য এবং তদন্তর্গত আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ আত্মসাৎ করিয়া কাশ্মীরে উপনীত হয়েন। অবিলম্বে কাশ্মীর ও পঞ্জাবের কোন কোন অংশ এই জাতির হস্তগত হয়। খৃষ্টের পর প্রথম শতাব্দীতে এই জাতীয় কনিষ্ক রাজা কাশ্মীরের অধিপতি হন এবং কাবুল ও কাশঘড হইতে আগ্রা ও গুজ্জর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কাশ্মীরে একটী সভা স্থাপন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা ও টীকাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার শাসন-কালে কাশ্মীর হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ তিব্বত ও চীন দেশে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ভারতবর্ষে শকাব্দ নামে যে অব্দ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, সে অব্দ বৌদ্ধ রাজা কনিষ্কের সময় হইতে প্রচলিত হয়। (১)

মহারাজ কনিষ্ক

কনিষ্কের পর কাবুল হইতে কাম্বোজীয়গণ ভারতবর্ষে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন এবং "শাহ" উপাধিধারী একদল বিজেতা সৌরাষ্ট্রে রাজ্য স্থাপন করিয়া খৃষ্টের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

অবশেষে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে তুরেণীয় হূনগণ পঙ্গপালের ন্যায় পারস্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষ আচ্ছাদন করিয়া ফেলেন। পঞ্জাবের উত্তরাংশে তাঁহারা একটী বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। (২) পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল নামক নগরে এই হূনগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। হূনরাজকুলে মহারাজ মিহিরকুল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপান্বিত ছিলেন; তাঁহার নামে

মহারাজ মিহিরকুল

(১) কনিষ্কের বংশীয়েরা ভারতবর্ষে প্রায় ১২০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(২) ৺রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস হইতে গৃহীত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

ভারতবর্ষীয়েরা কম্পিত-কলেবর হইতেন। সমস্ত মধ্যভারত এবং মালব প্রদেশের অধিকাংশ তাঁহার সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। মিহিরকুল বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর নবীন অধিপতি বিক্রমাদিত্য তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বিক্রমাদিত্য হুণগণকে মালব প্রদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। বস্তুতঃ বিক্রমাদিত্য বৈদেশিক রাজন্য কুলের দমনকারিরূপে অভ্যুত্থিত হন। এই কারণ বৈদেশিকেরা সম্মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিপুল পরাক্রমে অস্ত্রধারণ করেন। ৫৩৩ খৃঃ অব্দে মুলতান নগরের নিকটবর্ত্তী কোরুর নামক স্থানে বিক্রমাদিত্যের সহিত তাহাদের প্রবল যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে শকদের সমস্ত শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়। বিক্রমাদিত্য সগৌরবে শকারি উপাধি ধারণ করেন। (১)

আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে খৃঃ জন্মের ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে মধ্য আসিয়া হইতে ইউচি-বংশীয়েরা এবং খৃষ্টের চারিশত বৎসর পরে হুণ বংশীয়েরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। ইউচি এবং হুণের আগমণের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে তুরেণী জাতীয় আর এক বংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ইহাদের নাম ব্রিজি। খৃষ্টের পূর্ব্বতন সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিজিরা হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক মিথিলায় প্রবিষ্ট হয়েন।

ব্রিজি বংশ

ব্রিজি বংশীয়েরা মিথিলার প্রাচীন রাজবংশ বৈদেহীদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সে প্রদেশ হস্তগত করেন এবং বৈশালী নামক স্থানে (আধুনিক পাটনার নিকটবর্ত্তী বেসাড়) রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন। ব্রিজি বংশীয়েরা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। মিথিলা নানাভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক

(১) ভারতবাসীর নিকট মধ্য আসিয়া শকদ্বীপ নামে পরিচিত। এজন্য তদ্দেশবাসীরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাধারণতঃ শক নামে কথিত হইয়াছে।

জন দলপতির শাসনাধীন হইয়াছিল। এই সকল দলপতি প্রকৃতিপুঞ্জের মতানুসারে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ কালে তাঁহারা একজন অধিনেতা নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইতেন।

মিথিলার প্রাচীন রাজকুল ব্রিজিগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া মগধে গমন করেন এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া সেখানে আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। এই বংশের অজাতশত্রু প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন এবং পূর্ব্ব বৈরী ব্রিজি বা লিচ্ছবি দিগকে বিধ্বস্ত করিতে সংকল্প করেন।

বশ্যকার নামে ব্রাহ্মণ অজাতশত্রুর মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট চতুরতা এবং কূটনীতিজ্ঞতা ছিল। বশ্যকারের মন্ত্রণা মত অজাতশত্রু কোন উপলক্ষে তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বশ্যকার মিথিলা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানে তিন বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। এই সময় মধ্যে তিনি সুকৌশলে কূটনীতি বলে ব্রিজি-বংশীয় দলপতি গণের মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া দেন। ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রিজি বংশীয়েরা হীনবল হইয়া পড়েন। তখন বশ্যকার মিথিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজাতশত্রুর নিকট উপনীত হন এবং মিথিলা আক্রমণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অজাতশত্রুকে পরামর্শ প্রদান করেন। তদনুসারে অজাতশত্রু বিপুল বাহিনী সহ ব্রিজি-বংশীয় দিগকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হন এবং তাহাদিগকে সহজেই পরাজিত করিয়া মিথিলায় আধিপত্য লাভ করেন। অতঃপর ব্রিজি বংশীয় অধিকাংশ লোক আত্মসম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেপাল রাজ্যের অধিবাসী হন এবং ভারতবর্ষ হইতে পরাক্রান্ত ব্রিজি জাতির আধিপত্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

মধ্য আসিয়া হইতে আগত বৈদেশিকেরা ভারতবর্ষে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করিয়াছিল। ভাষায়, ধর্ম্মে এবং সভ্যতায় তাঁহারা ক্রমে ভারতবাসীর অনুরূপ হইয়া উঠে। আমরা এক্ষণ আর একদল বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ইহারা সুদীর্ঘ কাল ভারতবর্ষে বাস করিয়াও সযত্নে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমরা মোসলমানের কথা বলিতেছি।

ভারতে মোসলমান আক্রমণ

মোসলমানকুলে যিনি সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ওস্‌মান। ওসমান খলিফা ওমরের সেনাপতি ছিলেন। ইনি ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বোম্বাই উপকূল জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভ হয় নাই।

এই প্রথম আক্রমণের পর খলিফা মাবিয়ার রাজত্বকালে মোসলমান দিগকে ভারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিতে পাই। এই সময় (৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) মুহালিব নামক একজন সেনাপতি সসৈন্যে মুলতান প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। অতঃপর খলিফা মাবিয়া অন্যূন ছয় জন সেনাপতিকে অসিহস্তে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহই ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দুইজন সেনাপতি শত্রুহস্তে নিহত হয়েন; অবশিষ্ট চারিজন শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করেন।

সিন্ধু বিজয়

মাবিয়ার মৃত্যুর পর দীর্ঘকালব্যাপি গৃহ কলহে মোসলেম সাম্রাজ্য ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। এই সময় পর রাজ্য হরণ ব্যাপারে লিপ্ত হইবার অবকাশ মোসলমানদের ছিল না। এই গৃহ কলহের অবসানে মোসলমানগণ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ জয় করিতে উদ্যত হয়েন। তৎকালে হেজাজ

নামক একজন মহাবীর ইরাকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সিন্ধুদেশ জয় করিবার জন্য খলিফার অনুমতি গ্রহণ করেন। হেজাজ সিন্ধু বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সেনাপতি ওবেদুল্ল্যাকে তদর্থ প্রেরণ করেন। ওবেদুল্ল্যা রণক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদীয় সৈন্যদল সেনাপতির মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। হেজাজ ওবেদুল্ল্যার পরাজয় ও মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া বুদেন নামক আর একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। বুদেন শত্রুর সম্মুখীন হইয়া প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া নিহত হন। অতঃপর হেজাজ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক মোহাম্মদ বিনকাসেমকে প্রেরণ করেন। এই নবীন যুবক শৌর্য্য বীর্য্যের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। তিনি ৭১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সসৈন্যে সিন্ধুদেশের দ্বারদেশে উপনীত হয়েন। সিন্ধুদেশের অধিপতি রাজা দাহির আততায়ী মোসলমানের গতিরোধ করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ রাজ কুমারকে প্রেরণ করেন। কাসেম সিন্ধু রাজকুমারের সমস্ত পরাক্রম অতিক্রম করিয়া রাজধানী আলোরের অভিমুখে অগ্রসর হন। সিন্ধুরাজ দাহির এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে আরব বাহিনীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। একটী গোলার আঘাতে রাজহস্তী আহত হয়। হস্তী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে রাজাকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে দূরে পলায়ন করে। রাজার তিরোধানে তদীয় সেনাবৃন্দ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। রাজা দাহির নিজেও আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হন এবং পুনর্ব্বার প্রবলোৎসাহে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিজয়শ্রী কিছুতেই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন নাই, তিনি অসিহস্তে শত্রুনাশ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণ

পরিত্যাগ করেন। রাজার মৃত্যুর পর মোহাম্মদের সম্মুখে প্রবলতর বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধবা সিন্ধুরাজ মাহুষা প্রচণ্ড তেজে অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য আয়োজন করেন। মোহাম্মদ বিনকাসেম অনন্যোপায় হইয়া নগর অবরোধ করেন। ইহার ফলে অচিরে নগর মধ্যে অন্নাভাব উপস্থিত হয়। তখন রমণী ও বালক বালিকাগণ স্বহস্তে চিতা সজ্জিত করিয়া জ্বলন্ত পাবকে জীবনাহুতি প্রদান করেন এবং রাজপুত বীরগণ নগরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অমিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে রণশায়ী হন। অতঃপর মোহাম্মদ রাজধানী অধিকার করেন এবং ন্যূনাধিক তিন বৎসর মধ্যে সমগ্র হিন্দুদেশে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হন।

সিন্ধুদেশ বিজিত হইবার অব্যবহিত পরেই মোহাম্মদ হঠাৎ খলিফার বিষ দৃষ্টিতে পতিত হন; রাজরোষে তাঁহার জীবনান্ত হয়। মোহাম্মদের অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সূচিত বিজয়োদ্যম পরিত্যক্ত হয় এবং সুমের বংশীয় রাজপুতগণ সিন্ধুদেশ হইতে মোসলমানদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

ইহার পর আরব জাতীয় মোসলমানেরা আর কখনও অসিহস্তে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয় নাই। সিন্ধু বিজয়ের আড়াইশত বৎসর পরে তুর্কী-জাতীয় মোসলমানগণ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমবর্ত্তী পার্ব্বত্য দ্বারে প্রবেশ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার ভারতাধিকারের চেষ্টা পায়।

আলপ্তগীন নামক একজন তুর্কী জাতীয় মোসলমান বীর পুরুষ সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বরপুত্র ছিলেন। তিনি ৯৬১ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান আফগানীস্থানের অন্যতম অংশ গজনীতে একটী নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎপ্রদেশে ইসলাম ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ করেন। আলপ্তগীন পরলোক গমন করিলে তদীয় জামাতা সবক্তগীন গজনীর রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।

ভারতে তুর্কি

এই সময় লাহোরে মহারাজ জয়পাল রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের সীমান্তে মোসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহা স্বরাজ্যের পক্ষে আপদজনক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তজ্জন্য মোসলমানের আধিপত্যের ধ্বংস সাধন উদ্দেশ্যে সসৈন্যে বহির্গত হন। "পেশাবর হইতে কাবুল পর্য্যন্ত যে পার্ব্বত্য উপত্যকা গিয়াছে, সেই পথ দিয়া জয়পাল যাত্রা করিয়া সবক্তগীণের শিবিরের সম্মুখীন হন। কথিত আছে, তৎকালে অতিশয় ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় হিন্দুগণ ভীত হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হন এবং সবক্তগীনকে ৫০টী হস্তী ও বহু অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বদেশে আসিয়া জয়পাল অর্থ দানে অসম্মত হন; তাহাতে সবক্তগীন ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দু দিগকে আক্রমণ করিতে আগমন করেন। জয়পাল অন্যান্য হিন্দু রাজার সহায়তায় একলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু যুদ্ধে মোসলমাণগণ জয়লাভ করেন। সবক্তগীন সিন্ধু নদের পশ্চিম কূল পর্য্যন্ত সমস্তদেশ অধিকার করিয়া এবং পেশবারে দশ সহস্র সৈন্য রাখিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সবক্তগীনের মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র মাহমুদ গজনীর রাজা হয়েন। * * * মাহমুদ গজনীর অসাধারণ সাহস, যুদ্ধ কৌশল ও মানসিক ক্ষমতা ছিল; অনেক গুলি সদ্‌গুণ ও ছিল, তাহার সন্দেহ নাই; তথাপি তিনি ভারতবাসীদিগের পক্ষে কৃতান্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষে কেবল মনুষ্য হত্যা, নগর লুণ্ঠন, দেব ও ধর্ম্মের অবমাননা এবং নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া আপনার নাম অপযশে পূর্ণ করিয়াছিলেন।" (১) সুলতান মাহমুদ সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইহার ফলে বহু প্রদেশ বিধ্বস্ত, শত শত দেবালয়

সুলতান মাহমুদ

(১) ৺রমেশ চন্দ্র দত্তের ইতিহাস হইতে গৃহীত।

ও দেবমূর্ত্তি ভগ্ন এবং অসংখ্য নরনারী সর্ব্বস্বান্ত হয়। মাহমুদ পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষের নানা স্থান বিধ্বস্ত করিয়াও একমাত্র পঞ্জাবে মোসলমানের স্থায়ি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গজনী এবং ঘোর

"মাহমুদের মৃত্যুর পর প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মোসলমানগণ আর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। এই সময়ের মধ্যে মাহমুদের রাজধানী গজনী নগরীর ধ্বংস সাধন হইয়াছিল। ঘোর রাজ্যের অধিপতি আলাউদ্দিনের সহিত গজনীরাজ বহরামের কলহ হওয়ায় আলাউদ্দীন বিজয় লাভ করিয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত গজনী নগরী বহ্নি ও অসি দ্বারা ছারখার করেন এবং ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া সেই প্রসিদ্ধ ও সুন্দর রাজধানী একবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। ১১৫২ খৃষ্টাব্দে গজনী নগরী ধ্বংস হয়। তাহার কিছু পরে গজনী রাজ্য বিলুপ্ত হয়। [কেবল পঞ্জাবে যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই অব্যাহত থাকে।]

সাহাবুদ্দিন বা মোহাম্মদ ঘোরী।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সায়েফ উদ্দীন এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তৎপরে গায়েসউদ্দীন ঘোরী রাজ্য লাভ করিয়া আপন ভ্রাতা সাহাবুদ্দীনের হস্তে যুদ্ধভার ন্যস্ত করেন। প্রসিদ্ধনামা সাহাবুদ্দীনই ভারতবর্ষ জয় করেন। ইনি ইতিহাসে মোহাম্মদ ঘোরী নামেই বিশেষ খ্যাত। সাহাবুদ্দীন প্রথমে পঞ্জাবে গজনীবংশীয়গণের ধ্বংস করিয়া সেই প্রদেশ আপন অধীনে আনেন, তার পর হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তিরৌরীর ক্ষেত্রে সাহাবুদ্দীনের সহিত দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরায়ের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সাহাবুদ্দীন পরাজিত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করেন। দুই বৎসর পরে সাহাবুদ্দীন পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, এবার পৃথ্বী

রায়কে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আজমীর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি কুতুবউদ্দীন নামক দাসকে ভারতবর্ষে রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।" (১)

ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী বলিয়া পরজাতির নিতান্ত লোভের পাত্রী। পরস্বলোলুপ বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক ভারতের ধনরত্ন পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব সর্ব্বজনবিদিত। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। কিন্তু স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের অর্থ লোভে আকৃষ্ট হইয়া অতি প্রাচীনকালে যে, নানা দেশ হইতে নানা সম্প্রদায়ভুক্ত বণিকগণ দলে দলে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ উপনীত হইতেন, সে তত্ত্ব তাদৃশ পরিজ্ঞাত নহে।

ভারতে বৈদেশিক বণিক।

প্রাচীন ভারতের শিল্পৈশ্বর্য্যের (২) সংবাদ দেশে বিদেশে প্রচারিত ছিল বলিয়া বিদেশীয়গণ অর্থ লোভে ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য কতদূর বিস্তৃতি ও উন্নতিলাভ করিয়াছিল, আমরা তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১) রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস হইতে গৃহীত।

(২) প্রাচীন ভারতের শিল্পৈশ্বর্য্য কীদৃশ বহুবায়তন ছিল, তাহার আভাস আমরা সংক্ষেপে প্রদান করিতেছি। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বর্ণ ভেদ বিদ্যমান ছিল না। তারপর কালক্রমে কার্য্যভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণ অধ্যাপন ও ধর্ম্মযাজন, ক্ষত্রিয়গণ দেশের শাসন ও সংরক্ষণ এবং বৈশ্যগণ শিল্প ও কৃষিকার্য্যে নিরত থাকিতেন। আর্য্যজাতির বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপন ও ধর্ম্মযাজন, দেশের শাসন ও সংরক্ষণ এবং শিল্প ও কৃষি এরূপ বহ্বায়তন হইয়া উঠে যে, প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য সম্পাদন জন্য বহু সংখ্যক ব্যক্তির অনন্যকর্ম্ম হইয়া তত্তৎকার্য্যে নিরত হওয়া আবশ্যক হয়। যিনি যে কার্য্য করিতেন, তাঁহার পুত্রগণও পিতৃপন্থা অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি নিবন্ধন তাহাতেই নিযুক্ত হইতেন। এইরূপেই বর্ণভেদ প্রথার সূত্রপাত হয়। আর্য্যগণ

রামায়ণের এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহামুনি বশিষ্ঠ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশবাসী এবং দ্বীপবাসী বণিকদের নিকট হইতে রাজোপহার গ্রহণ জন্য ভরতের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। রামায়ণের এই অংশ (অযোধ্যা কাণ্ড দ্ব্যশীতিতম সর্গ) পাঠ করিলে রামায়ণের সময়ে ভারতবর্ষে বৈদেশিক বণিকগণ অবস্থিতি করিতেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

এক এক বিষয়ে বংশানুক্রমে লিপ্ত হওয়ায় স্ব স্ব গৃহীতকার্য্যে অচিরে পারদর্শী হইয়া উঠেন। ফলতঃ বর্ণভেদের ফলে আর্য্যসমাজে ধর্ম্ম, যুদ্ধবিদ্যা এবং শিল্প ও কৃষি উৎকর্ষ লাভ করে।

কোন্ সময়ে বর্ণভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? বৈদিকযুগে ভারতবর্ষে বর্ণভেদ বিদ্যমান ছিল না। বৈদিকযুগের পর অত্যল্পকালমধ্যেই ভারতবর্ষে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কল্পসূত্রে চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়। কল্পসূত্র সমূহ ন্যূনাধিক সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। সুতরাং অতি প্রাচীনকালেই যে কৃষি ও শিল্প নিরতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিন শতাধিক তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ দশরথ অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে বহুবিধ, সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত হইত। এই সময়ে বস্ত্র বয়ন ও কারুকার্য্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ দশরথের চারিপুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন মিথিলার রাজনন্দিনীদের পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহারা অযোধ্যা নগরীতে প্রতিগমন করিতে উদ্যোগী হইলে মিথিলাধিপতি জনক কন্যাদিগকে মুখ্য কম্বল (রামায়ণের সময়ে ভারবাহী শকটের আচ্ছাদন জন্য স্থূল কম্বল ব্যবহৃত হইত। যে সময় শকটের জন্যই কম্বল ব্যবহৃত হইত, তখন রাজকুমারীদিগকে শাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট পশমী বস্ত্র উপহার প্রদান করিলে তাহা কখনও শোভমান হইত না। তজ্জন্য হিরেণ সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন যে, মুখ্য কম্বল কাশ্মীরজাত উৎকৃষ্ট শাল ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু টীকাকার রামানুজ অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন. তাঁহার মতে বৈদেহী দুহিতাদিগকে প্রদত্ত মুখ্য কম্বল নেপাল জাত ছিল) ক্ষৌম বস্ত্র, সুরঞ্জিত পরিচ্ছদ ও রাজযোগ্য

অধ্যাপক উইলসন সাহেব সভাপর্ব্বোক্ত উপহার সামগ্রীর তালিকা সবিশেষ প্রণিধান সহ পাঠ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে সুদূর চীন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, এই দুই দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের বিনিময় হইত, তৎসমুদয়ের নাম নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালেই চীন উৎকৃষ্ট রেশমের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তদ্দেশ জাত রেশম ভারতবর্ষে আনীত হইত। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও চীনদেশ জাত বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। কালিদাস বিরচিত শকুন্তলার প্রথম অঙ্কে আছে, "চীনাংশুমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য"।

বিবিধ অলঙ্কার, বহু মুক্তা, প্রবাল, এবং সম্যক্‌অলঙ্কৃত যান যৌতুক প্রদান করেন। অতঃপর রাজা দশরথ পুত্রগণের সহিত মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় উপনীত হন ; এবং "কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজ পত্নীরা ক্ষৌমবসনপরিধান করিয়া হোমচিহ্নে ভূষিতা হইয়া মহাভাগা যশস্বিনী সীতা উর্ম্মিলা এবং সেই দুই কুশধ্বজ তনয়াকে মঙ্গল আলাপন পূর্ব্বক গ্রহণ করেন।" ইহার পর মহারাজ দশরথ সর্ব্বগুণান্বিত, নরসিংহ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তদর্থ মন্ত্রণা জন্য তাঁহাকে স্বীয় সকাশে আহ্বান করেন। রঘুনন্দন রাম ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পিতৃচরণ বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞায় "যথান্যায় মণি ও কাঞ্চনে ভূষিত মনোহর স্বচ্ছ আসনে উপবেশন করেন।" মহারাজ দশরথ ধীমান রামের অভিষেকার্থ সমস্ত মন্ত্রণা শেষ করিয়া কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে গমন করেন। কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে অনেক লতা নির্ম্মিত গৃহ এবং অশোক ও চম্পক বৃক্ষে শোভিত বিচিত্র সৌধ ছিল ; তাহাতে অনেক গজদন্ত নির্ম্মিত ও সুবর্ণ রচিত উৎকৃষ্ট আসন ছিল। সেই অন্তঃপুর বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে পূর্ণ ছিল। মহারাজ দশরথ সেই অন্তঃপুরে উপনীত হইয়া অসূয়ারূপিণী কৈকেয়ীর চক্রান্তে রিপুদমন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া বনবাসে প্রেরণ করেন। রাম-প্রাণ দশরথ

মহাভারতের বহুকাল পরবর্ত্তী রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত "অর্থ-শাস্ত্র" নামক গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে সকল নাবিক ও বণিক বৈদেশিক পণ্যদ্রব্য আমদানী করিবে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। তৎকালে ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য সুপ্রচলিত না থাকিলে চাণক্য তাদৃশ বিধান বিধিবদ্ধ করিতেন না।

সর্ব্বলোকপ্রিয় পুত্রের অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অনন্তর নিঃস্বার্থ ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়া "ভ্রাতৃ শোকে সম্যক্ তাপিত" হইলেন এবং "উৎকৃষ্ট রথে আরোহন করিয়া রামদর্শনাভিলাসে" যাত্রা করিলেন। মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্র-নির্ম্মাণ দক্ষ তন্তুবায়, শস্ত্র নির্ম্মাণোপজীবী কর্ম্মকার, ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত বাজনাদি ব্যবসায়ী, * * মুক্তাদিবেধক, কূপাদিকারক, স্বর্ণকার, গন্ধদ্রব্য বিক্রেতা, তুন্নবায় (দর্জ্জি) কম্বল-সার" ভরতের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। আমরা রামায়ণের এই বর্ণনা হইতে আভাস প্রাপ্ত হই যে, তৎকালে শিল্পকার্য্য ও ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল : বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্প নিরতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

রামায়ণোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র কোন্ স্থানে প্রস্তুত হইত তাহা পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগ নাই। কিন্তু মহাভারতের সময় যে সমস্ত স্থান বস্ত্রশিল্পের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের নাম আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলে ভারতের রাজন্যবৃন্দ তথায় সমবেত হয়েন; এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ মহার্ঘ উপহার প্রদান করেন। এই সকল উপহার সামগ্রীর তালিকায় একপ্রকার স্বর্ণখচিত বুটাদার পশমী বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। উইলসন্সাহেব এই সকল পশমী বস্ত্রকে স্বর্ণ-খচিত শাটী ও শাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুজরাটের আভীরগণ কর্তৃক নানাপ্রকার কম্বল প্রদত্ত হইয়াছিল। ছাগলোম নির্ম্মিত বস্ত্র, কীট সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্র, উদ্ভিদজাত সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্র, এই তিন প্রকার বস্ত্র প্রাগুক্ত তালিকা ভুক্ত। এই সকল বস্ত্র শক, তুখরাজ ও কঙ্ক জাতির অধিকৃত দেশ হইতে আগত হইয়াছিল। নিম্ন বঙ্গ, মেদিনীপুর এবং গঞ্জামের রাজন্যগণ

বৌদ্ধ শাস্ত্রের অন্তর্গত জাতক গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে জানা যায় যে, আমাদের রাজত্বের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের সহিত ব্যাবিলনের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল এবং ভারতবর্ষ জাত ময়ূর ঐ দেশে নীত হইত।

ফিনিসিয়ান জাতি।

পুরাতন বাইবেল পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, অফির দেশ হইতে বহুবিধ দ্রব্য প্যালেষ্টাইনে নীত হইত। আচার্য্য ম্যাক্‌সমূলার এই সকল দ্রব্যের বিবরণ পাঠ করিয়া অফির দেশকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত সৌবির প্রদেশের অপভ্রংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হস্তিপৃষ্ঠাচ্ছাদন প্রদান করেন। আমরা কর্ণাট এবং মহীশূর জাত মসলিনের নামও উপহার সামগ্রীর তালিকায় দেখিতে পাই।

কৃষি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ মধ্যে বাণিজ্যের বিস্তৃতিও অবশ্যম্ভাবী ভারতবর্ষেও ইহার অন্যথা হয় নাই। বণিকগণ সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্ত্র এবং শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্য লইয়া বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। রামায়ণের সময়েই বাণিজ্য স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ দেশ মধ্যে প্রশস্ত রাজপথের প্রয়োজন। রামায়ণের সময় রাজপথের অভাব ছিলনা। ভরত রাম দর্শন জন্য বনে গমন করিতে সংকল্প করিলে "যাহারা পরীক্ষা দ্বারা ভূতলের অধস্তন গুপ্ত স্থান অবগত হইতে পারে এবং যাহাদিগের সূত্র দ্বারা পরিমাণ করিতে দক্ষতা আছে, সেই খনন দক্ষ শৌর্য্য সম্পন্ন খনক, যন্ত্র পরিচালক, বৈতনিক স্থপতি, যন্ত্র নির্ম্মাণ-দক্ষ বর্দ্ধকি, বৃক্ষচ্ছেদক, মার্গরক্ষক, সূপকার, সুধাকার, বংশকার ও চর্ম্মকারেরা মার্গ নির্ম্মাণার্থ প্রস্তুত হইলেন। ইহাদের পরিশ্রমে অচিরে সেনা গমনাগমনের পথ নির্ম্মিত হইয়া সম্যক শোভান্বিত দেবপথের সাদৃশ্য ধারণ করিল।" আমরা এই বর্ণনা পাঠ করিয়া দুইটি বিষয় জানিতে পারি। প্রথম, তৎকালে রাজপথ নির্ম্মাণ জন্য বিবিধ শ্রেণীর কর্ম্মচারী এবং শ্রমজীবি নিযুক্ত ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সেই প্রাচীনকালেই পূর্ত্তবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। দ্বিতীয়, পথরক্ষার জন্য কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিতেন। পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারিগণ দেশমধ্যে রাজপথ নির্ম্মাণের জন্য ব্যাপৃত থাকিতেন।

পুরাতত্ত্বজ্ঞ বিনসেণ্ট সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে যে সকল বিদেশজাত দ্রব্য লইয়া প্যালেষ্টাইনের বাণিজ্য ছিল, তাহা ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী নগর সমূহে প্রস্তুত হইত। কিন্তু সে সকল স্থানের অধিবাসীরা তদ্রূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী শিল্পকৌশল পরিজ্ঞাত ছিল কিনা তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে এরূপ হইতে পারে যে, ভারতজাত দ্রব্যাদি প্রথমে ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে নীত হইত, তাহার পর তথা হইতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িত। পুরাতন বাইবেলের অন্তর্গত যিহিস্কেল অধ্যায়ে টায়ার রাজ্যের অধিবাসী ফিনিসিয়ান জাতির বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "হারণ, কাণা, এদিন, সেন, অসুর

ফলতঃ যে সকল স্থান দিয়া লোক যাতায়াত করিত এবং পণ্যদ্রব্যসকল নীত হইত, তত্তৎ স্থলে রাজপথ বিদ্যমান ছিল। রাজন্যবৃন্দ রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; পথিক ও বণিকদিগকে দস্যু ও তস্করের হস্তহইতে রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে পথরক্ষকদিগকে নিযুক্ত রাখিতেন। রামায়ণের পরবর্ত্তীকালে মহাভারত-যুগে রাজপথাদির এতদপেক্ষাও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালেই ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। বশিষ্ঠসূত্রের একস্থানে রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, যাহাতে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাপের কোন প্রকার ব্যতিক্রম না হয়, তদুপায় রাজাকে অবলম্বন করিতে হইবে। সূত্রকার গৌতম বিবিধ শ্রেণীর রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিবার সময় বাণিজ্য শুল্ক ও শিল্পকরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ব্যবস্থার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। বিক্রেতা পণ্যদ্রব্যের বিশভাগের এক ভাগ অবশ্য শুল্কস্বরূপ প্রদান করিবে।

২। ফল, মূল, পুষ্প, ভেষজ-বৃক্ষলতা, মধু, মাংস, তৃণ, এবং কাষ্ঠের ষাটভাগের একভাগ রাজপ্রাপ্য।

৩। প্রত্যেক শিল্পী সপ্তাহে একদিন করিয়া রাজারকাজ করিবেন।

এবং চিলমদে তোমাদের বাণিজ্য ছিল। এই সকল স্থানের লোক তোমাদের ব্যবসায়ী ছিল; ইহারা সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য, নীলবস্ত্র, বুটাদার প্রাবরণ ও রজ্জুবদ্ধ এবসকাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্সপূর্ণ মূল্যবান পরিচ্ছদ তোমাদের বিক্রয় স্থানে আনয়ন করিত।" অস্মদ্দেশের মুখোজ্জ্বলকারী রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এই উদ্ধৃতাংশ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া বিদেশেও উহা প্রেরিত হইতে পারিত। পুরাতত্ত্বজ্ঞ হিরেণ সাহেবও প্রদর্শন করিয়াছেন যে, টায়ার নগরে পুরাকালে যে সকল রঙ্গিন বস্ত্র ও মূল্যবান পরিচ্ছদ আমদানী হইত, তাহার অধিকাংশই ভারতজাত ছিল। ফিনিসিয়ানদের বাণিজ্য নিরতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, সুতরাং হিরেণ সাহেবের এই নির্দ্ধারণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ফিনিসিয়ান জাতিরই হস্তগত ছিল। ফিনিসিয়ান জাতির বাসস্থান টায়ার রাজ্য লিবাণ্টের উপকূলবর্ত্তী ছিল। টায়ার রাজ্য অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টের ১৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে নোয়ার প্রপৌত্র সাইভান এই রাজ্যের সূত্রপাত করেন। বণিগ্বৃত্তিই ফিনিসিয়ান জাতির প্রধান অবলম্বন ছিল। ফিনিসিয়ানগণ প্রধানতঃ ভারতজাত দ্রব্য লইয়াই বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। তাঁহারা বাণিজ্যক্ষেত্রে সাতিশয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন এবং অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। কিন্তু এই শ্রীবৃদ্ধির সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সমাজে নানাপ্রকার পাপ প্রবেশ লাভ করে, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের অধঃপতনের দিন উপস্থিত হয়।

গ্রীকবীর আলেকজণ্ডার কর্ত্তৃক টায়ার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আলেকজণ্ডার দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পারস্য রাজ্য আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ কালে ফিনিসিয়ানগণ পারস্য রাজের পক্ষাবলম্বন করেন। একারণ পারস্য জয় সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আলেকজণ্ডার ফিনিসিয়ান-

দের কৃতকার্য্যের প্রতিফল দিবার উদ্দেশ্যে টায়ার আক্রমণ করেন। টায়ার দুর্ভেদ্য ছিল। আলেকজণ্ডার কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধবৎসর ব্যাপী অবরোধের পর টায়ার জয় করেন। তাঁহার আদেশে সমস্ত দেশ ভস্মীভূত এবং অধিবাসিগণ তরবারি মুখে নিহত অথবা দাস-বিপণিতে বিক্রীত হয়। ফলতঃ তিনি টায়ারকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন।

আলেকজণ্ডার ফিনিসিয়ান দিগকে বিধ্বস্ত করিয়াই বিরত হন নাই; পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে বাণিজ্য স্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহাও অভিনব খাতে প্রবাহিত করিয়া তাহাদের পুনরুত্থানের উপায় বিনষ্ট করিতে যত্নশীল হন।

বাণিজ্য পথ

ফিনিসিয়ান গণ জল ও স্থল উভয় পথেই বাণিজ্য করিতেন। বণিকগণ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকট্রিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতেন। এই পথে বাল্ক তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। তাঁহারা ব্যাকট্রিয়া উত্তীর্ণ হইয়া ব্যাবিলন অভিমুখে অগ্রসর হইতেন। এ পথের কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই কাস্পীয়ান সাগর পাওয়া যাইত। তাঁহারা এখানে পৌঁছিয়া অর্ণবযানে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর তীরে উপনীত হইতেন। তাহার পর তথা হইতে স্থল পথে কৃষ্ণ সাগরের তীরে গমন করিতেন, এখান হইতে তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহে এবং ডার্ডিনেলাস্ প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর সকলে পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করিতেন। বণিক গণ কৃষ্ণসাগর পরিত্যাগ করিয়া ব্যাবিলনে গমন করিতেন। ব্যাবিলন হইতে তাঁহারা পশ্চিম মুখে পালমিরায় উপনীত হইতেন। পালমিরা পরিত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী লিভান্টের উপকূলে পৌঁছিতেন। উষ্ট্রই এ পথের প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু এ পথ অতি দুর্গম বলিয়া ফিনিসিয়ান গণ অধিকাংশ সময় জলপথেই গমনাগমন করিতেন। এ পথে মিশরদেশ দিয়া ঘুরিয়া

ভারতবর্ষে যাইতে হইত। কিন্তু মিশর দেশে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্রও প্রভুত্ব ছিল না, সুতরাং এ পথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে মিশরবাসীদের অঙ্গুলি সঙ্কেতেই তাঁহাদের বাণিজ্য স্রোত রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য তাঁহারা কৌশলে অথবা বলে আরবদেশের উপকূলে লোহিত সমুদ্র মুখে কয়েকটী বন্দরে আধিপত্য স্থাপন করেন। ফিনিসিয়ান বণিকগণ এই সকল বন্দর জল পথের প্রবেশ দ্বার রূপে পরিণত করিয়া টায়ার হইতে আরবের উপকূল পর্যান্ত এক অভিনব স্থলপথের উদ্ঘাটন করেন। কিন্তু এই পথ সুদীর্ঘ ছিল বলিয়া ফিনিসিয়ানগণ সত্বরে অন্য পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা ভূমধ্য সাগরের উপকূলস্থ রিণকুলরা নামক বন্দর অধিকার করিয়া তথায় জলপথের প্রবেশদ্বার স্থাপন করেন। ঐ পথ অপেক্ষাকৃত অল্প দীর্ঘ ছিল। এই পথে পণ্যদ্রব্য সকল টায়ার রাজ্যে নীত হইবার পূর্ব্বে অর্ণবযান হইতে দুইবার অবতরণের প্রয়োজন হইত। কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও পণ্য দ্রব্য বহন ব্যয় অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এ কারণ ফিনিসিয়ান বণিকগণ ভারতবর্ষজাত দ্রব্যাদি ইউরোপের দেশ সমূহে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিতেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ফিনিসিয়ান বণিকগণের হস্তগত হইয়া পড়ে।

আলেকজণ্ডার ফিনিসিয়ানদের গৃহীত পথাপেক্ষাও সুগম পথ উদ্ঘাটিত করিয়া ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য তাঁহাদের হস্তচ্যুত করিবার জন্য যত্নবান হয়েন, এবং মিশর দেশ জয়ের পর স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তিনি বাহুবলে মিশরদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে পিরামিড্ পর্য্যন্ত গমন করেন এবং তার পর নীল নদের পশ্চিম শাখা অবলম্বন করিয়া মেরিওটিস্ হ্রদের উপকূলে উপনীত হন। তীক্ষ্ণদর্শী আলেকজণ্ডার মেরিওটিসের উপকূলের অদূরেই সমুদ্রের অবস্থান জন্য সে

যোজক স্থলকে বাণিজ্যের পক্ষে একান্ত উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। এজন্য তিনি তথায় এক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর-কালে এই নগর আলেকজণ্ড্রিযা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ইউরোপ ও এসিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হয়। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য প্রথমতঃ আলেকজণ্ড্রিয়ায় প্রেরিত হইত। তাহার পর তথা হইতে ইউরোপের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িত।

গ্রীক এবং মৈশরিক।

আলেকজণ্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি টলেমি নেগাস মিশর দেশের অধিপতি হয়েন। তিনি আলেক-জেণ্ড্রিয়ায় স্বীয় রাজধানী স্থাপনকরেন। টলেমি নেগাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী টলেমি ফিলাডেলফাস সুয়েজ যোজকের মধ্যে কৃত্রিম নদী খনন করিয়া ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে লোহিত সাগরের সংযোগ বিধান করিতে যত্ন করেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্ন নিষ্ফল হয়। তিনি এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া লোহিত সমুদ্রের পশ্চিম-কূলে বেরিনিস নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। বেরিনিস নগর প্রতিষ্ঠা হইবার পর আলেকজেণ্ড্রিয়ার অভিমুখী বাণিজ্য পথ অত্যন্ত সুগম হয়।

ফিলাডেলফাসের পরবর্ত্তী অধিপতিগণও আলেকজেণ্ড্রিয়ার বহি-র্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য তৎপর ছিলেন। অপরিমিত অর্থাগমের উপায় স্বরূপ বহির্বাণিজ্য রক্ষার জন্য তাঁহাদের বিপুল নৌবল ছিল। নৌ-সৈন্যগণ জলদস্যুর আক্রমণ হইতে বাণিজ্যপথ সমূহ রক্ষা করিত এবং যাহাতে অন্য কোন জাতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উত্থিত হইতে না পারে সে দিকেও দৃষ্টি রাখিত।

পারসীক বণিক।

বাণিজ্যক্ষেত্রে মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সামর্থ্য এক মাত্র পারস্য দেশের ছিল। পারস্য এবং ভারত-বর্ষের মধ্যবর্ত্তী জলপথের দূরত্ব মিশরের পথের তুলনায় সামান্য ছিল। মিশর হইতে ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হইতে

যত সময় অতিবাহিত হইত, তাহার অর্দ্ধ সময়েই পারসীকগণ পৌঁছিতে পারিতেন। এরূপ সুবিধা সত্বেও আরাম-প্রিয় পারসীকগণ ভারতবর্ষের সঙ্গে নৌবাণিজ্যে বিমুখ ছিলেন। তাঁহারা স্থল পথে ভারতীয় কার্পাস ও ক্ষৌমবস্ত্র, রং, ঔষধ, মসল্লা এবং নানা প্রকার মণিমুক্তা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতেন। এই সকল দ্রব্য তাঁহারা নিজেরাই ব্যবহার করিতেন। বিক্রয়ের জন্য অন্য স্থানে প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনে পারসীকগণও ভারতবাণিজ্যে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। রোমান জাতি ১৯০ খৃঃ পূঃ অব্দে সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন করিয়া ইউফ্রেটিসের তীর পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। রোমান জাতির আগমনে পারস্য উপসাগরে বিপুল নৌ-বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। পারস্য উপসাগর হইতে বিপুল পরিমাণে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ইউফ্রেটিস্ নদী দিয়া পালমিরায় নীত হইত। এই বাণিজ্য সংস্পর্শে পালমিরা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। কিন্তু পালমিরার তাদৃশ সমৃদ্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। অপরিমিত ধন লাভে পালমিরাবাসীদের বিলাস তরঙ্গ উত্থিত হয়, সে তরঙ্গের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা নিমজ্জনোম্মুখ হয়েন; পারসীক জাতি তাঁহাদের হস্তস্খলিত বাণিজ্য তুলিয়া নেন।

এই সময়ে কনষ্টাণ্টিনোপলের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পারসীক বণিকগণ কনষ্টাণ্টিনোপলে ভারতজাত রেশমবস্ত্র প্রেরণ করিতেন। কনষ্টাণ্টিনোপলবাসিগণ সাতিশয় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও বিলাস পটু ছিলেন। তাঁহারা বহুমূল্যে এই সকল বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিচিত্র পরিচ্ছদে অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতেন। (১)

(১) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপে রেশম উৎপন্ন হইত না। ভারতজাত রেশমী বস্ত্রের ব্যবসায় পারসীক বণিকগণের একচেটিয়া হওয়াতে উহা অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়া উঠে। ইউরোপিয়ানগণ স্বদেশে রেশম উৎপন্ন করিয়া বিদেশাগত

খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য-স্রোত হঠাৎ মন্দগতি হইয়া পড়ে। এই সময় ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। ইস্-লাম ধর্ম্ম অগ্নিশিখার ন্যায় দেখিতে দেখিতে আরব দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহার পর মোহাম্মদ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলে তদীয় শিষ্যগণ দেশ জয় ও ধর্ম্ম বিস্তার করিতে নিরত হয়েন। তাঁহারা অসাধারণ পরাক্রমে অচিরে পারস্য ও মিশরে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। পারস্য ও মিশরের মধ্যবর্ত্তিতাতেই ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত ছিল। কিন্তু আকস্মিক রাজবিপ্লব নিবন্ধন সে স্রোত মন্দগতি হইয়া পড়ে। ইউরোপের ধনিগণ চীনদেশের পশ্চিম সীমান্ত অক্সাস নদী, আরল হ্রদ এবং কাস্পীয়ান সাগরের পথে ভারতজাত বিলাসদ্রব্য সকল আনয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এ পথ অতি দুর্গম ছিল। এ জন্য এ পথে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য স্রোত পূর্ব্ববৎ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে পারে নাই।

ইসলামের অভ্যুদয়

কিন্তু তাদৃশ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ইস্লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রথম কম্পন দূর হইলেই মোসল-মান অধিকৃত দেশ সমূহ পুনর্ব্বার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। মোসলমান অধিপতিগণ পারস্য ও মিশরের বহির্বা-ণিজ্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তাহা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নশীল হন। তাঁহাদের যত্নে পারস্য ও মিশরের বহির্বা-

খৃষ্টানের ধর্ম্মযুদ্ধ

রেশমী বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিতে উদ্যোগী হন। রোম সম্রাটের অর্থ সাহায্যে কতিপয় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক রেশম উৎপন্ন করিবার প্রণালী শিক্ষার্থ চীন দেশে গমন করেন। তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া ইউরোপে প্রতিগমন করেন। ইহার পর ক্রমশঃ গ্রীস, ইটালী ও সিসিলিতে রেশম উৎপন্ন হইতে থাকে।

ণিজ্য পুনর্ব্বার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। এই উন্নতি চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। সাধু পিটারের জ্বালাময়ী বাক্যে সমগ্র ইউরোপ উন্মত্ত হইয়া খৃষ্টানের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম মোসলমানের কবল (ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর এই স্থান মোসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়) হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করে। ইহার নাম Crusade বা ধর্ম্মযুদ্ধ। ক্রুসেড আরম্ভ হইলে সমগ্র ইউরোপ ও ইসলাম সাম্রাজ্য আন্দোলিত হইয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে মোসলমানের সহিত খৃষ্টানের বাণিজ্য সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়।

ইউরোপীয় বণিক

এই সুযোগে ইউরোপের অন্তর্গত ভেনিস প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য হস্তগত করেন। কালক্রমে সমস্ত বাণিজ্য একমাত্র ভেনিসের বণিকদের হস্তেই পতিত হয়। তাঁহাদের উৎকৃষ্ট সাধনার ফলে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক পূর্ণমাত্রায় সংস্থাপিত হয়। অতঃপর ইউরোপের অন্যান্য সম্প্রদায় ভারতবর্ষের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই ভাবে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য পারস্য ও মিশর হইতে বিক্ষিপ্ত হয়, এবং ইউরোপের খৃষ্টানগণ তাহা হস্তগত করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভেনিস্, গ্রীস ও জেনোয়ার অধিবাসীগণ ভারতবর্ষের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে দিল্লীর দুর্গ-প্রাকারে মোসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল বৈদেশিক বণিক ভারতবর্ষের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। এই সকল বণিক স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া ভারতজাত দ্রব্য সমূহ পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করিতেন।

আর্য্যগণ তৎকালে স্বদেশজাত দ্রব্যাদি লইয়া বিদেশে গমন করিতেন কিনা এবং তদ্বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিনিময়ে বৈদেশিক দ্রব্যাদি

ক্রয় করিয়া আনয়ন করিতেন কিনা এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পুরাকালে আর্য্যগণ ম্লেচ্ছ দেশে গমন ও সমুদ্র যাত্রা করিতেন কিনা তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

পুরাকালে ভারতের রাজন্যগণ দিগ্বিজয় কালে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিতেন, ইহা প্রমাণসিদ্ধ। মহাভারতের সভাপর্ব্বে সহদেবের দিগ্বিজয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "অনন্তর সহদেব সাগর দ্বীপবাসী ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত ভূপতি নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণ, প্রাবরণ, নর-রাক্ষসযোনি-সম্ভব কালমুখ, কোলগিরি, সুরভীপট্টন, তাম্রাখ্য দ্বীপ, রামক পর্ব্বত ও তিমিঙ্গল বশীভূত করিলেন।" মহাভারতের বহু পরবর্ত্তী রঘুবংশেও দেখা যায় যে রঘু দিগ্বিজয় জন্য পারস্যে গমন করিয়াছিলেন। কালিদাসের সময়ে ম্লেচ্ছদেশে গমন নিষিদ্ধ হইলে তিনি কখনও নায়ককে ম্লেচ্ছদেশগামী বলিয়া বর্ণনা করিতেন না। *

হিন্দুজাতির সমুদ্র যাত্রা।

সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসঙ্গত কিনা তন্নির্ণয় জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জেনারল এসেমব্লি কলেজ গৃহে একটী সভা হয়। এই সভায় বেদাচার্য্যপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয় বলেন, "সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে, আর্য্য সমাজে সমুদ্রযাত্রা চিরকাল প্রচলিত ছিল, চারি বেদেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যিনি এ মতের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক, আমি তাঁহার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইব।" আমরা এ স্থলে ঋগ্বেদের একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। ঋগ্বেদের ঋষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন, "যখন বরুণের সঙ্গে আমি নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্র মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের

* যেমন সংযমী পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে ইন্দ্রিয় জয় করেন, তিনও সেই রূপ পারস্যবাসীদিগকে জয় করিতে স্থলপথে যাত্রা করিলেন।

উপর গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন সেই নৌকা রূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।" (ঋগ্বেদ, ৭ম মণ্ডল, ৩৬ সূক্ত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ।) ঋগ্বেদের আর একজন ঋষি (কণ্বের পুত্র প্রস্কর) উষা দেবতার স্তুতি করিয়া বলিতেছেন, "উষা পুরাকালে বাস করিতেন, অদ্যও প্রভাত করিতেছেন। ধনলুব্ধ লোক যেমন সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথ সমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপ প্রেরণ করেন।" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত।)

প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের সহিত যবদ্বীপের পরিচয় হইয়াছিল। সুগ্রীব সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিবার সময় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "তোমরা সপ্তরাজ্য পরিবেষ্টিত যবদ্বীপ অন্বেষণ করিবে।" (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, চত্বারিংশ সর্গ।) রামায়ণের পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের সহিত যবদ্বীপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব উড়িষ্যার ইতিহাস নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বৌদ্ধযুগে ভারতবাসী পূর্ব্বে ও পশ্চিমে রণতরী প্রেরণ করিতেন, এবং ভারতমহাসাগরের এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সন্নিকটস্থলবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করেন। আমাদের ঐতিহাসিকের এই নির্দ্দেশ অমূলক নহে। যব ও বালী প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে অদ্যাপি হিন্দুর আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের ভাষা সংস্কৃত শব্দ-বহুল এবং তাহাদের দেশ হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। যবদ্বীপে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুরূপ দুইখানি কাব্যেরও অস্তিত্ব দেখা যায়। বালীদ্বীপে শালিবাহনের শকাব্দা অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। এজন্য ঐতিহাসিকগণের অনেকে অনুমান করেন যে বৌদ্ধযুগেই এই দ্বীপ-পুঞ্জে ভারতবাসীর উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়।

আমরা এতৎসম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি। রাজতরঙ্গিনীর এক স্থানে লিখিত আছে যে, কাশ্মীরের একজন রাজদূত অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া গমন করিবার সময় হঠাৎ সমুদ্রগর্ভে পতিত হন, এবং একটী তিমি মৎস্য তাহাকে উদরসাৎ করে। কিন্তু তিনি তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হন। বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী কালে সমুদ্রযাত্রা অপ্রচলিত হইয়াছিল। মনুসংহিতা পাঠ করিলে উপলব্ধি হয় যে, তাঁহার সময়েও ভারতবাসী সমুদ্রযাত্রা করিতেন। কিন্তু সমুদ্র গমন তখন প্রশংসিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল না (১)। দৈব দুর্ব্বিপাকে বা অসতর্কতা হেতু অর্ণবযান জলমগ্ন হইলে তজ্জন্য কে দায়ী হইবে ইত্যাদি বিষয় মনুসংহিতায় আলোচিত হইয়াছে।

ভারতীয় অর্ণবযান।

"যুক্তিকল্পতরু নামক একখানি হস্তলিপি গ্রন্থ সংস্কৃত কলেজ পুস্তকালয়ে পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রন্থে জলযান শিল্প বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। * * পালী ও সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল সামুদ্রিক জলযানের বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, সে গুলি খুব বৃহৎ আয়তনের ছিল বলিয়া মনে হয়। (২) যে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া যুবরাজ বিজয়সিংহ সিংহলদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, সেই পোতে তিনি এবং তাঁহার সহচর ৫০০ বণিকও ছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন মুদ্রা এবং ভাস্কর শিল্প হইতেও ভারতবাসীদের জলযানের ব্যবহার দেখান যাইতে পারে। * * দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর অনেক অন্ধ্র মুদ্রার উপরে দ্বিশৃঙ্গ পোত অঙ্কিত দেখা যায়। ঐ পোতগুলি বৃহদায়তন ছিল বলিয়া

(১) তৃতীয় অধ্যায় ১৫৮ শ্লোক।

(২) জনক জাতক, সুপ্পরক জাতক, সমুদ্দ বণিজ জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোতের উল্লেখ রহিয়াছে।

অনুমিত হয়। ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব ঐ মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "কতগুলি মুদ্রার উপরে পোত অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, জ্ঞানশ্রীর (১৮৪—২১৩ খৃঃ) প্রভুত্ব যেমন স্থলভাগে, তেমন জলভাগেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল।" * * উড়িষ্যার জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রস্তরে খোদিত জলযানের ছবি এবং মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ মাদুরার মন্দির গাত্রে অঙ্কিত চিত্রের বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।" (১)

পুরাকালে ভারতবাসী অর্ণবযান নির্ম্মাণে সুদক্ষতা লাভ করিয়াছিল। পুরাকালে সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত ছিল বলিয়া ভারতবাসীরা অর্ণবযান নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সমুদ্রযাত্রার সুপ্রচলন নিবন্ধন ঐ শিল্প সাতিশয় বহ্বায়তন হইয়া উঠে, এবং তজ্জন্য ভারতবাসীরা এত দূর দক্ষতা লাভ করে যে, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হইবার পরেও বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট অর্ণবযান সমূহ নির্ম্মিত হইত। এমন কি, ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভেও ভারতবাসী অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লিখিয়াছিলেন যে, তৎকালে কলিকাতা বন্দরে ভারতবাসী কর্তৃক নির্ম্মিত বহুসংখ্যক অর্ণবযান অবস্থিতি করিত। সেগুন কাষ্ঠ নির্ম্মিত এই সকল অর্ণবযান প্রাচীন ইংলণ্ডের দেবদারু নির্ম্মিত অর্ণবযান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল।

সমুদ্রযাত্রা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য।

ভারতবাসী আর্য্যগণ কি উদ্দেশ্যে ম্লেচ্ছদেশে গমন অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন? বাণিজ্য দ্বারা অর্থ সঞ্চয় এই কার্য্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইহা প্রমাণসিদ্ধ। আমরা সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দুইটী স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার প্রথমটীতে ধন আহরণ অর্থাৎ বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যেও

(১) প্রবাসী, ১৩১৬।

বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র যাত্রার অনেক প্রমাণ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সমুদ্র বাণিজ্যের সাক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে গোকর্ণ নামক একজন অপুত্রক বণিকের সমুদ্র গমনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বরাহ পুরাণ হইতেও একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। "তিনি বহুমূল্য মুক্তা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে রত্নাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া বণিক বেশে সে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে বহু বণিকের সমভিব্যাহারে সমুদ্র যাত্রা কুশল লোকের সাহায্যে গমন করিলেন।"

চীনে ভারত বণিক

খৃষ্টের জন্মের সাতশত বৎসর পূর্ব্বে বহুসংখ্যক ভারতীয় বণিক চীনদেশে গমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টা বলে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবোপবিষ্ট ভারতীয় বণিকগণ সর্ব্বসাধারণের সম্মান ভাজন ছিলেন; চীনদেশের সর্ব্বত্র তাঁহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের যত্নেই চীনদেশে সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। নবাবিষ্কৃত কতিপয় চৈনিক মুদ্রাই এই সকল অভিনব তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে, পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। পথিয়ার নামক একজন খ্যাতনামা ফরাসী পুরাতত্ত্বজ্ঞ এই বচনের আলোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টের জন্মের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশের সর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় রাজদূতগণ উপঢৌকন

স্বরূপ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া চৈনিক রাজ সভায় আগমন করিতেন, ইহার বিবরণ তদ্দেশীয় রাজ বিবরণীতে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতৎ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তর হার্থ লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল রাজদূত ছদ্মবেশী বণিক মাত্র ছিলেন, তাঁহারা রাজকৃপা লাভ করিয়া আপনাদের বাণিজ্যের সৌকর্য্যবিধান উদ্দেশ্যে সুদূরবর্ত্তী ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে উপঢৌকন আনয়নের ভান করিতেন।

বহুসংখ্যক চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন; ইঁহাদের অনেকে ভারতীয় বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত অথবা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। প্রসিদ্ধনামা চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান এবং আই-তসিঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের এই নির্দ্দেশের যথার্থতা প্রমাণিত হইবে।

দিগ্বিজয় ও বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবীর সহিত কীদৃশ সম্পর্ক স্থাপিত ছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার সাধন করিয়াছেন। আমরা এক্ষণ তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতে মনন করিয়াছি।

ধর্ম্ম প্রচার।

আর্য্যগণ বেদোক্ত ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বহির্ভাগে প্রচার জন্য প্রচারক প্রেরণ করিতেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে তাঁহারা ভারতবর্ষের বহির্ভাগে ধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত করেন। "পূর্ব্বে লোকে আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত; সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমস্ত মনুষ্য জাতিকে এক ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে, এ নূতন ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে প্রথম উদিত হয়!" (১)

(১) ৺কৃষ্ণবিহারী সেন।

বুদ্ধদেব উৎকট সাধনা বলে জীবের দুঃখ নিবৃত্তির অপূর্ব্ব পথ দেখিতে পান এবং মনুষ্য মাত্রকেই এই পথের যাত্রী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তিনি প্রবলোৎসাহ এবং ওজস্বিতা সহকারে ন্যূনাধিক ৪৫ বৎসর কাল অযোধ্যা, মিথিলা, বারানসী প্রভৃতি বহু স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে দেহ পরিত্যাগ করেন। আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যে নবোদ্ভূত মৈত্রী এবং আত্ম-সংযমের ধর্ম্ম বিস্তার বুদ্ধদেবের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। একদা কতিপয় পণ্ডিত তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল সূত্র সকল সংস্কৃত ভাষায় প্রচার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুরোধে বুদ্ধদেব অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, দীন হীন পাপী তাপী সকল শ্রেণীর লোকের পরিত্রাণ জন্য আমার এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে; দুর্ব্বোধ সংস্কৃত ভাষায় উহার সূত্র সকল প্রচার করা সঙ্গত নহে। সুতরাং একমাত্র দেশ চলিত ভাষার ব্যবহার জন্য নিয়ম করিলাম। বস্তুতঃ আর্য্য অনার্য্য, উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রকেই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের পথ প্রদর্শন জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কারণ ঐ ধর্ম্ম অচিরে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে এবং তারপর অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের গণ্ডীর বহির্ভাগে নীত হয় ও একদেশ হইতে অন্য দেশে প্রচারিত হইতে থাকে।

চিরখ্যাত মহারাজ অশোকের রাজত্ব কালে (২৬০—২২ খৃঃ পূঃ) কি স্বদেশে, কি বিদেশে সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও উদ্যোগ হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্ব কালের সর্ব্বোত্তম কার্য্য বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। মহারাজ অশোকের রাজত্ব কাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে মাহেন্দ্র ক্ষণ স্বরূপ ছিল। কারণ অশোকের প্রবল প্রতাপ বশতঃ বৈদেশিক রাজন্যকুল তাঁহার সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের

রাজন্যগণ তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সকল দেশের লোকেরা আগ্রহসহকারে তাদৃশ মহিমান্বিত সম্রাটের প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রচারক গণের অমৃত তুল্য উপদেশাবলী শ্রবণ করিত।

অশোকের ধর্ম্ম প্রচার।

বুদ্ধদেব স্ব-অভিমতানুযায়ী ধর্ম্মের জন্য কোন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যান নাই। এই কারণ তাঁহার নির্ব্বাণ লাভের পর তদীয় কথা বার্ত্তা উপদেশ নিয়মাদি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক হইয়া উঠে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের কিছুকাল পরেই রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপের মন্ত্রণায় তদর্থ রাজগৃহে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের এক সভা আহ্বান করেন। ইহার ন্যূনাধিক একশত বৎসর পরে রাজা কালাশোকের উদ্যোগে ও যত্নে বৈশালী নগরীতে আর একটী সভার অধিবেশন হয়। এই দুই সভায় বুদ্ধদেবের কথাবার্ত্তা, উপদেশ নিয়মাদি সঙ্কলিত হইয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রস্তুত হয়। মহারাজ অশোকের রাজত্ব কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক আড়াই শত বৎসর হইয়াছিল। তৎকালে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা কত ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; বস্তুতঃ তাহারা ঐ সময়ে ১৮টী স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত ছিল। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আপন সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য সর্ব্বাগ্রে বিভিন্ন বৌদ্ধমত ও দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা আবশ্যক। এই কারণ তিনি পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের এক সভা আহ্বান করেন। "অশোকের সভায় বৌদ্ধ শাস্ত্র পুনর্ব্বার সমালোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার, বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক ও

অভিধর্ম্ম পিটক"। (১) এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ইহাতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রণালী, প্রায়শ্চিত্তবিধান, নীতি, উপাখ্যান, দর্শন, শাস্ত্র, প্রভৃতি বিনিবেশিত আছে।" (২)

ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ অশোক, বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাস্ত্রের ঐক্যবিধান অন্তে উহার প্রচার জন্য তিনটী উপায় অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহির্ভাগে প্রচারক প্রেরণ। অশোকের আদেশে তাঁহার প্রচারকেরা ভারতে এবং "ভারত ছাড়িয়া নানা দেশ বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয় কীর্ত্তন" করিতে প্রবৃত্ত হন। দ্বিতীয়তঃ "প্রজাদিগকে ধর্ম্মের পথে রাখিবার জন্য অশোক ধর্ম্মযাত্রা নাম দিয়া বহু সংখ্যক নৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র সকল শ্রেণীর আচার ব্যবহার রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং দুরাচার দেখিলেই মহারাজকে তদ্বিষয়ে অবগত করাইতেন। কেবল ভারতে নহে, শোণ, কম্বোজ, গান্ধার, নরাস্তিক, পেতেনিক প্রভৃতি অপরান্ত প্রদেশে যে সকল অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বাস করিত, তাহাদিগেরও রীতি নীতি দেখিবার ভার ইঁহাদের উপর ছিল। তৃতীয়তঃ সে সময় মুদ্রাঙ্কন প্রথা ছিল না। পুস্তক কিম্বা গেজেট দ্বারা এখনকার রাজ-পুরুষেরা যেমন নিয়মাদি প্রকাশ করেন, তখন সেরূপ ছিল না। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত এবং মহারাজের অনুজ্ঞা অবগত করান আবশ্যক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অশোক একটী আশ্চর্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। তিনি নানা স্থানে শিলাস্তম্ভ এবং প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল আজ্ঞা ও

(১) বিনয় পিটক অংশে বৌদ্ধ সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী লইয়া সূত্ত পিটক অংশ রচিত। বৌদ্ধ দর্শনের নাম অভিধর্ম্ম পিটক।

(২) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

নিয়ম সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত, তাহা সুন্দর পরিস্কার অক্ষরে এই সমুদয় স্তম্ভে ও ফলকে খোদিত করা হইত।” (১) মহারাজের ঈদৃশ আদেশগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; (১) অশোক অনেক আদেশ পর্ব্বত গাত্রে খোদিত করিয়াছিলেন, অদ্য পর্য্যন্ত এই প্রকার ১৪টী আদেশ-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (২) অশোকের কতগুলি আদেশ শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, এইরূপ আবিষ্কৃত স্তম্ভের সংখ্যা ৮। (৩) এতদ্ব্যতীত পর্ব্বত গুহার অভ্যন্তরে কতিপয় আদেশ উৎকীর্ণ দেখা গিয়াছে। অশোকের আদেশলিপি সকল বিচিত্র ঐতিহাসিক তত্ত্বে পূর্ণ। আমরা এখানে মাত্র একটী লিপির বঙ্গানুবাদ করিতেছি।

দেবগণের প্রিয় (রাজা) আগ্রহ সহকারে সর্ব্ব জীবের মঙ্গল, জীবন রক্ষার জন্য, যত্ন শান্তি এবং দয়ার প্রার্থনা করিতেছেন। দেবগণের প্রিয়পাত্র এই সমস্তকেই ধর্ম্মের বিজয় (নিশান) রূপে গণ্য করিয়া থাকেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং সাম্রাজ্যের অপরান্তে বহু শত যোজন ব্যাপিয়া ধর্ম্মের এই বিজয় নিশান বিস্তীর্ণ করিয়াই তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহার (প্রতিবেশী রাজন্যকুল) মধ্যে যবন রাজ এণ্টিওকাস এবং তাঁহার পর অপর চারি জন রাজা টলেমী, এণ্টিগোনাস, মাগ এবং আলেকজেণ্ডারের রাজ্যে (২) দক্ষিণে চোল ও পাণ্ড্য, এবং গ্রীক, কম্বোজ, লঙ্কা, ভোজ, পেতেনিক, অন্ধ্র, পুলিন্দ,

(১) ৺কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত অশোক চরিত হইতে গৃহীত। কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

(২) 1. Antiochus of Syria, 2. Ptolemy of Egypt, father of Ptolemy Philadelphus 3. Antigonus of Macedon, 4. Magas of Cyrene 5. Alexander of Epirus, maternal uncle to Alexander the Great প্রিয়দর্শী অশোকের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। অশোক তাঁহাদের সম্মতি ক্রমে তাঁহাদের রাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নাবপন্তা,—সকল স্থানেই তাঁহারা দেবগণের প্রিয় পাত্রের উপদেশ মান্য করিতেছেন। যেখানেই দেবগণের প্রিয় পাত্রের দূত প্রেরিত হইয়াছে, সে স্থানের লোকেরাই দেবগণের প্রিয়পাত্রের অনুজ্ঞায় প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছে, তারপর সেই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের উপদেশ পালন করিতেছে এবং করিবে। চারি দিকেই এই বিজয় নিশান প্রোথিত হইয়াছে। ইহাতে আমি অপার আনন্দ লাভ করিতেছি। ধর্ম্মের জয়ে ঈদৃশ সুখই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সত্যকথা বলিতে হইলে এই সুখ গৌণ ফল মাত্র। পর জীবনে যে ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, তাহাই দেবগণের প্রিয়পাত্র অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করেন। যাহাতে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ নূতন জয় প্রয়োজনীয় বিবেচনা না করে, যাহাতে তাহারা তরবারি দ্বারা লব্ধ জয় প্রকৃত জয় বলিয়া বিবেচনা না করে, যাহাতে তাহারা তরবারি-লব্ধ জয়ে কেবল বিনাশ ও পাশবিক বল দেখিতে পায় এবং যাহাতে ধর্ম্মের জয় ব্যতীত আর কোন জয়ই প্রকৃত জয় বলিয়া গ্রহণ না করে, তজ্জন্যই এই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুশাসন লিপি উৎকীর্ণ হইল। ধর্ম্মের জয়ই ইহকালে ও পরকালে সদ্গতি আনয়ন করে তাহারা যেন কেবল ধর্ম্ম হইতেই আনন্দ লাভ করে, কারণ তাহাই ইহকালে এবং পরকালে মূল্যবান।

এই অনুশাসন লিপি পাঠ করিলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক সহজেই মহারাজ অশোকের উদ্দেশ্যে অবনত হইয়া পড়ে। আমরা উহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। ইহা অশোকের ধর্ম্মপ্রাণতা, উদার চরিত্র ও উন্নত মনের একখানি পরিস্কার চিত্রপট। সর্ব্বজীবে তাঁহার দয়াছিল, ধর্ম্ম সম্পদই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কি ভারতে কি ভারতের বহির্ভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার জন্য তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ ও যত্ন ছিল। আমরা প্রাগুক্ত অনুশাসন লিপি হইতে অশোকের সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা জানিতে পারি।

আমরা আর জানিতে পারি যে অশোকের যত্ন ও উদ্যোগে ভারতবর্ষের বহু স্থানে ও অপরান্ত প্রদেশ সকলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত সুদূর শিরিয়া, গ্রীশ ও মিশর দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন হইয়াছিল।

প্রাগুক্ত অনুশাসনলিপিধৃত তালিকা সম্পূর্ণ নহে। ঐ সকল স্থান ব্যতীত আরও নানা দেশে মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাবংশ নামক গ্রন্থে ঐ সকল দেশের একটী তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে সে তালিকাটী উদ্ধৃত করিতেছি।

দেশের নাম	প্রচারকের নাম
১। কাশ্মীর ও গান্ধার *	মজ্ঝন্তিক।
২। মহিষামণ্ডল (গোদাবরী নদীর দক্ষিণ অংশ),	মহাদেব।
৩। বনবাসী (কর্ণাট মহীশূর)	রক্ষিত।

* গান্ধারের বর্ত্তমান নাম কান্দাহার। ইহা কাবুলরাজ্যের অন্যতম অংশ। কুরুক্ষেত্রের সমর কালে গান্ধারে ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতিরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টের জন্মের ন্যূনাধিক ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে পারস্যাধিপতি দারায়ায়ুস ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত করেন। কিন্তু খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার হিন্দুর আধিপত্য ঐ সকল প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর গ্রীক বীর আলেকজেণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত গ্রীক অধিকার সংস্থাপন করেন। আলেকজেণ্ডারের মৃত্যু হইলে আর্য্যাবর্ত্তের রাজকুলসিংহ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইহার পর ব্যাক্‌ট্রিয়া নামক স্থানে এক স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ কাবুলেও ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীকগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের

৪।	অপরান্ত (সিন্ধু নদের পশ্চিম দিগস্থ ভারতের বহির্ভূত ব্যাকট্রিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশ সকল)	যোন, ধর্ম্ম ও রক্ষিত।
৫।	মহারাষ্ট্র,	মহাধর্ম্ম রক্ষিত।
৬।	যোন লোক (গ্রীশ)	মহারক্ষিত।
৭।	হিমবন্ত (মধ্য হিমালয় অর্থাৎ তিব্বত প্রভৃতি)	মজ্ঝিম, দুরভিসার এবং মূলক দেব।
৮।	সুবর্ণ ভূমি (সম্ভবতঃ মলয় উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান)	সেন এবং উত্তর।
৯।	লঙ্কা	মহেন্দ্র প্রভৃতি।

১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীকগণ নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়া পড়েন এবং তুরেনীয় জাতির ইউচি বংশীয়গণ তাহাদের অধিকৃত স্থান সমূহ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এই বংশের হবিষ্ক নামক একজন নরপতি কাবুলে অধিকার স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি সসৈন্যে কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া তথায় এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। তদীয় উত্তরাধিকারী পুষ্ক এবং কনিষ্ক কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কনিষ্ক খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনিষ্ক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। হিউএন্থ সাঙ্গের মতে সমগ্র কাবুল উপত্যকা, পেশোয়ার, পঞ্জাব ও কাশ্মীর তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল। তিনি কাবুল ও ইয়ারকন্দ হইতে আগ্রা ও গুজরাট পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কনিষ্ক জম্বুদ্বীপাধিপতি উপাধি গ্রহণ করেন। ইউ-চি বংশীয়গণ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। কনিষ্ক নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী ছিলেন, পরে ঘটনাচক্রে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উহার প্রচারকল্পে প্রবলোৎসাহে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন।

কনিষ্কের পরলোক গমনের পর তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত তালিকা দুইটী পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, মহারাজ অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন. কেবল স্বদেশে নহে, ভারতগণ্ডীর বহির্ভাগে বিপুল ভূখণ্ডে তাঁহার সাধনাবলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছিল।

মহারাজ অশোকের পরলোক গমনের পরেও ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের প্রথা অব্যাহতছিল, এবং তৎফলে অনেক দেশে ঐ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিয়াছিল। কি ভারতবর্ষে, কি ভারত-বর্ষের বহির্ভাগে, সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির বিবরণ অতি মনোরম। ভারতবর্ষের বহির্ভাগে কতিপয় দেশে (বর্ত্তমান সময়ে এই সকল দেশে—আমেরিকা ব্যতীত—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে।) কি ভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আমরা এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

কিন্তু কাবুলে বহুকাল পর্য্যন্ত ইউ-চি বংশের শাসন বদ্ধমূল ছিল। অলবেরুণীর মতে ৬০ জন অধিপতি কাবুলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকে যদি গড়ে ১৩ বৎসর করিয়া রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কাবুলে ইউ-চি বংশের শাসনকাল ৭৮০ বৎসর ব্যাপী ছিল। ৭৮ খৃষ্টাব্দ কনিষ্কের সিংহাসনের আরোহণের কাল। এই সময়ের সঙ্গে ৭৮০ বৎসর যোগ করিলে আমরা ৮৫৮ খৃঃ অব্দে উপনীত হই। বস্তুতঃ ৮৫০ খৃষ্টাব্দেই এই প্রাচীন বংশের রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ইউ-চি বংশের শেষ নরপতির নাম কনক অথবা কাটরমান। তাঁহার মন্ত্রীর নাম কলার (কহ্লার?), তিনি ব্রাহ্মণ বংশ-সম্ভূত ছিলেন। রাজমন্ত্রী সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বরপুত্র ছিলেন। তিনি ভূগর্ভে বহুধন-রত্ন লাভ করিয়া অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। কনক নীচমতি প্রজাপীড়ক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মন্ত্রী কলারের শরণাপন্ন হন। কলার রাজার চরিত্র সংশোধন করিবার মানসে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু অবশেষে রাজ্যলালসা রাজমন্ত্রীর হৃদয়ে অধিকার করে। তিনি আপনার বিপুল অর্থের সাহায্যে সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া সিংহাসনে

লঙ্কা বা সিংহল

অনৈতিহাসিক কালেই লঙ্কার সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামায়ণ বর্ণিত ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিংহলে দ্বীপবংশ নামক একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে যে, আদিকালে লঙ্কাদ্বীপে রাক্ষস নামক এক জাতির বাস ছিল। পরবর্ত্তী কালে সুসভ্য ভারতবর্ষীয়গণ লঙ্কা-দ্বীপ জয় করেন এবং তদবধি ঐ দ্বীপে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হয়।

যাহা হউক, অনৈতিহাসিক কালের কথা পরিত্যাগ করিয়া ঐতি-হাসিক কালে লঙ্কাদ্বীপের সহিত ভারতবর্ষের কীদৃশ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ সম্বন্ধ হেতু ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা কিরূপ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল, তাহাই আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সিংহবাহু নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে স্থান বঙ্গ দেশ বলিয়া পরিচিত, তাহার এক অংশে সিংহবাহুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ছিলেন। এই কারণ সিংহবাহু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করেন; অতঃপর বিজয় সাত শত সহচর সমভিব্যাহারে সমুদ্র পথে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন। এবং তত্রত্য অধিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া সে দেশের আধিপত্য গ্রহণ করেন। এইভাবে সুদূরবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপে বাঙ্গালীর বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। এরূপ কথিত আছে

আরোহণ করেন। কলারের মৃত্যুর পর সামন্ত, কমল, ভীম, জয়পাল, আনন্দপাল, দ্বিতীয়জয়পাল, এবং ভীমপাল ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। ভীমপালই এই হিন্দুরাজ-বংশের শেষ নরপতি। ভীমপালের পর বংশে বাতি দিতে আর কেহ ছিল না। আলবেরুণী লিখিয়াছেন যে, কাবুলের হিন্দুরাজন্যবর্গ নানাগুণালঙ্কৃত, সত্যসন্ধ এবং সদ্ব্যবহারী শাসন কর্ত্তা ছিলেন।

যে. বুদ্ধদেবের মানবলীলা সংবরণের বর্ষে বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক লঙ্কাদ্বীপ বিজিত হইয়াছিল। বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপে কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস পিতৃব্যের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন এবং তত্রত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাণ্ডুবাসই লঙ্কার ঐতিহাসিক রাজবংশের আদিপুরুষ: সিংহবংশের রাজ্যাধিকার হইতে লঙ্কার নাম সিংহল হইয়াছে।

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সিংহল বিজয়ের ন্যূনাধিক আড়াই শত বৎসর পরে আবার সিংহলের সহিত ভারতবর্ষের অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময় অর্থাৎ ২৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে মঙ্গলীপুত্র তিষ্য সিংহলের আধিপত্যে বৃত ছিলেন। তিষ্য মহারাজ অশোককে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রচারক প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান, তদনুসারে মহারাজ স্বীয় পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। মহেন্দ্র বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে তাম্রলিপ্ত বন্দরে (আধুনিক তমলুক) অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া সিংহলে উপনীত হন। সিংহলের রাজা "দেব নাম প্রিয়" উপাধিধারী তিষ্য তাঁহাকে অতি সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, তিষ্য অনতিবিলম্বে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহার পরই চারিদিকে অতি সুন্দর সুন্দর বিহার এবং স্তূপ সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। অনুরাধাপুর নগরের অনতিদূরে মহেন্দ্রের জন্য একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। সে গৃহ এখনও বর্ত্তমান আছে। স্থানটি মনোরম ও সুন্দর। চারিদিকে পর্ব্বত। সূর্য্যের কিরণে তাহা উত্তপ্ত হয় না, লোকের কোলাহল সেখানে পৌঁছে না। সেইখানে মহেন্দ্র ধ্যান করিতেন এবং লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন। সেই খানেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন এবং সেইখানে তাঁহার ভস্ম এখনও একটি স্তূপের

নিম্নে সঙ্কিত আছে। * * দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল কীর্ত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সমুদয়ই এখনও বর্ত্তমান আছে। সিংহলের রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া মহারাণী অনুলা এবং তাঁহার সখীরা ভিক্ষুণী হইবার মানস প্রকাশ করিলেন। মহেন্দ্র তাহা শুনিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্ম ব্রতে দীক্ষা আমার দ্বারা হইবে না। পাটলীপুত্র নগরীতে আমার সঙ্গমিত্রা নাম্না ভগিনী আছেন, তাঁহাকে আনিতে পারিলে সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। মহারাজ তিষ্য ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ অশোকের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন এবং কিছু কাল পরে মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্গমিত্রা, উত্তরা, হেমা, মালাগন্না, অগ্নিমিত্রা, তপা, পর্ব্বতছিন্না, এবং ধর্ম্মদাসী নাম্নী আটজন ভিক্ষুণী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহলে গমন করিলেন। সঙ্গমিত্রা নিজেও একজন ভিক্ষুণী ছিলেন। তিনি সঙ্গে করিয়া একটি বহুমূল্য পদার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। বুধ গয়াতে যে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় শাক্যসিংহ দিব্যজ্ঞান পাইয়া বুদ্ধ হন, সেই বোধি বৃক্ষের একটি শাখা লইয়া গিয়া তিনি অনুরাধাপুর নগরে পুঁতিয়া দেন। সেই ক্ষুদ্র শাখা বৃদ্ধি পাইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয় এবং সেই বৃক্ষ এখনও জীবিত আছে। (১) রাজকুমার মহেন্দ্র ও তদীয় ভগিনী ভিক্ষুণী সঙ্গমিত্রার প্রাণগত যত্নে সমগ্র সিংহল দ্বীপে বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। মহারাজ অশোকের মহাসভা কর্ত্তৃক গৃহীত ত্রিপিটকশাস্ত্রসম্মত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল। ফলতঃ অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কীদৃশ প্রভাব ছিল, তাহা জানিতে হইলে সিংহলের ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে হইবে।

(১) ৺কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত অশোকচরিত।

নেপাল

শক (তুরেণীয়) জাতি হইতে ব্রিজি নামে এক নূতন বংশের উদ্ভব হয়। খৃষ্টের পূর্ব্বতন সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক এই ব্রিজিরা মিথিলায় প্রবিষ্ট হয়েন। তৎকালে অতি প্রাচীন বিদেহ বংশ মিথিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রিজি জাতির আক্রমণে বিদেহ বংশ মিথিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তদবধি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মিথিলা পরাক্রান্ত ব্রিজি জাতির পদানত থাকে। বৈশালী নগরীতে ব্রিজি জাতির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান পাটনার ২৭ মাইল দূরে বেসাড় নামে যে প্রাচীন স্থান বিদ্যমান আছে, তাহাই প্রাচীন বৈশালী বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব ব্রিজি জাতির প্রধান লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বজাতীয় সাধারণ লোকের মধ্যে তাহা প্রচার করিতে থাকেন। ব্রিজি জাতি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লিচ্ছবি ক্ষত্রিয় নামে আপনাদিগকে পরিচিত করেন। ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে বুদ্ধদেব মানব লীলা সংবরণ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে মগধাধিপতি অজাতশত্রুর অধর্ষণীয় পরাক্রমে লিচ্ছবি জাতি স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হন। (১) এবং অসংখ্য লিচ্ছবি আত্ম-সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে নেপাল প্রভৃতি নানা দুর্গম দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লিচ্ছবিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই কারণ তাঁহাদের আগমনের ফলে নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সূচিত হয়। ইহার ন্যূনাধিক আড়াইশত বৎসর পরে মহারাজ অশোক নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরক করেন। এইভাবে নেপালে ধীরে ধীরে

---

(১) ১৩০২ সালের নব্যভারতে ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত নেপালের পুরাতত্ত্ব নামক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। তারপর অনুমান ৩১৫ খৃষ্টাব্দে লিচ্ছবিবংশীয় জয়বর্ম্মণ নেপালের রাজসিংহাসন অধিকার করেন এবং নেপালবাসী আপামর সাধারণের মধ্যে স্বধর্ম্মের প্রচলন জন্য যত্নশীল হন। ফলতঃ লিচ্ছবি বংশের রাজত্বকালে নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

মধ্য এসিয়া

মহারাজ অশোকের 'কুস্থান' নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যোতিষ শাস্ত্রবেত্তৃগণ গণনা করিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, এই পুত্র পিতার জীবদ্দশায় রাজ্য অধিকার করিবেন। মহারাজ অশোক ইহাতে ভীত হইয়া 'কুস্থান'কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া রাজকুমার চীনদেশে নীত হন, তত্রত্য অন্যতম অধিপতি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। রাজকুমার 'কুস্থান' বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তদীয় পুত্রগণের বিষ দৃষ্টিতে পতিত হন। একারণ তিনি দশ সহস্র সহচর সমভিব্যাহারে চীন দেশ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান খোটান নামক স্থানে গমন করেন।

প্রাগুক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে মহারাজ অশোকের যশা নামক জনৈক অমাত্য স্বীয় প্রভুর সহিত মনোমালিন্যবশতঃ ভারতবর্ষ হইতে 'কুস্থানে'র সমীপে উপনীত হন। সাত হাজার ভারতবাসী তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল।

তৎকালে খোটান জন-মানবশূন্য ছিল। 'কুস্থান' যশার সহিত মিলিত হইয়া তৎস্থানে এক উপনিবেশ স্থাপন করিতে নিরত হন। 'কুস্থান' নবপ্রতিষ্ঠিত উপনিবেশের রাজপদে এবং যশা অমাত্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। খোটানরাজ্য স্থাপনের কিঞ্চিদধিক দেড়শত-বৎসর পরে বিজয়সম্ভব সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের

পঞ্চম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম সেখানে সর্ব্বপ্রথমে প্রবিষ্ট হয়। আর্হৎ বৈরোচন (Vairot chana) ভিক্ষুর বেশে খোতানে উপস্থিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে ধর্ম্মগুরুর পদে বরণ করিয়াছিল। রাজা বিজয়সম্ভব স্বরাজ্যে একটী সুবৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বিজয়সম্ভবের অধস্তন দশম পুরুষ রাজা বিজয়জয়ের তিন পুত্র ছিল। ধর্ম্মানন্দ নামক রাজ-কুমার সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুর বেশে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার জন্য মনঃপ্রাণে নিয়োজিত হন।

অতঃপর শকাধিপতি মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে সমগ্র মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মহারাজ কনিষ্ক সুবিস্তৃত ভূভাগের অধিকারী ছিলেন। কাবুল, হিন্দুকোশ, বোলার পর্ব্বতমালা, ইয়ারকন্দ, কোকন, কাশ্মীর, লাডক ও মধ্য হিমালয় (হিমবন্ত) প্রভৃতি স্থানে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করে। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রবলোৎসাহে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। তদীয় অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে ; তারপর ক্রমশঃ সমগ্র মধ্যএসিয়ায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

চীন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহ।

এক অপূর্ব্ব সূত্রে চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের ন্যূনাধিক আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে একদল চৈনিক সৈন্য তরবারী হস্তে ইয়ারকন্দ অতিক্রম করিয়া হিওয়ান নামক দেশে উপনীত হয়। তৎকালে এই দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। চৈনিকসৈন্যদল সেখানে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তাহা স্বদেশে লইয়া যায়। ইহাতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম পরিচয়

ঘটে। তারপর ২:৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতীয় পরিব্রাজকগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে চীনদেশে গমন করেন। কিন্তু তাহাদের এই প্রচার যাত্রায় বিশেষ কোন ফল লাভ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ৬১ খৃঃ অব্দে উত্তর চীনের অধিপতি মিঙ্গটি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দর্শন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী হন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ ও প্রচারক আনয়ন জন্য দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার এই আহ্বানে কাশ্যপ মাতঙ্গ কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে চীনদেশে গমন করেন। তিনি চীন ভাষায় একখানি মূল্যবান সূত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সৌকর্য্য বিধান করেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে উত্তর চীনের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। এই সময় হইতে উত্তর চীনের নানা স্থানে সুবৃহৎ বৌদ্ধ সঙ্ঘ সমূহের প্রতিষ্ঠা আরব্ধ হয়। ৪০৫ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্য চীনদেশে উপনীত হন। টিসিন প্রদেশের অধিপতি তাঁহাকে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই ঘটনা চীনের বৌদ্ধ ইতিহাসের একটি স্মরণযোগ্য বিষয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কুমারজীব রাজাদেশে বহুসংখ্যক বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। চৈনিক বৌদ্ধ সাহিত্যের শীর্ষদেশে কুমারজীবের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। ৪২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে ঘোর রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। ইহার ফলে সমগ্র চীনদেশে ওয়াই বংশের আধিপত্য স্থাপিত হয়। ওয়াই বংশের প্রথম নরপতি বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তদীয় উত্তরাধিকারিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং প্রবলোৎসাহে স্বধর্ম্মের প্রচারে ব্রতী হন। সমগ্র চীনদেশ এক রাজবংশের শাসনাধীন এবং সে রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী হওয়াতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার অতি দ্রুতবেগে সম্পন্ন হইয়াছিল।

উত্তরচীনের ন্যায় মধ্য এবং দক্ষিণ প্রদেশেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়; চীনের অধিকাংশ অধিবাসী অচিরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কোচিন, চীন, ফরমোজাদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়াতে নীত হইয়াছিল। এই সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বদ্ধমূল হইবার সময়েই তাহা কোরিয়াতেও বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তরচীনের অধিপতি ৩৭২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে কোরিয়াদেশে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রচারকের নাম ছিল সুন্দ। তৎকালে কোরিয়া দেশ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল; কোকুরাই, পাকশী ও শিলা। সুন্দ কোকুরাইর অধিপতির নিকট গমন করেন। তিনি সেখানে সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া রাজসহায়তায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। দুই বৎসর মধ্যেই কোকুরাইর রাজধানীতে কতিপয় বিহার স্থাপিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারসূত্রে কোকুরাইর অধিপতির সঙ্গে উত্তরচীনের অধিপতির ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইহাতে ভীত হইয়া পাকশীর অধিপতি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার দ্বারা উত্তর চীনের অধিপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে অভিলাষী হন এবং তদর্থ প্রচারক আনয়ন জন্য দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার আহ্বানে মরানন্দ নামক বৌদ্ধভিক্ষু দশজন সহচর সমভিব্যাহারে পাকশী প্রদেশে উপনীত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি পত্তন করেন। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে শিলা প্রদেশের অধিপতি বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং স্বরাজ্যে ঐ ধর্ম্ম প্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। এইভাবে কোরিয়া দেশের তিন প্রদেশেই বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে সুসময় ইহার পরবর্ত্তী কালে উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে একজন বৌদ্ধভিক্ষু রাজবিপ্লব সংঘটন পূর্ব্বক তিন প্রদেশ একত্র সংযুক্ত করিয়া কোরিয়া সাম্রাজ্য গঠন করেন। এই অপরিসীম শক্তিশালী ভিক্ষুর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে হত্যা করেন এবং

তাহার পর অন্তরঙ্গবৃন্দের সহায়তায় স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ক্রূরকর্ম্মা নবীন সম্রাট এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ কোরিয়া দেশে ন্যূনাধিক পাঁচশত বৎসর রাজত্ব করেন। নবাভিষিক্ত সম্রাট প্রবলোৎসাহে এবং ঐকান্তিক যত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্রতী হন এবং অচিরে কোরিয়াবাসী মাত্রেই সে ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই সময় রাজবিধি প্রচারিত হয় যে, কোন ব্যক্তির তিন পুত্র থাকিলে তাহাদের একজনকে বৌদ্ধসঙ্ঘভুক্ত করিতে হইবে।

জাপান

কোরিয়া হইতে জাপানে বোদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ৫৫২ খৃষ্টাব্দে কিমাই তেনো জাপানের রাজসিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। এই সময় কোরিয়ার অন্তর্গত কোদারা অর্থাৎ পাকশী প্রদেশের অধিপতি সম্রাট কিমাই তেনোকে বোদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের কতিপয় গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন। সম্রাট কিমাই তেনো বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়া অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করেন। জাপানীরা চিরকাল কোরিয়ার সভ্যতার অনুরাগী বলিয়া সহজেই বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কতিপয় রাজমন্ত্রী প্রতিকূলাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় জাপানে হঠাৎ ভীষণ মড়ক দেখা দেয়। বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী মন্ত্রিগণ জাপানীদের পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ জনিত পাপই এই লোকক্ষয়ের কারণ রূপে নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। যাহাহউক, ৪০ বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর কিমাই তেনোর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ সোটোকু তৈসি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহা রাজধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্রাট সোটোকু তৈসি জনপ্রিয় ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় জাপানী মাত্রেই বুদ্ধ ও তদীয় ধর্ম্মের শরণাপন্ন হয়।

ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশ

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম শাস্ত্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ও বৌদ্ধধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যার অভাবে জনসাধারণ কুসংস্কারাপন্ন হইয়া উঠে। ৪৩০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ-ঘোষ নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পরিব্রাজক সিংহলে উপনীত হন। বুদ্ধ-ঘোষ বুদ্ধগয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সিংহলে উপনীত হইয়া ধর্ম্মের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হন এবং সমস্ত কূটতর্ক ও কুব্যাখ্যার অপলাপ করিয়া তাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য উদ্ঘাটন করিতে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর বুদ্ধঘোষ উৎকট পরিশ্রমে বিশুদ্ধি-মার্গ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সিংহলবাসী আচার্য্যগণ তাঁহার সুগভীর শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মুগ্ধ হন; সিংহলের ধর্ম্মমণ্ডলী তাঁহাকে পালি ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র পুনর্ব্বার লিখিবার জন্য নিযুক্ত করেন। বুদ্ধঘোষ অপূর্ব্ব সাধনা বলে ঊনবিংশতি সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধন করেন।

অতঃপর বুদ্ধঘোষ সিংহল পরিত্যাগ করিয়া ৪৫০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। তাঁহার গমনের পূর্ব্বেই ঐ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রবেশ করিয়াছিল। * বুদ্ধঘোষের প্রাণগত যত্ন ও পরিশ্রমে থেতন অর্থাৎ নিম্ন ব্রহ্মের বহুস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হয়। বুদ্ধঘোষের তিরোভাবের পর আচার্য্য আর্হন (Arahan) প্যাগান অর্থাৎ উত্তর ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

* মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। আমরা জানিতে পারি যে, মহারাজ অশোক স্বর্ণভূমিতে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণভূমি ব্রহ্ম, মলয় উপদ্বীপ প্রভৃতি দেশ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

হইতে থাকে; তার পর ১০০০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ অনব্রত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রবলোৎসাহে স্বধর্ম্মের প্রচার কল্পে নিরত হন। রাজা অনব্রতের বংশধর রাজা সিন্দুল ষড়বিংশত্যধিক সপ্তশত প্রস্তর খণ্ডে ত্রিপিটক উৎকীর্ণ করিয়া তৎসমুদয় কুথোডা মন্দিরে স্থাপন করেন।

শ্যাম দেশেও সিংহল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নীত হইয়াছিল। সিংহল হইতে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক শ্যামদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য কাশ্যপ থেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল।

পেগু ও আরাকান

ধর্ম্মবিলাস নামক একজন বৌদ্ধাচার্য্য পেগু দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন; তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে সুসংস্কৃত হইয়াছিল। রাজা সন্দ সূর্য্য আরাকানে বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন; তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ঐ দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

তিব্বত।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল। তৎকালে রাজা স্রঙ্গ সাম্সগাম্পো তিব্বতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নেপালের একজন রাজ-দুহিতার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। এই সূত্রেই প্রথমে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। রাজা স্রঙ্গ সাম্সগাম্পো এবং তদীয় উত্তরাধিকারিগণ ধর্ম্মপিপাসু অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের আমন্ত্রণে বহু সংখ্যক ভারতীয় আচার্য্য জ্ঞান-ধর্ম্ম বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে সমস্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হয়।

রাজা স্রঙ্গ সাম্সগাম্পোর পরবর্ত্তীকালে যে সকল নরপতি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থ ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিপতি

খিয়বঙ্গের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে মহারাজ অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শান্তিরক্ষিত তাঁহার গুরু-পদে বৃত হন; রাজা গুরুর পরামর্শানুসারে মধ্যতিব্বতে অনেক গুলি ধর্ম্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর তিনি ভারতীয় পণ্ডিত মণ্ডলীকে আপন রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বানে শান্তিরক্ষিত এবং কাবুলবাসী পদ্মসম্ভব তিব্বতে উপনীত হন। এই ভারতীয় পণ্ডিত যুগলের সহায়তায় রাজা খিয়বঙ্গ বিখ্যাত সামইয়া মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য অগাধ সম্পত্তি নিয়োজিত করিয়া দেন। সামইয়া মঠের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য ভারতীয় বৌদ্ধা-চার্য্যগণ আহূত হন। অষ্টোত্তর একশত জন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গমন পূর্ব্বক শাস্ত্রগ্রন্থ সকলের অনুবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। (৭৪০ খৃঃ)। (১)

ভারত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ।

অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষীয়েরা ভারত মহাসাগরস্থিত দ্বীপ-পুঞ্জের সহিত পরিচিত ছিলেন। রামায়ণে সপ্তরাজ্য পরিবেষ্টিত যব-দ্বীপের উল্লেখ দেখা যায়। (২) কিন্তু এই সকল দ্বীপের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, রামায়ণের বহুকাল পরে তৎসমুদয়ে ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় ধর্ম্ম ও ভারতীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

(১) Journals of the Asiatic Society of Bengal এবং সাহিত্য হইতে সংগৃহীত।

(২) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, চত্বারিংশ সর্গ।

খৃষ্টের পূর্ব্বতন শেষ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বহু সংখ্যক কলিঙ্গবাসী যবদ্বীপে অর্ণবপোত-যোগে উপনীত হন এবং সেখানে আধিপত্য স্থাপন করিয়া সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ করেন। এই আধিপত্য স্থাপনের বিবরণ যবদ্বীপের ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। যবদ্বীপের নূতন রাজা স্বীয় কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে এক অভিনব অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি যবদ্বীপে এই অব্দ প্রচলিত রহিয়াছে। খৃঃ পূঃ ৭৫ অব্দ হইতে এই অব্দের আরম্ভ। কলিঙ্গবাসী-দের যত্নে যবদ্বীপে আর্য্যধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল। তারপর ৬০৩ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের জনৈক রাজকুমার পঞ্চ সহস্র সহচর সমভিব্যাহারে যবদ্বীপে উপনীত হইয়া মাতারাইম নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে আর দুই সহস্র গুজরাটী রাজকুমারের সহায়তা কল্পে যবদ্বীপে গমন করেন। গুজরাটের রাজকুমার এবং তদীয় সহচরবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের প্রাধান্য লাভের ফলে যবদ্বীপে বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচলিত হয়।

যবদ্বীপে ভারতীয় ভাষা ভারতীয় ধর্ম্ম ও ভারতীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তৎপার্শ্ববর্ত্তী বালি, লম্বক, সুমাত্রা ও বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে ঐ সমুদয়ের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। চৈনিক পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্র-পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অন্ন-পান সংগ্রহের জন্য এই সকল দ্বীপে অবতরণ করিতেন, তাঁহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টের চতুর্থ শতাব্দীতে তৎসকলের অধিবাসীরা আচার ব্যবহার রীতি নীতিতে ভারতবর্ষীয়দের হইতে অভিন্ন ছিল। ভারত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে ভারতবর্ষের প্রাধান্য স্থাপনের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিবার তত প্রয়োজন নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে সকল চিহ্ন, প্রস্তর ও ধাতবমূর্ত্তি চিত্র ও অট্টালিকা এবং

পর্ব্বত-গাত্রে অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাই পূর্ব্ব-কাহিনীর যথেষ্ট প্রমাণ-স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে।

"মোসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্পেনরাজ্য হইতে ভারত মহাসাগরের পূর্ব্ব সীমাস্থিত এই সকল দ্বীপপুঞ্জে মোসলমান শক্তি প্রসারিত হইয়াছিল। তাহাতে সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অধিকাংশ দ্বীপের লোকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।" কেবল বালি ও যবদ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। "লম্বক ও বালি দ্বীপে হিন্দুরাজা পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া মনুসংহিতার ব্যবস্থা অনুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভেদে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত রহিয়াছে।" * লম্বক ও বালি দ্বীপের বৌদ্ধগণ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের সংখ্যা নগণ্য।

---

* শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

আমেরিকা।

"ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণে সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্মাদি দেশে, উত্তরে নেপাল, তিব্বত, কাবুল, গান্ধারে, পূর্ব্বে চীনে,—চীন হইতে মঙ্গোলিয়া কোরিয়া জাপানে ও মধ্য এসিয়ায় কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম দূরাৎ সুদূরে ছড়াইয়া পরে ; এই সকল জানা কথা ; কিন্তু কলম্বসের আবিষ্ক্রিয়ার ১০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ ঐ ধর্ম্ম আমেরিকায় লইয়া যান, একথা অনেকের নিকট নূতন ঠেকিবে। * * * কতকগুলি প্রমাণ হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষু রুষের উত্তর সীমা কামাস্কাট্‌কা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করেন। * * মেক্সিকো ও তৎসন্নিহিত আদিম আমেরিকানদের ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের চিহ্ন সকল এই ঘটনার সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলীতে ফুসং নামক এক পূর্ব্ব প্রদেশের উল্লেখ আছে। সে দেশের এক বৃক্ষ হইতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো দেশে আগুয়ে বা মাগুয়ে নামক যে বৃক্ষ জন্মে. তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, তাহার লেখাটী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই, যাহা লেখকের কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে হয়। ** (এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে,) পূর্ব্বে ফুসংবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুই জানিত না ; ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে সুংবংশীয় তামিং সম্রাটের রাজত্বকালে

কাবুল হইতে পাঁচ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ফুসং গমন পূর্ব্বক সে ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু রূপে দীক্ষিত হয় ও তখন হইতে লোকদের রীতি-নীতি সংশোধন আরম্ভ হয়। *** ।

মেক্সিকোবাসীদের মধ্যে এক জনশ্রুতি আছে যে, একজন শ্বেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন তার উপর এক আলখাল্লা, এই বেশে আগমন করেন। তিনি লোকদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায় সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার মিতাচার, এই সমস্ত ব্যবহার ধর্ম্মের উপদেশ দেন। পরে সেই সাধু পুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়াতে তিনি প্রাণ ভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই সন্ধান পাইল না। তিনি এক পাহাড়ের উপর তাঁহার পদ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন। **

আর এক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা ভাষাগত ; এসিয়া খণ্ডে বুদ্ধ নামে তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্মনাম গৌতম এবং জাতীয় নাম শাক্যই প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপভ্রংশ শব্দ মেক্সিকোর প্রদেশ সমূহের নামে মিলিয়া গিয়াছে। দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধিও ঐরূপ সাদৃশ্য ব্যঞ্জক। ***

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমেরিকায় কতকগুলিন এমন জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, যাহা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের মূর্ত্তিমান প্রমাণ স্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু, হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় কোন জন্তু নাই), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ বিহার অলঙ্কার, এই সকল জিনিষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অধ্যাপক ফ্রায়ার স্থির করিয়াছেন যে, ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধভিক্ষুগণ প্রচার কার্য্যে আমেরিকায় গমন

করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক বিঘ্ন বাধা আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য সিদ্ধিও করিয়াছিলেন।" (১)

(১) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধ ধর্ম্ম নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের প্রসঙ্গে আমরা বর্ত্তমান সময়ে কোন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা কত, তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

হীন যান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ।

সিংহল	১৫২০৫৭৫
ব্রিটিশ বর্ম্মা	২৪৪৭৮৩১
বর্ম্মা	৩০০০০০০
শ্যাম	১০০০০০০০
আনাম	১২০০০০০০
জৈন	৪৮৫০২০

সমষ্টি প্রায় ৩০০০০০০০ তিন কোটী

মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ।

ওলন্দাজ শাসন ভুক্ত প্রদেশ ও বলি দ্বীপ	৫০০০০
ব্রিটিশ শাসন ভুক্ত প্রদেশ	৫০০০০০
রুশিয়ার শাসন ভুক্ত প্রদেশ	৬০০০০০
লিউখেন্ দ্বীপ	১০০০০০০
কোরিয়া	৮০০০০০০
ভুটান ও সিকিম	১০০০০০০
কাশ্মীর ও লাডাক	২০০০০০
তিব্বত	৬০০০০০০
মঙ্গোলিয়া	২০০০০০০
মাঞ্চুরিয়া	৩০০০০০০
জাপান	৩২৭৯৪৮৯৭
নেপাল	৫০০০০০
চীন	৪১৪৬৮৬৯৯৪

সমষ্টি প্রায় ৪৭০০০০০০০ সাত চল্লিশ কোটী

মোট ৫০০০০০০০০ পঞ্চাশ কোটী।

আমরা যথাসাধ্য ভারত মহিমা বিবৃত করিলাম। এই বিবৃতির প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অতি পুরাকালে দিগ্বিজয়, অর্থ সঞ্চয়, জ্ঞানার্জ্জন এবং ধর্ম্মচর্য্যা উপলক্ষে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপ, মিশর এবং এসিয়ার প্রাচীন সভ্যজনপদ সমূহের পরিচয় লাভ হইয়াছিল।

উপসংহার

তাদৃশ পরিচয় ছিল বলিয়া নানা দিগ্দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। তাঁহাদের অনেকে "ভারতবর্ষের পাদমূলে শিষ্যরূপে ইষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভারতবৃত্তান্ত সংকলন" করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের গ্রন্থ অবলম্বনেও অনেক বৈদেশিক পণ্ডিত ভারত বিবরণ রচনা করেন। এই সমুদয় হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একখানি চিত্র অঙ্কিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

গ্রীক-লিখিত ভারত-বিবরণ।

অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের সহিত গ্রীসের পরিচয় হইয়াছিল। বহু সংখ্যক গ্রীক লেখক ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবরণের অধিকাংশই অতিরঞ্জনদুষ্ট। বৈদেশিক গ্রীক লেখকগণের রচনায় ভারতবর্ষের স্থানসমূহের নাম বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; আধুনিক পাঠকগণের পক্ষে ঐ সকল স্থান চিহ্নিত করা দুরূহ। যাহা হউক, এইরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা গ্রীক-লিখিত বিবরণ হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি।

গ্রীক লিখিত ভারত বিবরণ

যে সকল গ্রীকলেখক ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। গ্রীকবীর বিশ্ববিখ্যাত আলেকজণ্ডার খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে সসৈন্যে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লেখকগণের মধ্যে কেহ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। ভারত ভ্রমণকারিগণের সঙ্কলিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা আপনাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তারপর আলেকজণ্ডারের সঙ্গে বহুসংখ্যক গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থিতিকাল অত্যল্প ছিল বলিয়া তাঁহারা সুবিস্তীর্ণ স্থানে পর্য্যটন করিয়া ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত প্রতিকূল বিষয় বিবেচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ত্তব্য।

আলেকজণ্ডারের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক লেখকগণ

আলেকজণ্ডারের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন গ্রীক লেখকের ভারত বিবরণ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা এখানে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছি।

স্কাই লাক্স ;—ইনি সিন্ধু নদ বিধৌত নিম্নপ্রদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

হিকাটোস ; ইনি ভারতবর্ষের ভূগোলবৃত্তান্তের লেখক ; ইঁহার গ্রন্থে সিন্ধু (Indus) প্রভৃতি নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হিরোডোটস ;—হিরোডোটস ইতিহাস-লেখককুলের আদি-পুরুষরূপে পরিচিত।

টিসিয়াস ;—টিসিয়াস পারস্য-রাজসভায় চিকিৎসা উপলক্ষে অবস্থিতি করিতেন।

টিসিয়াসের সময়ের ন্যূনাধিক সত্তর বৎসর পরে মহাবীর আলেকজণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। গ্রীকবীরের এই আক্রমণের ফলে যে কেবল তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহা নহে; তাঁহার যত্নে ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার বৈদেশিকগণের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, এবং মানব জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার বৰ্দ্ধিত হয়। আলেকজণ্ডার নিজে এক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন; তদীয় সহচর বৃন্দের অনেকে নানাবিদ্যা বিশারদ বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। এই সকল সহচরের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রীকগণের আগমন কালে ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরূপ ছিল, সেই সকল গ্রন্থে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের কতিপয় লেখকের নামোল্লেখ করিতেছি। টলেমি, আরিষ্টোবুলাস, নিয়ারকাস, অনেসিক্রিটাস, ইউমেনেস, চারেস, কালিসথেনিস, ক্লেইটারকাস, পলিক্লেইটাস, এনাক্সিমেনিস, ডায়োগনিটাস, বিটন, কিরসিলাস প্রভৃতি।

আলেকজণ্ডারের ভারতজয় বিবরণী

আলেকজণ্ডারের পরবর্ত্তীকালে তিনজন প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত রাজদূত পদে বৃত হইয়া ভারতবর্ষে পাটলিপুত্রের রাজ দরবারে আগমন করিয়াছিলেন; সিরিয়ার রাজদরবার কর্ত্তৃক প্রেরিত মেগাস্থিনিস ও দেইমাকস এবং মিশর-রাজদরবার কর্ত্তৃক প্রেরিত দিওনিসিয়াস। এই তিন জন ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালের আর কয়েকজন গ্রীক লেখক দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া স্বচক্ষে ভারতীয় সভ্যতার যে চিত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাই আপনাদের গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাগুক্ত তিন জন রাজদূতের মধ্যে মেগাস্থিনিস চিরকালের জন্য কীর্ত্তিমন্দিরে স্থান লাভ

গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস

করিয়াছেন; অপর দুইজনের নাম বিদ্বৎসমাজে তাদৃশ পরিচিত নহে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অধিকাংশ স্থলেই সত্যানুমোদিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ভারতবর্ষের সীমা ও অবস্থান, আকার ও আয়তন, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জল-বায়ুর অবস্থা ও প্রকৃতি পুঞ্জের আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্র-সম্বন্ধীয় তথ্য সকল সত্যপ্রিয় মেগাস্থিনিসের লিখিত গ্রন্থ দ্বারাই ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল।

কেবল উত্তর-ভারত, অর্থাৎ কাবুল ও পঞ্চনদ বিধৌত প্রদেশের সঙ্গে আলেকজণ্ডার ও তদীয় সহচরগণের পরিচয় ঘটিয়াছিল; কিন্তু মেগাস্থিনিস তদপেক্ষা বিস্তৃত স্থানের পরিচয় লাভ করেন। কারণ, তিনি শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী রাজপথ অতিক্রম করিয়া অনুগাঙ্গ-প্রদেশস্থিত প্রসিদ্ধ মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হন। এই স্থানে মেগাস্থিনিস সুদীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি অনেকবার মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন; সম্ভবতঃ তাঁহার মহিষারও দর্শন লাভ করেন। ইনি তদীয় প্রিয়বন্ধু সিরিয়াধিপতি সেলুকাসের দুহিতা ছিলেন। পাটলিপুত্র নগরে অবস্থিতি সময়েই মেগাস্থিনিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসাবলে ইণ্ডিকা নামক ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থে লিপিকুশলতা, তীক্ষ্ণ-দর্শিতা ও অনুসন্ধান-নিপুণতা এত সুস্পষ্ট যে, ইহা ভ্রম প্রমাদ শূন্য প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গণ্য ছিল। পরবর্ত্তী কালের লেখকগণ প্রধানতঃ এই গ্রন্থ হইতেই তাঁহাদের ভারত-বিবরণ সংগ্রহ করিতেন। ষ্ট্রাবো মেগাস্থিনিসকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আবার বহুস্থলে প্রমাণস্বরূপেও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন! বর্ত্তমান কালেও মেগাস্থিনিস সত্যপ্রিয় লেখকরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন; তিনি ভারতীয়গণের আচার ব্যবহার, সমাজানুশাসন

প্রভৃতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যথাযথ বলিয়া আধুনিক অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে। মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের কয়েক জাতীয় লোকের দেহ দানব তুল্য প্রকাণ্ড; তাহাদের আকৃতি এতদূর কদর্য্য যে, তাহা মানব-দেহে সম্ভবপর নহে। এই বর্ণনাই ষ্ট্রাবোর মেগাস্থিনিসকে আক্রমণ করিবার প্রধান কারণ। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ সকল জাতীয় লোকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; মেগাস্থিনিস কেবল স্থানে স্থানে নামের পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় ভাষার উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ সকল উপাখ্যান তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নহে; ভারতবাসীদিগের নিকট হইতেই তৎসমুদয় সংগৃহীত হইয়াছে। যে সকল আর্য্য ভারত বিজয় করেন, মেগাস্থিনিসের সংবাদ-দাতৃগণ তাঁহাদেরই উত্তর পুরুষ ছিলেন এবং আদিম অধিবাসীদিগকে ঘৃণা করিতেন; কারণ, তাহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

গ্রীকদূত দেইমাকস ও দিওনিসিয়াস।

দেইমাকসও ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেইমাকসের গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। দেইমাকস স্বগ্রন্থে ভারতবর্ষের আয়তন অতিরঞ্জিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সে সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই। দিওনিসিয়াস আর একজন গ্রন্থকার। তাঁহার গ্রন্থও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্লিনি বলেন, টলেমি ফিলাডেলফস তাঁহাকে রাজদূত পদে বরণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। দিওনিসিয়াসও মেগাস্থিনিসের ন্যায় ভারতীয় সৈন্যের পরিমাণ স্বদেশে লিখিয়া পাঠান।

মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ লিখিত হইবার কিছুকাল পরে পেট্রোক্লিস একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে কেবল ভারতবর্ষের বিবরণই লিপিবদ্ধ হয় নাই; সিন্ধুতীর হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত প্রসারিত

ভূভাগের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। পেট্রোক্লিস, সেলুকাস নিকেটার ও প্রথম এন্টিওকাসের প্রতিনিধিরূপে এই ভূভাগের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ষ্ট্রাবো অনেক স্থলে প্রমাণ স্বরূপে পেট্রোক্লিসের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসার প্রশংসা করিয়াছেন।

খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রীক্‌লেখক।

ইরাটোস্থিনিস পেট্রোক্লিসের গ্রন্থের সবিশেষ প্রশংসা করেন। তদীয় গ্রন্থের অনেক অংশও উহা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪০ অব্দ পর্য্যন্ত ইরাটোস্থিনিস আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর অসংবদ্ধ ভৌগোলিক তত্ত্ব সমূহ সংগ্রহ ও তৎসমুদয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সজ্জীকৃত করিয়া, তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভূবিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত করেন। কিন্তু ভারতের আকার ও অবস্থান সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা যথার্থ নহে। তিনি মনে করিতেন যে, ভারতোপদ্বীপের অগ্রভাগ দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রসারিত, দক্ষিণদিগভিমুখী নহে; এমন কি, গঙ্গানদীর মুখ অতিক্রম করিয়াও কিয়দ্দূর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াছে। এইস্থানে তিনি পেট্রোক্লিস-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন নাই। অধিকন্তু তিনি ও হিরোডোটাসের ন্যায় মনে করিতেন যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শেষসীমায় সমুদ্রের তীরে অবস্থিত।

ভূবিদ্যার প্রথম প্রচার।

ইরাটোস্থিনিসের পর পলিবিয়সের নাম উল্লেখ যোগ্য। পলিবিয়স খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৪ অব্দে স্বীয় ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁহার পুস্তকে সেলুকাস বংশীয় নরপতিগণের সমসাময়িক ভারতের অনেক মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল।

পলিবিয়সের পর যে লেখক ভারত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার নাম আরটিমিডোরাস; ইনি ইফিসাস-বাসী ছিলেন।

খৃষ্টের জন্মের শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। আরটিমি-ডোরাস একখানি ভূগোল প্রণয়ন করেন। সম্ভবতঃ তিনি কোনও অপ্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে ভারতসম্পর্কীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো নির্দ্দেশ করিয়াগিয়াছেন যে, তাঁহার সংগৃহীত অনেক বিবরণ ভ্রমসঙ্কুল। অধিকাংশ লেখকই এই ভ্রম করিয়াছেন যে, গঙ্গানদী পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিতা; আরটিমিডোরাস কিন্তু এই ভ্রমে পতিত হন নাই।

আমরা যে সকল গ্রন্থকারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম, দুঃখের বিষয়, তন্মধ্যে এক হিরোডোটাশ ভিন্ন আর কোনও লেখকের গ্রন্থই বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, কেবল তাহাই এখন বিদ্যমান।

অধিকাংশ গ্রীক বিবরণীর বিলোপ

আলেকজণ্ডারের সহচর ও সমসাময়িক লেখকগণ ভারতবর্ষের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ছয় জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। দিওদোরাস সিকুলাস আরিয়ান, প্লুটার্ক, কিউকুরটিয়াস, জাষ্টিনাস, এই পাঁচজন; ষষ্ঠ লেখকের নাম অপরিজ্ঞাত। এই শেষোক্ত লেখক সম্রাট দ্বিতীয় কনষ্টানটিয়াস পারস্যের বিরুদ্ধে যে অভিযান করিয়া ছিলেন, তাহার সুবিধার জন্য "ইটিনারেরিয়ম আলেকজণ্ড্রি ম্যাগনি" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। "রণ কৌশল" নামক একখানি পুস্তকের রচয়িতা পলিনাস ভারত-অভিযানকালে মহাবীর আলেকজণ্ডার কর্ত্তৃক অবলম্বিত কৌশল সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। ফ্রনটিনাস— প্রণীত "রণনীতি" পুস্তকেও এই বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আলেকজণ্ডারের ভারত বিবরণীর পরবর্ত্তী লেখকগণ।

এক্ষণে আমরা চতুর্থ-শ্রেণীস্থ গ্রীকলেখকগণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। খৃষ্টের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকালে যে সকল লেখকের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহারাই এই শ্রেণী ভুক্ত।

খৃষ্টের পরবর্ত্তী গ্রীক লেখক বর্গ।

এক বিষয়ে খৃষ্টের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী লেখকগণের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বগামিগণের, অর্থাৎ আলেকজণ্ডারীয় এবং তাহার পরবর্ত্তী যুগের লেখকগণের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় যুগের দুই একজন ব্যতীত আর কাহারও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এদেশের সহিত পরিচয় ঘটে নাই। Periplus of the Erthyrean Sea নামক গ্রন্থের প্রণেতা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যক্ষেত্র সকল দর্শন করেন। কসমাস ইণ্ডিকো প্লিসটিস সিংহলদ্বীপ ও মালাবার উপকূলে আগমন করেন।

খৃষ্টের পরবর্ত্তী বিবরণের উপাদান।

এই দুইজন লেখক ব্যতীত আর কেহ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভারত-বাণিজ্যলিপ্ত বণিক্, ভারত-ভ্রমণকারী, রোম ও কনস্তান্তিনোপলের রাজদরবারে সমাগত ভারতবর্ষীয় রাজদূত ও আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া প্রভৃতি স্থানপ্রবাসী ভারতীয়গণের নিকট তাঁহারা যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীনগ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য সকলও তাঁহাদের পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয়যুগের যে সকল গ্রীকলেখক ভারত সম্পর্কীয় জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন তথ্যের সংযোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব কথিত পেরিপ্লাসের অপরিজ্ঞাত রচয়িতা, প্লিনি, টলেমি, পরফিরি, ষ্টোবস, কসমাস ইণ্ডিকাপ্লিসটিস এবং ষ্ট্রাবোর নাম সবিশেষ পরিচিত।

পেরিপ্লাসের অজ্ঞাত নামা লেখক ও প্লিনি ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রচার করেন। টলেমি

সিংহল, ভারতবর্ষের অন্তর্ভাগ ও গঙ্গার অপর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও ভ্রমবশতঃ ভারতের মানচিত্র এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন যে, তাহা এদেশের মানচিত্র বলিয়াই চিনিতে পারা যায় না। টলেমির অঙ্কিত ভারতবর্ষের মানচিত্রে পশ্চিম উপকূল সোজাসুজি দক্ষিণদিকে কুমারিকা অন্তরীপ অভিমুখে না চলিয়া বোম্বাইর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়াছে; একারণ ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণভাগ একেবারেই লোপ পাইয়াছে। পরফিরি ও ষ্টোবস ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও বৌদ্ধশ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহ বিবরণ স্ব স্ব গ্রন্থে সঙ্কলিত করেন।

প্লিনি ও টলেমি।

আমাদের আলোচ্যযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠগ্রন্থ ষ্ট্রাবো-প্রণীত ভূগোলবৃত্তান্ত। এই গ্রন্থ ১৯ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে ভারতবর্ষের নগর ইত্যাদির যে সকল নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অনেকগুলির উল্লেখ আর কোনও পুস্তকে নাই, সম্ভবতঃ ষ্ট্রাবো এই সমস্ত নাম সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ষ্ট্রাবোর ভূগোলবৃত্তান্ত

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-বৃত্তান্ত সংবলিত আর চারিখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারিখানি পুস্তকের প্রণেতার নাম পম্পোনিয়াস মেলা, সোলিনাস, দাওনিসিয়াস ও মারসিনাস। মেলা ও সোলিনাস রোমান লেখক। ৪২ খৃঃ অব্দে মেলার গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। মেলা স্বগ্রন্থে ভারতবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তদীয় লিখিত বিবরণ গ্রীক লিখিত বিবরণের সারসঙ্কলন মাত্র। মেলার সময় ভারত উপকূল পর্য্যন্ত রোমান বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছিল। ফলতঃ তৎকালে রোমান বণিকগণের প্রমুখাৎ ভারতের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার

অন্যান্য গ্রীক লেখকের ভূগোল বৃত্তান্ত

উপায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মেলা ততদূর কষ্ট স্বীকার করেন নাই। গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলন করিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সোলিনাস ২২৮ খৃঃ অব্দে স্বগ্রন্থ প্রকাশ করেন; প্লিনির গ্রন্থ তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল; এতদ্ব্যতীত মেলার গ্রন্থ হইতেও তিনি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সোলিনাসের পুস্তক জনাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ডাওনিসিয়াস প্রাচ্য সম্রাট ব্যাকস কর্ত্তৃক ভারত বিজয়ের কাহিনী গ্রথিত করেন। ৪০০ খৃষ্টাব্দে মারসিয়ানাস কর্ত্তৃক লিখিত ভূগোল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমাণ করিয়াছিলেন।

গ্রীক সাহিত্য ও ভারত বিবরণ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে যে সকল গ্রীক লেখক লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন, আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এই সমস্ত লেখকের গ্রন্থ ব্যতীত প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের নানা স্থানে প্রসঙ্গক্রমে ভারত কথা আলোচিত হইয়াছে।

হিরোডোটস।

গ্রীক ইতিহাস লেখক হিরোডোটস ঐতিহাসিককুলের আদিপুরুষরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। হিরোডোটস ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও

গ্রীকলিখিত প্রথম বিবরণী।

যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ ও অনিশ্চিত ছিল। তিনি এই মাত্র জানিতেন যে, ভারতবর্ষ পারস্য সাম্রাজ্যের একাংশ; কিন্তু ভারতবর্ষের আকার ও অবস্থান

সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। হিরোডোটস খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৪ অব্দে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও গ্রীকলেখক সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেন নাই। এইজন্য তাঁহার লিখিত ভারত-বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত ও ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ হইলেও, পাঠকগণের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে। আমরা ঐ বিবরণের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম।

আমরা যত জাতির বিষয় অবগত আছি, তন্মধ্যে ভারতীয়গণ সংখ্যায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহারা পারস্যের রাজাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজকর প্রদান করে।

ভারতবর্ষের রাজস্ব।

এই রাজকরের বার্ষিক পরিমাণ তিন শত ষাট Talent স্বর্ণরেণু। (১) পারস্য সাম্রাজ্য বিংশতি ভাগে বিভক্ত; ভারতবর্ষ তাহার বিংশতিতম ভাগ।

ভারতবর্ষের যে অংশ সূর্য্যোদয়দিগ্বর্ত্তী, তাহা কেবল বালুকাময়। আমরা যে সকল জাতির সহিত পরিচিত, অথবা যে সকল জাতির বিষয় নিশ্চিতভাবে পরিজ্ঞাত, তাহাদের মধ্যে ভারতবাসীই সূর্য্যোদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করেন। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশ বালুকাময় বলিয়া মরুভূমি মাত্র। ভারতবাসী বহু জাতিতে বিভক্ত, তাহাদের সকলের কথিত ভাষাও এক নহে। কোনও কোনও ভারতীয় জাতি রাষ্ট্রচর; তাহারা টোল ফেলিয়া ভ্রমণ বা বাস করে। কোনও জাতি

ভারতের নানাজাতি ও ভাষা।

---

(1) This tribute must have been levied mainly from countries to the west of the Indus, for it is certain that the Persian Power never extended beyond the Punjab and the lower valley of the Indus. In the time of Alexander it was bounded by that river.

J. W. Mc Rindle.

নদীতটস্থ জলাভূমিতে বাস করে, এবং অপক্ক মৎস্য আহার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে; তাহারা 'নল'-নির্ম্মিত নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক নদীতে বিচরণ করিয়া মৎস্য ধরে। তাহারা এক প্রকার জলজাত তৃণ 'চুনট' করিয়া অঙ্গরাখা প্রস্তুত করিয়া তাহাই পরিধান করে।

এই জাতির আবাস স্থলের পূর্ব্বদিকে রাষ্ট্রচর জাতির বাস। ইহারা প্যাদেন নামে পরিচিত। প্যাদেনেরা অসিদ্ধ মাংস ভোজন করে। তাহাদের সমাজে যে সকল রীতি নীতি পরিদৃষ্ট হয়, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। যদি কোনও পুরুষ রোগগ্রস্ত হয়, তবে তাহার আত্মীয়গণ দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ায় মাংস অপচিত হয় বলিয়া, অচিরে তাহাকে হত্যা করিয়া মহাসমারোহে ঐ নরমাংস ভোজন করে। যদি কোনও স্ত্রীলোক পীড়াগ্রস্ত হয়, তবে তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে হত্যা করিয়া সমারোহপূর্ব্বক ঐ নরমাংস ভোজন করে। ইহাদের কেহ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে, তাহার হত্যা নিশ্চিত। প্যাদেনগণ বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস ভোজন করে। কিন্তু এই জাতির মধ্যে কদাচিৎ কেহ বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ, তৎপূর্ব্বেই প্রায় সকলেই পীড়াগ্রস্ত হয়, এবং যে কেহ পীড়িত হয়, সেই স্বজাতি কর্তৃক হত হইয়া থাকে। (১)

ভারতবর্ষে আর এক জাতীয় লোক দেখা যায়, তাহারা কোনও প্রাণী হত্যা করে না, কোনও শস্য বপন করে না, বাসের জন্য গৃহাদি

(১) We hear from Duncker that the practice still prevails among the aboriginal races inhabiting the Upper India among the recesses of the Vindhyas.

J. W. Mc Rindle.

নির্ম্মাণ করে না। তাহারা শাক সব্‌জি আহার করিয়া জীবনধারণ করে ; যে সকল ধান্য স্বতঃ জন্মে, তাহারা তাহাই সংগ্রহপূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া আহার করিয়া থাকে।

কাম্পাটিরাস নগর (একজন পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কাবুল পুরাকালে কাম্পাটিরাস নামে পরিচিত ছিল। অপর কেহ বলেন,—কাম্পাটিরাস কাশ্মীর।) এবং প্যাকটাইসি দেশের নিকটবর্ত্তী ভারতীয়গণ আচার ব্যবহারে ব্যাকট্রিয় গ্রীক জাতির সদৃশ। এই সকল ভারতবাসী অন্যান্য স্থানের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক সমরপ্রিয়। ইহারাই স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে ; কারণ, ইহাদের বাসস্থানের অদূরেই বালুকাপূর্ণ মরুভূমি। এই মরুভূমিতে বালুকার মধ্যে এক জাতীয় পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পিপীলিকা আকারে কুকুর অপেক্ষা ছোট, কিন্তু শৃগাল অপেক্ষা বড়। পারস্যাধিপতির নিকট এইরূপ কতকগুলি পিপীলিকা আছে। তিনি সেগুলি ভারতবর্ষ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঐ সকল পিপীলিকা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বাসস্থান প্রস্তুত করিবার সময় মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলে ; এই উত্তোলিত বালুকাস্তূপ হইতে স্বর্ণকণা পাওয়া যায়। এই কারণ ভারতীয়গণ ঐ সমুদয় স্বর্ণকণা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে গমন করে। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দুইটি উষ্ট্র ও একটি উষ্ট্রী থাকে। অগ্রে ও পশ্চাতে উষ্ট্র গমন করে, মধ্যস্থলে উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহকারী পথ অতিবাহিত করে। এই উষ্ট্রীর সদ্যোজাত শাবকটিকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। উষ্ট্র উষ্ট্রী দ্রুতগমনে অশ্ব অপেক্ষা হীন নহে ; কিন্তু ভারবহন কার্য্যে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া পরিগণিত।

ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক স্বর্ণ সংগ্রহ।

দিবা ভাগের যে সময় সূর্য্যকিরণ খরতর হয়, সেই সময় ভারতীয়গণ

স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য মরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া থাকে। কারণ, ঐ সময় বালুকা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া পিপালিকা সকল ভূগর্ভস্থিত বাসস্থানে লুক্কায়িত হয়। এই দেশে প্রাতঃকালেই সূর্য্যকিরণ খরতর হইয়া থাকে; অন্যান্য দেশের ন্যায় মধ্যাহ্নকালে অধিক প্রখর হয় না। গ্রীসদেশে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের উত্তাপ যে প্রকার তীব্র হয়, এই দেশে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্যশালা সমূহের ক্রয়-বিক্রয়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক তীব্র থাকে; এজন্য ভারতীয়গণ প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর শীতল রাখে। অন্যান্য দেশবাসীরা মধ্যাহ্নকালে যেপ্রকার উত্তাপ অনুভব করে, ভারতীয়গণও তদ্রূপই অনুভব করে। কিন্তু অপরাহ্নকালে সূর্য্যের প্রখরতা কমিয়া যায়; প্রাতঃকালে অন্যান্য দেশে যেরূপ থাকে, সেইরূপ হয়; তারপর দিবা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য অধিকতর শীতল হইতে থাকে; সূর্য্যাস্তের পর অত্যন্ত শীতলতা অনুভূত হয়।

ভারতীয়গণ মরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তাড়াতাড়ি স্বর্ণময় বালুকা সংগ্রহ করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়। কারণ, পিপীলিকাগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘ্রাণ দ্বারা তাহাদের আগমন সংবাদ জানিতে পারে, এবং তাহাদিগের পশ্চাদ্গমন করে। এই সকল পিপীলিকা অতি দ্রুতগামী, কোনও জন্তুই তাহাদের তুল্য দ্রুত গমনে সমর্থ নহে। পিপীলিকাগুলি সংগ্রহকারীদের আগমন সংবাদ জানিতে পারিলেই, তাহাদিগকে ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে একস্থানে সম্মিলিত হয়। তাহারা সম্মিলিত হইতে হইতে যদি স্বর্ণ সংগ্রহকারীরা অনেক দূর অগ্রসর হইতে না পারে, তবে সকলকেই নিহত হইতে হয়। দ্রুতগমনে উষ্ট্র উষ্ট্রী অপেক্ষা হীন। উষ্ট্র সকল কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই, অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করে; কিন্তু উষ্ট্রী সকল গৃহাবদ্ধ শাবকের মমতায় সমভাবেই চলিতে থাকে। পারসীক.

গণের মতে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্বর্ণই এই প্রণালীতে সংগৃহীত হয়। *

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা।

ভূমণ্ডলে যতদূর মানব জাতির বাসস্থান বিদ্যমান আছে, তাহার শেষ অংশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত জন্মে। আমি ইতঃপূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষই মানবজাতির শেষ বাসস্থল; ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে আর মানবজাতির বাসস্থল নাই। ভারতবর্ষের পশু পক্ষী অন্যান্য দেশের পশু পক্ষী অপেক্ষা আকারে বৃহৎ; কিন্তু অশ্ব সম্বন্ধে এই নির্দ্দেশ প্রযোজ্য নহে; মিদক-জাতীয় নিসয়ান অশ্ব ভারতবর্ষীয় অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। এই স্বর্ণ রাশির কিয়দংশ খনি হইতে উত্তোলিত হয়; কিয়দংশ নদীগর্ভ হইতে সংগৃহীত হয়; অবশিষ্ট পূর্ব্ব বর্ণিত উপায়ে অর্জ্জিত হয়। ভারতবর্ষের কোনও কোনও বৃক্ষে ফলের পরিবর্ত্তে পশম জন্মে, এই পশম সৌন্দর্য্যে ও গুণে ছাগলের লোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতীয়গণ এই বৃক্ষজাত পশম (তুলা?) দ্বারা আপনাদের ব্যবহারার্থ বস্ত্রবয়ন করে।

* মেগাস্থিনিস ও নিয়ারকসের গ্রন্থে স্বর্ণপিপীলিকার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ারকস লিখিয়া গিয়াছেন যে,—তিনি নিজে ভারতবর্ষের একস্থলে স্বর্ণ পিপীলিকার চর্ম্ম দেখিয়া গিয়াছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা শিয়ালের বা তৎজাতীয় অন্য কোনও গর্ত্তবাসী জন্তুর চর্ম্ম।

যাহা হউক, অতি প্রাচীন কালহইতেই ভারতবর্ষীয় স্বর্ণ পিপীলিকার প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। অধ্যাপক উইলসন স্বীয় গ্রন্থে মহাভারত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; এইশ্লোকে পিপীলিকা কর্ত্তৃক সংগৃহীত স্বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের স্বর্ণপিপীলিকা তিব্বতবাসী স্বর্ণ খননকারী ভিন্ন আর কিছু নহে। কারণ মেগাস্থিনিস নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দেরদাই অর্থাৎ দারাদ স্থানের জনসমূহের নিকট হইতে স্বর্ণ নীত হইয়া থাকে।

পারস্যাধিপতি দারিয়াসের আদেশ অনুসারে পারসীকগণ এসিয়া মহাদেশের অনেকাংশ অনুসন্ধান করিয়াছিল। সিন্ধুনদ কোন স্থানে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইবার জন্য পারস্যাধিপতি অভিলাষী হন। এই জন্য তিনি একদল বিশ্বাসী অনুসন্ধানকারীকে অর্ণবপোত যোগে প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রেরিত নাবিকগণ কাম্পাটিরাস ও প্যাকটাইসি দেশ (বর্ত্তমান পেশোয়ার জেলা) উত্তীর্ণ হইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা ত্রয়োদশ মাসে একটি প্রসিদ্ধ স্থানে উপনীত হন। এই স্থান হইতে মিশরাধিপতির আদেশে ফিনিসিয়ানগণ লিবিয়ার চতুঃপার্শ্ব পরিভ্রমণের জন্য অর্ণবপোতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পারসীকগণের ভ্রমণ শেষ হইলে, দারিয়াস ভারতবর্ষীয়দিগকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি সর্ব্বদা এই সমুদ্রে উপনীত হইতেন।

সিন্ধু নদ।

টিসিয়াস।

খৃষ্টের জন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক দেশে টিসিয়াস নামক একজন প্রতিভাশালী চিকিৎসাব্যবসায়ীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার যশোরাশি দেশে বিদেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। পারস্যের অধিপতি দ্বিতীয় দারিয়াস তাঁহার যশোকাহিনীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বদরবারে আহ্বান করেন। তদনুসারে টিসিয়াস জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্যে উপনীত হন এবং একাদিক্রমে সপ্তদশবৎসর তত্রত্য রাজ সভার ভূষণ স্বরূপ অবস্থিতি করেন। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

পারস্য দরবারে টিসিয়াস।

চিকিৎসা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনাতেই টিসিয়াসের সমগ্র সময় অতিবাহিত হয় নাই। দর্শন, কাব্য এবং ইতিহাসের অনুশীলনেও তাঁহার আনন্দ ছিল। তিনি পারস্যদেশের এক সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করিয়া ছিলেন। এই ইতিহাসই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠকীর্ত্তিস্তম্ভ। আমার তাঁহার আর একটি কীর্ত্তির উল্লেখ করিতেছি। ইহা তাঁহার লিখিত ভারত বিবরণ। টিসিয়াস কখনও স্বচক্ষে ভারতবর্ষ দর্শন করেন নাই। তৎকালে নানা কার্য্যোপলক্ষে পারসীক রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন; তদ্ব্যতীত বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষীয়দেরও পারস্যদেশে গমনাগমন ছিল। টিসিয়াস পারসীক রাজপুরুষ এবং ভারতবাসীর প্রমুখাৎ যাহা কিছু অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

টিসিয়াসের ইতিহাস।

টিসিয়াস লিখিত বিবরণ এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোটিয়াস নামক একজন লেখক ঐ বিবরণের এক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করেন, তাহাই এখন বিদ্যমান আছে; এতদ্ব্যতীত কয়েকখানি গ্রীক ইতিহাসেও টিসিয়াস লিখিত বিবরণের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই সমুদয় হইতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের অবস্থা কি প্রকারছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি।

কিন্তু টিসিয়াস অলৌকিকতাপ্রিয় ছিলেন; তাহার সমালোচনা শক্তিও তাদৃশ প্রখর ছিল না। এই কারণ তাঁহার লিখিত ভারত বিবরণ অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট এবং অলৌকিক বিবরণে পূর্ণ। ফলতঃ তদীয় বিবরণে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেক স্থলেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। একারণ পুরাতত্ত্ববিদ সমাজে টিসিয়াসের উচ্চাসন ছিল না তথাচ তল্লিখিত বিবরণ পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন করিত। টিসিয়াসের বর্ণিত অলৌকিক কাহিনী অতি প্রাকৃতবিশ্বাসীদিগকে মুগ্ধ করিত; এবং সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকই

তাঁহার ভাষার ওজস্বিতা, সরলতা এবং মধুরতায় প্রীত হইতেন। অন্য একটি কারণেও তাঁহার লিখিত ভারত বিবরণ পাঠক সমাজের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল; অলেকজণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভজন্য টিসিয়াসের গ্রন্থই গ্রীকগণের একমাত্র অবলম্বন ছিল। যাহাহউক, টিসিয়াস লিখিত ভারত বিবরণ অদ্যাপি পাঠক বর্গের কৌতূহল উদ্দীপন করিয়া থাকে। আমরা এখানে সে বিবরণের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষের আয়তন এসিয়ার অবশিষ্ট দেশ সমূহের তুল্য। ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি।

টিসিয়াসের ইতিহাসে ভারত-তত্ত্ব।

অন্যস্থান অপেক্ষা ভারতবর্ষের সূর্য্য দশগুণ বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতের উষ্ণতা বড় বেশী; তাদৃশ উষ্ণতা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ঝটিকা বা বৃষ্টি নাই; একমাত্র নদ নদীর জল দ্বারাই সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু সময় সময় প্রবল ঘূর্ণীবায়ু উত্থিত হইয়া থাকে; এই বায়ু মুখে যাহা কিছু পতিত হয়, তাহাই সুদূরে বিক্ষিপ্ত হয়। সূর্য্যোদয়ের সময় প্রকৃতি সুশীতল থাকে; কিন্তু দিবা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য উষ্ণতা উপস্থিত হয়।

ভারতবর্ষীয়েরা আকর হইতে লৌহ এবং স্বর্ণ উত্তোলন পূর্ব্বক দ্রব করিয়া ব্যবহারোপযুক্ত লৌহ ও স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত আছে। তাহারা নদনদী গর্ভস্থ বালুকা হইতেও স্বর্ণ সংগ্রহ করে।

সিন্ধুভূমির পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে। ভারত-বাসীরা বাঁশ দ্বারা এক প্রকার নৌকা নির্ম্মাণ করে; এই সকল নৌকায় একযোগে তিন চারিজন লোক আরোহণ করিতে পারে।

টিসিয়াস লিখিয়াছেন, ভারতীয় গুপারী অন্যান্যস্থানের গুপারী অপেক্ষা তিনগুণ বৃহৎ। তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের মনে হয়, এই ফল ভারত জাত নারিকেল ব্যতীত আর কিছু নহে।

টিসিয়াসের লিখিত বিবরণে আমরা বৃক্ষত্বকনির্ম্মিত এক প্রকার অঙ্গ-রাখার উল্লেখ দেখিতে পাই। কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতীয়গণ বৃক্ষত্বক দ্বারা অঙ্গ-রাখা প্রস্তুত করিত, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই।

টিসিয়াস লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিন্ধুদেশবাসীরা এক প্রকার জল-জন্তুর তৈল প্রস্তুত করিত; এই তৈলের সকল প্রকার জিনিস প্রজ্বলিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা ছিল। এই বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন যে, তৎকালে ভারতবাসীরা আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার অবগত ছিল।

ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থা।

টিসিয়াসের সময়ে ভারতবর্ষে সুরাপান প্রচলিত ছিল। তদীয় গ্রন্থে আমরা এক প্রকার সুমিষ্ট সুরার উল্লেখ দেখিতে পাই; আঙ্গুর ফল ভারতবর্ষে চিরকালই দুষ্প্রাপ্য; সম্ভবতঃ তাল ও ইক্ষুরসের সংমিশ্রণে এই সুরা প্রস্তুত হইত।

গ্রীক ইতিহাস সমূহে টিসিয়াস লিখিত বিবরণীর যে সকল অংশ রহিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় পশু পক্ষীর বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি, অনেকস্থলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। একারণ অনুমিত হয় যে, টিসিয়াস ভারতবাসীর আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপি বদ্ধ করিয়া ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এতৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু এখন পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। টিসিয়াস ভারতীয় পশুপক্ষীর যে বিস্তৃত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠক পাঠিকা গণের প্রীতিপ্রদ হইবেনা বিবেচনায়

এখানে কেবল ভারতবাসীর আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্বন্ধে লেখা হইল।

ভারতবাসীরা অনেকে কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু গ্রীষ্মাধিক্য নিবন্ধন তাহাদের বর্ণ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারেনা; কারণ ভারতবর্ষে সুগৌর নর-নারীরও অভাব নাই। ভারতবাসী ন্যায় পরায়ণ, রাজভক্ত এবং মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় শূন্য। তাহাদের ব্যবহার শাস্ত্রের বিধান সমূহ এবং আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট। ভারতবাসীরা তীর্থ দর্শন উপলক্ষে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করে; এইতীর্থ ক্ষেত্রে চন্দ্র ও সূর্য্য পূজিত হন। ভারতবাসীরা অতি দীর্ঘজীবি, ভারতবর্ষে দুইশত বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব (mineral) জল ব্যবহারে নানা ব্যাধি উপশমিত হইতে পারে, এই তত্ত্ব ভারতবাসীর নিকট পরিজ্ঞাত। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণের অভাব হইলে তাহাকে এক প্রকার ঔষধমিশ্রিত সুরা পানার্থ দেওয়া হয়; অভিযুক্ত ব্যক্তি এই সুরা বা ঔষধ পান করিয়া মত্ততা বশতঃ আত্মদোষ ব্যক্ত করে। নরহত্যাকারীকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ভারতবাসীরা শশক ও শৃগাল শিকার করিবার সময় কুকুর নিয়োগ করেনা; শকুনি, কাক এবং বাজপক্ষী শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে মৃগয়ায় নিয়োজিত করিয়া থাকে।

কৃষ্ণত্ব,আয়ু ও শিকার কাহিনী।

টিসিয়াস সর্ব্বত্রই মাত্র একজন নরপতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই কারণে তৎকালে, সমগ্র পশ্চিম ভারতে একজন অধিপতি রাজত্ব করিতেন বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ তৎকালে পশ্চিম ভারতে একাধিক নরপতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই রাজন্যবৃন্দ মধ্যে মাত্র একজনের বিষয় টিসিয়াস লিখিয়া গিয়াছেন, এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

পশ্চিম ভারতের রাজশক্তি।

টিসিয়াস স্বীয়গ্রন্থে দক্ষিণাপথবাসী একটি অসভ্য জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা পর্ব্বত গহ্বরে বাস এবং তৃণ বা বৃক্ষপত্র রচিত শয্যায় শয়ন করে। তাহারা চর্ম্ম পরিষ্কার করিতে সমর্থ; তাহাদের স্ত্রী পুরুষগণ স্বহস্ত নির্ম্মিত সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করে; তাহাদের মধ্যে যাহারা সবিশেষ ধনশালী, কেবল তাহারাই কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করে। তাহারা বহুসংখ্যক গর্দ্দভ ও মেষ পালন করে, এই সকলই তাহাদের সম্পদ বলিয়া গণ্য। দুগ্ধ, ফল ও মৃগয়ালব্ধ সূর্য্যকর শুষ্ক মাংস তাহাদের আহার্য্য সামগ্রী। তাহারা অসভ্য হইলেও ন্যায়পরায়ণ; পরের অনিষ্ট সাধন হইতে দূরে থাকে। তাহারা সুসভ্য আর্য্যগণের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহারা প্রতি বৎসর দক্ষিণাপথের আর্য্য নরপতিকে শুষ্ক ফলাদি বহুবিধ সামগ্রী উপহার প্রদান করে। আর্য্য নরপতিও প্রতি পঞ্চম বৎসরে তাহাদিগকে ধনুর্ব্বাণ, মৃগয়া ও যুদ্ধের উপকরণ রাজপ্রসাদ স্বরূপ দেন।

আর্য্য ও অনার্য্য।

বস্তুতঃ টিসিয়াসের প্রাগুক্ত বিবরণ হইতে তৎকালে আর্য্য জাতির সহিত অনার্য্য জাতির কীদৃশ সম্পর্ক ছিল এবং আর্য্যজাতির সংশ্রবে অনার্য্য জাতি কি ভাবে সভ্যতা লাভ করিতেছিল, আমরা তাহার আভাস প্রাপ্ত হই। অনতিক্রম্য পর্ব্বত অনার্য্যদিগকে পরাধীনতার হস্ত হইতে রক্ষা করিত; কিন্তু তথাপি তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী আর্য্যজাতির সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদের সহিত শান্তিতে বাস করিবার জন্যই প্রয়াসী ছিল। অনার্য্যগণ আপনাদের সংসার যাত্রার সৌকর্য্য সাধন জন্য আর্য্যজাতির সংশ্রবে আসিত এবং তৎফলে ধীরে ধীরে তাঁহাদের ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের অধীন হইয়া পড়িত।

আলেকজণ্ডারীয় যুগ।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীকবীর আলেকজণ্ডার দিগ্বিজয় উদ্দেশ্যে বিপুল সৈন্যসহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। পঞ্জাবের কিয়দংশ তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। তৎপ্রদেশে দুই বৎসর যাপন পূর্ব্বক তিনি সসৈন্যে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হন এবং শনৈঃ শনৈঃ পথ অতিক্রম করিয়া শতদ্রুর তীরে আগমন করেন। এই স্থানে উপনীত হইয়া গ্রীকসৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে; এই কারণ আলেকজণ্ডার আপনার দিগ্বিজয় বাসনা দমন করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

আলেকজণ্ডারের ভারত অভিযান।

আলেকজণ্ডারের সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক গ্রীকপণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকে ভারতবর্ষের সভ্যতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া জগৎ সমক্ষে তাহার সভ্যতা প্রকট করিয়াছিলেন। ভারতীয় ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে আলেকজণ্ডারের সহচর লেখকগণের গ্রন্থপাঠ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের অনধিগত অনেক ভারত তথ্য এই সকল বিবরণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রখ্যাত নামা গ্রীক লেখক ষ্ট্রেসন আলেকজণ্ডারের সহচর ভারত বিবরণী লেখকবর্গকে মিথ্যাবাদীর দল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মতে তাদৃশ নির্দ্দেশ অযথা নিন্দাবাদরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। অবশ্য কতিপয় লেখক অতিরঞ্জন দোষে সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এরূপ লেখকেরও অভাব নাই, যাহাদের লিখিত বিবরণে আমরা সত্যানুমোদিত উজ্জ্বল চিত্র সকল দর্শন করিতে পারি।

আলেকজণ্ডারের সহচর লেখকগণ।

পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ম্যাকরিণ্ডেল সাহের আলেকজণ্ডারের ১৯ জন সহচরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইঁহাদের লিখিত সমস্ত গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে পরবর্ত্তী কালের লেখকগণ যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, এখন কেবল তাহাই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমুদায় উদ্ধৃত অংশ অবলম্বন করিয়া ছয় জন প্রতিষ্ঠাবান লেখক মহাবীর আলেকজণ্ডারের ভারত অভিযানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত ইতিহাস ভাষার মাধুর্য্যে এবং সত্যানুমোদিত তথ্যের প্রাচুর্য্যে হৃদয়গ্রাহী। আমরা এই সকল গ্রন্থ অবলম্বনে আলেকজণ্ডারীয় যুগের ভারতীয় সভ্যতা কীদৃশ ছিল, তাহা প্রদর্শন করিব।

আলেকজণ্ডার ভারতীয়দিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই কারণ তদীয় সমভিব্যাহারী লেখকগণের পক্ষে ভারতবাসীর শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় লাভের সুবিধা ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে ভারতবাসীর শৌর্য্য বীর্য্যের অনেক বর্ণনা রহিয়াছে। আলেকজণ্ডার ভারতবর্ষের রণক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাস লেখকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যদি ভারতীয়গণ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুরুর ন্যায় রণপণ্ডিত সেনাপতির অধিনায়কত্বে আলেকজণ্ডারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন, তবে গ্রীক সৈন্য নিশ্চয়ই ধ্বংসমুখে পতিত হইত, সিন্ধুনদের তটদেশেই আলেকজণ্ডারের সৌভাগ্যের সমাধি হইত। গ্রীক লেখকগণ ভারতবাসীর রণমত্ততা, রণকুশলতা এবং সাহসিকতার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাদৃশ নির্দ্দেশ সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ গ্রীক লেখকগণ মুক্তকণ্ঠে ভারতবাসীর শৌর্য্যবীর্য্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আলেকজণ্ডার

ভারতীয়গণের শৌর্য্য বীর্য্য

দিগ্বিজয় উপলক্ষে আট বৎসর কাল বিদেশে যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আর কোন দেশে তাদৃশ বল সম্পন্ন রণপটু সৈন্য পরিদর্শন করেন নাই। এরিয়ান লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসীর শারীরিক দৈর্ঘ্য পাঁচ হস্ত পরিমিত ছিল, সমগ্র এসিয়াখণ্ডে ভারতবাসীর ন্যায় সুদীর্ঘ মনুষ্য আর দেখা যায় নাই। গ্রীক সৈন্য শতদ্রুর তীরে উপনীত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইয়াছিল; ঐতিহাসিকগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই অসম্মতি প্রকাশ করে। এই নির্দেশ সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্লুটার্ক লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় সৈন্যের শৌর্য্যবীর্য্য গ্রীক সৈন্যের মনে ভীতির সঞ্চার করে; রণক্ষেত্রে পুরু পরাজিত হইলেও তদীয় সৈন্যের অতুল বীরত্ব তাহাদিগকে নিঃসাহস করিয়া তুলে; তারপর তাহারা গঙ্গার তীরবর্ত্তী মগধ এবং গঙ্গারাঢ় (বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় প্রদেশ) প্রভৃতি রাজ্যের বল ও সম্পদের (১) বিষয় অবগত হইয়া ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বিলাপ করিতে করিতে আলেকজণ্ডারকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুরোধ করে; আলেকজণ্ডার তাহাদের প্রাণে তেজ ও উৎসাহ সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে অপূর্ব্ব বাগ্মীতার অবতারণা করেন, কিন্তু গ্রীক সৈন্য ভারতবাসীর অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যের দৃষ্টান্তে এতদূর ভীত হইয়াছিল যে, তাঁহার সমস্ত যত্ন নিষ্ফল হয়।

(১) কুইণ্টাস কারিটিয়াস রুপাসের মতে মগধাধিপতির বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই হাজার রথ এবং তিন হাজার রণ-হস্তী ছিল। এই রণ হস্তীই গ্রীকসৈন্যের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীতিপ্রদ হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন, গঙ্গারাঢ়িজাতির বিপুল সংখ্যক সুবৃহৎ রণহস্তী বিদ্যমান। এই কারণ এ পর্য্যন্ত কোন বৈদেশিক নরপতিকর্ত্তৃক তাহাদের দেশ বিজিত হইতে পারে নাই।

ভারতবাসীর রণ কৌশল যথেষ্ট ছিল। আমাদের নির্দ্দেশের প্রমাণ স্বরূপ মহারাজ পুরু আলেকজণ্ডারের গতিরোধ জন্য যে প্রকার কৌশলে ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার বর্ণনা করিতেছি। "মহারাজ পুরু চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, তিন শত রথ, দুই শত রণহস্তী এবং ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্যসহ আলেকজণ্ডারের গতিরোধ জন্য অভিযান করিলেন। তারপর একটি কর্দ্দম শূন্য বালুকাবিশিষ্ট সুদৃঢ় প্রান্তরে উপনীত হইলেন। মহারাজ পুরু ঐস্থান অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচালন জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এই কারণ সেখানে হিন্দু সৈন্যের ব্যূহ রচিত হইল। প্রথম শ্রেণীতে পদাতিক সৈন্য স্থাপিত হইল, এই শ্রেণীর অগ্রভাগে মাঝে মাঝে রণহস্তী দণ্ডায়মান রহিল; গ্রীক অশ্বারোহী সৈন্যের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যেই রণহস্তী সকল সম্মুখভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। পুরুর বিশ্বাস ছিল যে, রণহস্তীর ভয়ে কি পদাতিক, কি অশ্বারোহী, গ্রীক সৈন্য মাত্রেই হিন্দু সৈন্যের উপর পতিত হইতে সাহসী হইবে না। রণহস্তী সকলের পার্শ্ব অতিক্রম করিয়াও পদাতিক সৈন্য স্থাপিত হইল, পদাতিক সৈন্যের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্যের সম্মুখভাগে রথ সমূহ সজ্জিত হইল।"

মহারাজ পুরু।

ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধকালে নানাপ্রকার বিভিন্ন প্রণালীতে সজ্জিত হইত। এতন্মধ্যে এরিয়ান এক প্রকার রণসজ্জার বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রণ সজ্জা।

"পদাতিক সৈন্য হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করে; এই সকল ধনু দৈর্ঘ্যে পদাতিক সৈন্যের তুল্য। তাহারা মৃত্তিকার উপর ধনু স্থাপন পূর্ব্বক বাম পদদ্বারা সবলে ধারণ করিয়া পশ্চাদভিমুখে জ্যা আরোপণ পুরঃসর বাণ নিক্ষেপ করে। এই সকল বাণ দৈর্ঘ্যে তিন

গজ অপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন এবং এরূপ তীক্ষ্ণধার ও বেগশালী যে, ঢাল বা উরস্ত্রাণ কিছুতেই উঁহাদের সন্ধান ব্যর্থ হয় না। পদাতিক সৈন্য বাম হস্তে গোচর্ম্ম নির্ম্মিত ঢাল ধারণ করে। এই সকল ঢাল আকারে পদাতিক সৈন্যের তুল্য। কোন কোন পদাতিক সৈন্য ধনুর্ব্বাণের পরিবর্ত্তে বর্ষা বা শল্যদ্বারা যুদ্ধ করে; কিন্তু সৈন্য মাত্রেরই কটিদেশে তরবারি শোভিত থাকে। এই তরবারি দৈর্ঘ্যে তিন হস্ত পরিমিত; ইহার ফলক সুপ্রশস্ত। বাহু যুদ্ধের সময় সৈন্যগণ এই তরবারি দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক আঘাত করে। অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে দুইটি বর্ষা থাকে। কিন্তু এই বর্ষা পদাতিক সৈন্য-ধৃত বর্ষা অপেক্ষা অল্লায়তন। অশ্বারোহী সৈন্য অশ্ব পৃষ্ঠ আস্তরণ দ্বারা সজ্জিত করে না; অশ্ব-রশ্মিতে লৌহখণ্ডও ব্যবহৃত হয় না।”

ভারতীয় সৈন্যগণ যে কেবল শৌর্য্যবীর্য্যশালী এবং রণ-কৌশলজ্ঞ ছিল, তাহা নহে, তাহাদের হৃদয় স্বজাতি প্রেমেও অলঙ্কৃত ছিল।

ভারতবাসীর স্বজাতি প্রেম।

আলেকজণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত অভিযানের ইতিহাস পাঠ করিলে তাদৃশ প্রেমের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা এরিয়ানের গ্রন্থ হইতে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আলেকজণ্ডার মাসেগা নগর আক্রমণ করিলে তত্রত্য সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিতে দণ্ডায়-মান হয়। কিন্তু তাহাদের সংখ্যার ন্যূনতা নিবন্ধন বিজয়শ্রী গ্রীক সৈন্যের দিকে হেলিয়া পড়েন। তখন ভারতীয় সৈন্য আলেকজণ্ডারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করে। আলেকজণ্ডার বলিয়া পাঠান, যদি তোমরা আমার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে স্বীকার কর, তবে আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারি। এই উত্তর শ্রবণ পূর্ব্বক ভারতীয় সৈন্যগণ আলেকজণ্ডারের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বজাতির রক্তপাত করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ কল্প করিল এবং গ্রীক সৈন্যের

তরবারির মুখে নিপতিত হইয়া নিহত হইতে লাগিল। প্লুটার্কের মতে আলেকজণ্ডারের এই ব্যবহার তাহার বিমল যশোরাশিতে কলঙ্ক চিহ্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী।

আলেকজণ্ডারের আগমন কালে পঞ্চনদ বিধৌত প্রদেশ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, ইহার কোন কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুরাকালে বর্ত্তমান জালালবাদ জিলা হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে নিশা নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত ছিল। মহাবীর আলেকজণ্ডার সসৈন্যে এই রাজ্যের দ্বার দেশে উপনীত হইলে তদ্দেশ বাসীরা তাঁহার সমীপে আপনাদের অধিনায়ককে প্রেরণ করেন। এই অধিনায়ক এবং তদীয় সহযোগিগণের প্রার্থনায় আলেকজণ্ডার দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাদের রাজ্যের প্রতি হস্তার্পণ করিতে বিরত থাকেন। এরিয়ান লিখিয়াছেন যে, নিশা রাজ্যের শাসন কার্য্য সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের হস্তে ন্যস্ত ছিল জন্যই আলেকজণ্ডার প্রীত হইয়া তাহার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন। গ্রীক ইতিহাসে নিশার ন্যায় আরও অনেক প্রজাতন্ত্র প্রণালী বিশিষ্ট রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি যে, শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী প্রদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ শাসনকার্য্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় গণের হস্তে ন্যস্ত ছিল; অধুনা যে স্থান কাটিগার নামে খ্যাত হইয়াছে, তথায়ও আলেকজণ্ডারীয় যুগে পঞ্চায়তি প্রথায় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত বলিয়া প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতীয় রাজন্য বর্গ

পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী বিশিষ্ট রাজ্যের পার্শ্বেই রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলেকজণ্ডার পঞ্চনদ বিধৌত প্রদেশে সৌভূত নামক রাজার রাজ্যের সম্মুখে গমন করিয়া ছিলেন। কুইণ্টাস কারিটিয়াস-

ক্লপাস এই রাজ্যের সুশাসনের প্রশংসা করিয়াছেন। আলেকজণ্ডারীয় ইতিহাসে তাদৃশ সুশাসিত রাজ্যের আরও নাম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ফলতঃ তৎকালে ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ শাসন কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধানে অবহিত ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই রাজধর্ম্ম পরায়ণ নরপতি গণের বিলাসিতা ষোল কলায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। আমাদের মতের সমর্থন জন্য ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের প্রশংসা ক্লপাসের গ্রন্থ হইতেই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

নরপতি অনুগ্রহ করিয়া রাজ পথে বহির্গত হইলে তদীয় অনুচরগণ রৌপ্য নির্ম্মিত গন্ধ পাত্র হস্তে তাঁহার সমভিব্যহারে গমন করে, সমস্ত পথ সৌগন্ধে আমোদিত করিয়া তোলা হয়। তিনি মণি মুক্তা খচিত স্বর্ণ নির্ম্মিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করেন, তাঁহার কারুকার্য্য সম্বলিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের প্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাঁহার শিবিকার পশ্চাতে শরীর রক্ষী ও সশস্ত্র সৈন্যগণ গমন করে। তাহাদের কাহারও কাহারও হস্তে বৃক্ষ শাখা সকল স্থাপিত দেখা যায়; এই সকল শাখায় পালিত পক্ষী বসিয়া থাকে। রাজ প্রাসাদের স্তম্ভ সমূহ সোণার জলে চর্চ্চিত এবং সোণার লতা পাতা ও নয়নরঞ্জন রূপার পক্ষী সমূহে সজ্জিত। রাজপ্রাসাদের দ্বার সর্ব্বসময়ের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। এমন কি, রাজার কেশ বিন্যাস এবং পরিচ্ছদ পরিধানের সময়ও আগন্তুকগণ সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন। নরপতি রাজদূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তারপর প্রকৃতিপুঞ্জের আনীত অভিযোগ সমুদায় মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সকল রাজকার্য্য শেষ হইলে তিনি পাদুকা উন্মোচন করেন; ভৃত্যগণ তাঁহার পদতলে সুগন্ধি নিষিক্ত তৈল মর্দ্দন করিয়া দেয়। মৃগয়াই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য। যে সময় নরপতি রাজোদ্যানে মৃগয়ায় লিপ্ত হন, তখন রাজ পালিত সুকণ্ঠ

বারনারীদের মধুর সঙ্গীতে চারি দিক মুখরিত হইয়া উঠে। নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন করিবার সময় তিনি অশ্বে আরোহণ করেন, কিন্তু রণোপলক্ষে দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে হইলে হস্তী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল হস্তীর পৃষ্ঠ স্বর্ণ খচিত আস্তরণে সজ্জিত হয়। রাজাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক কমনীয় কান্তি নর্ত্তকী স্বর্ণ নির্ম্মিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করে। রাজার রন্ধন শালায় পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তত্রত্য সমস্ত কার্য্য পাচিকা দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। রাজা ভোজনার্থ উপবেশন করিলে এই সকল পাচিকা সুরা পরিবেশন করে। তিনি সুরাপানে বিভোর হইয়া তন্দ্রাবিষ্ট হইলে পার্শ্ববর্ত্তিনী নর্ত্তকীগণ তাঁহাকে শয়ন কক্ষে লইয়া যায়।

ভারতীয় প্রকৃতি পুঞ্জের বসন ভূষণ

রাজানুকরণে প্রকৃতিপুঞ্জও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণ উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবস্ত্রে পদ পর্য্যন্ত আবৃত করিত। চন্দন কাষ্ঠের পাদুকা ব্যবহার ও মস্তকে কার্পাস বস্ত্র নির্ম্মিত সুদৃশ্য পাগড়ী পরিধান করিত। বহু মূল্য মণি শোভিত কুণ্ডল তাহাদের কর্ণের শোভা বর্দ্ধন করিত; ধনশালী অথবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাহু ও কটিদেশ স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত করিত। তাহারা সর্ব্বদা কেশ বিন্যাস করিত, তাহারা কদাচিৎ মস্তকের কেশ কর্ত্তন করিত। তাহারা সযত্নে গুম্ফ রক্ষা করিত, কিন্তু মুখ মণ্ডল মসৃণ দেখাইবার জন্য শ্মশ্রু মুণ্ডন করিত। ভারতবাসীরা বৃক্ষত্বক নির্ম্মিত এক প্রকার অঙ্গরাখা পরিধান করিত।

রূপাস ভারতীয় প্রকৃতি পুঞ্জের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে প্রদর্শন করিলাম। এই প্রসঙ্গে আমরা এরিয়ানের গ্রন্থ হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ভারতীয়গণের পরিচ্ছদ কার্পাস নির্ম্মিত। কার্পাস বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায়। তাহারা কটি হইতে পদ গ্রন্থি পর্য্যন্ত কার্পাস বস্ত্র পরিধান করে এবং আর এক

খণ্ড বস্ত্রের একাংশ দ্বারা মস্তক আবরণ করিয়া অপরাংশ স্কন্ধ দেশের উপর দিয়া লম্বমান রাখে। ভারতবাসীরা শ্বেত চর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করে। এই সকল পাদুকা সযত্নে কারুকার্য্য দ্বারা শোভিত করা হয়। ভারতীয়গণ মধ্যে নানা বর্ণ দ্বারা গোঁফ রঞ্জিত করিবার প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই বিলাস প্রিয়তা ভারতীয়গণকে সাতিশয় সৌন্দর্য্য প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। সে সৌন্দর্য্য প্রিয়তা কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের স্বভাব বিকৃত করে এবং তৎকালে তাহাদের সমাজে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত

ভারতবাসীর সৌন্দর্য্যানুরাগ

হয়। আমরা এক্ষণ সেই প্রথার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঐতিহাসিক দিওডোরাস আমাদের অবলম্বন। রূপাসের গ্রন্থেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। "সৌভূত নামক রাজার রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা সকল মঙ্গলকর, রাষ্ট্রীয় নীতি প্রশংসনীয়, প্রকৃতি পুঞ্জ সাতিশয় সৌন্দর্য্য পিপাসু। এই কারণ কোন সন্তানের জন্ম মাত্রই তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য যথেষ্ট কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। যে সকল শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিচয় সুগঠিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা ভবিষ্যতে বল ও সৌন্দর্য্যশালী হইবে বলিয়া বুঝা যায়. কেবল তাহাদিগকেই জীবিত রাখার নিয়ম আছে। বিকালাঙ্গ শিশুদিগকে জীবন ধারণের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া বিনষ্ট করা হয়। (১) বিবাহের সময় পাত্রী নির্ব্বাচনেও তাহাদের সৌন্দর্য্যের প্রতি পক্ষপাতিতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা পাত্রী পক্ষ ধনশালী বা সম্ভ্রান্ত বংশীয় কিনা তাহা বিবেচনা করে না, পাত্রী সুন্দরী হইলেই বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া ফেলে।"

(১) ম্যাকরিণ্ডেল সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, স্পার্টান্‌দের মধ্যেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল।

ভারতবাসীর বিলাসিতা এবং সৌন্দর্য্য পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ স্পৃহা এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা দেখিয়া গ্রীক পণ্ডিত ষ্ট্রাবো বিস্মিত হইয়া ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এই প্রকার বিলাসিতার মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। তথাচ ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর লোক দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকে বনে বা নির্জ্জন প্রান্তরে বাস করে। তাঁহাদের প্রকৃতি অত্যদ্ভুত। বার্দ্ধক্য আগত হইলে অথবা স্বাস্থ্য নাশ ঘটিলে তাঁহারা অগ্নি কুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করেন।" ভারতবর্ষের দর্শন শাস্ত্র বেত্তৃগণের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ কুল হইতে উদ্ভূত হইতেন। আলেকজণ্ডারের সহচর নিয়ারকস ব্রাহ্মণ জাতির সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ রাজন্য বৃন্দকে মন্ত্রণা প্রদান করেন, অনেকে তপশ্চারণ এবং অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। ইহাও দেখা যায় যে, রমণীগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ মাত্রেই, কি স্ত্রী, কি পুরুষ তপস্বীর ন্যায় শুদ্ধাচারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, ব্রাহ্মণগণ গ্রন্থ লিপি বদ্ধ করিবার জন্য এক প্রকার বৃক্ষত্বকের ব্যবহার করিতেন। নিয়ারকস লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐ কারণ এক প্রকার বস্ত্র ও ব্যবহৃত হইত।

ভারতবাসীর জ্ঞান স্পৃহা

বার্দ্ধক্য বা স্বাস্থ্যনাশ বশতঃ অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জনের কথা শ্রবণ করিয়া তৎকালে পতির মৃত্যু হইলে পত্নী সহমরণে গমন করিতেন কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য আমাদের কৌতূহল জন্মে। ঐতিহাসিক দিওডোরাস লিখিয়া গিয়াছেন, কেটুয়াস নামক একজন ভারতীয় সেনাপতি মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তাঁহার পত্নীদ্বয় মধ্যে প্রতি দ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়; তাহাদের মধ্যে কে পতি সহ চিতায় জীবন বিসর্জ্জন

সতীদাহ

করিতেন, এই বিষয়ের নির্দ্ধারণই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ ছিল। এই সময় জ্যেষ্ঠা পত্নী অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আলেকজণ্ডারীয় যুগে ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা বিদ্যমান ছিল। এই স্থানে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে ইহাও উপলব্ধ হয় যে, তৎকালে ভারতবর্ষে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা বিদ্যমান ছিল।

কারটিয়াস নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এক পূর্ণ চন্দ্র হইতে অন্য পূর্ণ চন্দ্র পর্য্যন্ত গণনা করিয়া মাস নির্দ্ধারণ করিবার নিয়ম ছিল না; প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গণিত হইত। "ত্রিশ দিনে একমাস, বার মাসে এক বৎসর, মাস দুই পক্ষে বিভক্ত, এক পক্ষে ১৫ দিন, এক দিনে ৩০ মুহূর্ত্ত, ভারতবাসীর কাল নিরূপণের এই প্রকার নির্ঘণ্ট। ৩৬০ দিন ব্যাপী বৎসরের সহিত প্রাকৃতিক সময়ের সামঞ্জস্য বিধান জন্য ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ ১৮৬০ চান্দ্রদিনের পঞ্চ বার্ষিক চক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রথম তিন বৎসরের হিসাব এইরূপ, বার মাসে এক বৎসর এবং ত্রিশ দিনে এক মাস। চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরের হিসাব এইরূপ, তের মাসে বৎসর এবং ত্রিশ দিনে এক মাস।" জর্ম্মাণ পণ্ডিত বেবর সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতীয়গণ ব্যাবিলিয়ন হইতে এই গণনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভট্ট ম্যাক্স মূলার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই গণনা ভারত বাসীরই মস্তিষ্কোদ্ভূত।

সময় গণনা

আমরা এরিয়ানের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিয় আলেকজণ্ডারীয় যুগের ভারতীয় সভ্যতার চিত্র সম্পূর্ণ করিতেছি।

ভারতবাসী ক্ষীণকায় এবং দীর্ঘবাহু। তাহারা উষ্ট্র, গর্দ্দভ এবং অশ্বে আরোহণ করে। ধনবানেরা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া থাকেন। হস্তীর নিম্নেই চতুঃচক্র রথের স্থান

এরিয়ান

নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। উষ্ট্রের তৃতীয় স্থান; এক ঘোড়ার গাড়ীর কোন সম্মান নাই। বরপণ অথবা কন্যাপণ গ্রহণ করিবার প্রথা বিদ্যমান নাই। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে পিতা তাহাকে সভাস্থলে আনয়ন করেন: তারপর কন্যার পাণি প্রার্থিগণ মধ্যে যিনি মল্লযুদ্ধে জয়শ্রী লাভ করেন, তিনি কন্যারত্নের অধিকারী হন। ভারতবাসী অধিকাংশ স্থলেই নিরামিষ (শস্য) ভোজী কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পার্ব্বত্য জাতীয় লোকেরা মৃগয়ালব্ধ মাংস আহার করিয়া থাকে।

মেগাস্থিনিস। *

মহাকবি হোমরের সময়েও গ্রীকজাতি ভারতবর্ষের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিল। তদীয় মহাকাব্যে ভারতজাত পণ্যদ্রব্যের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু তৎকালে গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত ছিল, তাহা অলৌকিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে ভারতবর্ষ প্রাচ্য "ইথিওপিয়া" নামে অভিহিত হইয়াছে। তৎসমুদায়ে প্রাচ্য "ইথিওপিয়া" সম্বন্ধে বহু অলৌকিক জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীক "ইথিওপিয়া"

* রাজসাহীর অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় ঐতিহাসিক চিত্র নামক ত্রৈমাসিক পত্রে মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমতি ক্রমে তাহা হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল। ভবানী বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পারস্যের সহিত গ্রীক রাজ্যের যুদ্ধ সংঘটনের সময় হইতেই গ্রীকগণ ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় লাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক হেকাটিয়াসই সর্ব্বপ্রথমে (৫৪৯—৪৮৬ খৃঃ পূঃ) ভারতবর্ষের কথা স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তারপর ঐতিহাসিক কুলের আদি পুরুষ স্বরূপ হিরোডোটসের গ্রন্থে ভারত সীমান্তবর্ত্তী সিন্ধুনদ বা তৎতীরস্থ মরু-ভূমির বিবরণ প্রদত্ত হয়। হিরোডোটসের পর টিসিয়াস ভারত-বিবরণী রচনা করেন। অতঃপর মহাবীর আলেকজণ্ডারের সহচর লেখকগণ ভারত বৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থ হইতেই গ্রীকগণ সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষের বাস্তব বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। মহাবীর আলেকজণ্ডার এবং তদীয় সহচরগণের ভারতীয় অভিজ্ঞতা কেবল পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ তদপেক্ষা বিস্তৃত স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সহিত গ্রীকজাতির পরিচয়।

আলেকজণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক রাজন্যবৃন্দ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি মগধেশ্বরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করায় গ্রীক্‌দূতগণ ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া গ্রীক ভাষায় ভারত-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের সাধারণ নাম ইণ্ডিকা; তন্মধ্যে মেগাস্থিনিসের গ্রন্থই বহুজন পরিচিত।

মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা

মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রীক সাহিত্যের অন্যান্য পুস্তকে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা সঙ্কলন করিয়া পণ্ডিত সোয়ানবেক লাটিন ভাষায় লিখিত উপক্রমণিকাসহ প্রকাশ করিয়া-ছেন।* পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ম্যাকরিণ্ডেল সাহেব উক্ত

গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করায় ইণ্ডিকা এখন আমাদের পক্ষে সহজ লভ্য হইয়াছে।

মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষে ভূচর বা খেচর, সর্ব্ব প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ বলশালী জীব জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশে হস্তী অসংখ্য। এই সকল হস্তী বৃহদায়তন। লিবিয়া দেশের পালিত হস্তী অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় হস্তী অধিক বলশালী। ভারতীয়গণ বহুসংখ্যক হস্তী অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে রণকৌশলে সুশিক্ষিত করায় তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে জয় সাধনে সবিশেষ সহায়তা করিতেছে।

জীবজন্তু।

কৃষিবিদ্যা বলে যত প্রকার ফল শস্য লাভ করা যাইতে পারে, ভারতভূমি তাহা প্রদান করিয়া থাকে। অধিকন্তু ভূগর্ভ নানাবিধ ধাতুস্তরে সঞ্জীভূত রহিয়াছে, কারণ এই দেশে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; লৌহের পরিমাণও অল্প নহে। টিন এবং অন্যান্য ধাতুও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ধাতুর যথাযোগ্য ব্যবহারার্থ ভারতীয়গণ বিবিধ প্রকার অলঙ্কার, পাত্র, যন্ত্র এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে অসংখ্য পর্ব্বত এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে সর্ব্বপ্রকার ফলবান বৃক্ষ বর্ত্তমান। অত্যুর্ব্বর সমতল ভূমি যথেষ্ট, সমস্তই অল্পাধিক সুন্দর এবং বহু নদনদী প্লাবিত। তদ্ব্যতীত অধিকাংশ ভূমি পয়ঃপ্রণালী সংযোগে জলসিক্ত হইতেছে; তজ্জন্য বৎসর মধ্যে দুইবার শস্য উৎপন্ন হয়। এদেশে শীতকালে গম, যব এবং মটর প্রভৃতি বপন করিবার সময় এক বার বৃষ্টি হয়; গ্রীষ্মকালে ধান্য, কৃষ্ণতিল, কোষ্টা, ভুট্টা এবং "বস্ পোরম" বপন করিবার সময় আর একবার বৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভারতজাত শস্য এবং ধাতু।

ভারতবর্ষীয়গণ পর্য্যাপ্ত ভোজ্য লাভ করিয়া অন্যান্য জনপদের

অধিবাসীর অপেক্ষা বৃহৎ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাদের গর্ব্বো-দীপ্ত আকৃতি দর্শন করিলেই তাহাদিগকে পৃথক জাতি বলিয়া চিনিতে পারা যায়। তাহারা কলা বিদ্যায় সুনিপুণ, যাহারা অত্যুৎকৃষ্ট পানীয় জল এবং সুবিমল সমীরণ ভোগ করে তাহারা কলাবিদ্যায় নিপুণ হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

ভারতবর্ষের উৎকর্ষতা।

ভূমি অত্যুর্ব্বর, নদনদী এবং কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী দ্বারা সিক্ত; ফল-বান বৃক্ষ পর্য্যাপ্ত; ভূগর্ভ নানাবিধ ধাতুস্তরে সজ্জীভূত; এই সমস্ত কারণে সকলেই বলিয়া থাকে যে, ভারতবর্ষে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই। এমন কি, শরীর ধারণের উপযোগী শস্যাদির অপ্রাচুর্য্যের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষীয়দিগের ব্যবহার গুণেও তাহাদের দেশে দুর্ভিক্ষ প্রবেশ করিতে পারে না। অন্যান্য জাতির মধ্যে যুদ্ধ কলহ উপস্থিত হইলে তাহারা প্রায়ই শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া তাহাকে কণ্টক ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষীয়গণ তদ্বিপরীত আচরণ করে। তাহাদের নিকট কৃষককুল পবিত্র এবং অনাক্রমণীয় বলিয়া সম্মানার্হ। যাহারা ভূমি কর্ষণ করে, তাহাদের পার্শ্বস্থ স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও তাহারা কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা করে না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরকে বিনষ্ট করিলেও উভয় সেনাদলই কৃষকদিগকে নিরুদ্বেগে হল কর্ষণ করিবার অবসর প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয়গণ শত্রুরাজ্যেও কদাচ বৃক্ষচ্ছেদন বা অগ্নিসংযোগ করে না।

মেগাস্থিনিস যে কেবল ভারতীয়গণের যুদ্ধ নীতিই উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি ভারতবাসীর সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতিরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখন সংক্ষেপে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যদিও অতি বিস্তৃত এবং বহু জাতির বাসভূমি, তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহ ভিন্ন দেশাগত নহে, সকলেই দেশের আদিম অধিবাসী। ভারতের লোক বিদেশে এবং বিদেশের লোক কখনও ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। (১) অতি পুরাকালে ভারতীয়গণ গ্রীকদিগের ন্যায় স্বচ্ছন্দ বনজাত ফল মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ এবং পশুচর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত ; গ্রীকদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও শিল্প ও মনুষ্যের উন্নতিকর অন্যান্য উপায় ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ভারতবাসীর আচার ব্যবহার, দাসত্বপ্রথা, চৌর্য্য, সুরাপান, মিতব্যয়িতা, সত্যবাদিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে যে সকল নিয়মপ্রণালী প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রাচীন দার্শনিক গণের একটি নিয়ম অতীব প্রশংসার্হ। সে নিয়মটি এই যে, কখনও কোন অবস্থায় কেহ অন্যের দাস হইবে না ; সকলেই স্বাধীন থাকিয়া স্বাধীনতার উপর মানব মাত্রেরই ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে। ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকগণ মনে করিতেন, যাহারা কখনও কাহারও উপর আধিপত্য করেনা বা কাহারও নিকট দাসত্ব স্বীকার করেনা, তাহারাই জীবনের সর্ব্বপ্রকার অবস্থা বিপর্য্যয়োপযোগী প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ। কারণ, যে বিধি সকলকে সমানভাবে বাধ্য করে, অথচ সম্পত্তির বিভাগ বৈষম্যে বাধা জন্মায় না, তাহাই সুন্দর ও সমীচীন।

ভারতবাসীরা মৃতের স্মৃতি সংরক্ষণ জন্য কোনরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না। কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে, জীবিত কালে মনুষ্য যে সমস্ত সৎকার্য্য করে, এবং ঐ সকল সৎকার্য্যের জন্য তাহাদের যে সুযশঃ কীর্ত্তিত হয়, তাহাই মৃত্যুর পর আমাদের স্মৃতি রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট।

(১) মেগাস্থিনিসের এই বর্ণনা সত্য নহে।

ভারতবাসীরা সাধারণতঃ মিতব্যয়ী, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা আরও অধিক মিতব্যয়ী হইয়া থাকে। তাহারা বহু অশিক্ষিত (undisciplined) লোকের সমাবেশ একেবারেই পছন্দ করে না, কাজেই সুনিয়ম রক্ষা করিয়া চলে। ভারতবর্ষে চুরির সংখ্যা অতি অল্প। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যে চারিলক্ষ সৈন্য গমন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রত্যহ যে চুরির সংবাদ জানা যাইত, তাহা দুইশত ড্রেকামের (এক ড্রেকামের বর্ত্তমান মূল্য ৯¾পেন্স) অধিক নহে। যাহাদের কোন লিপিবদ্ধ আইন নাই এবং যাহারা লেখা পড়া জানে না বলিয়া জীবন যাত্রার কার্য্য সম্বন্ধে কেবল স্মরণ শক্তির উপরই নির্ভর করে, এই সকল চুরি সাধারণতঃ কেবল তাহাদের মধ্যেই ঘটিত। যাহাহউক, ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও মিতব্যয়ী বলিয়া বড় সুখে কালাতিপাত করে। যজ্ঞ সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে ইহারা মদ্য স্পর্শও করে না। ইহারা চাউল সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করে। ইহাদের খাদ্য সাধারণতঃ অন্ন ও তরকারী। ভারতীয়গণের আইন কানুন ও চুক্তি এরূপ সরল যে, তাহারা কদাচিৎ বিচারালয়ে বিচার প্রার্থনা করে। তাহাদের মধ্যে কখনও বন্ধক বা আমানতের মোকদ্দমা হয় না। ভারতবর্ষে মোহর, দস্তখত বা সাক্ষীর কোন প্রয়োজন নাই। ভারতীয়গণ আমানত-আদি সমস্ত কার্য্য বিশ্বাসের উপর নিভর করিয়া সম্পাদন করে। তাহারা ঘরবাড়ী এবং জিনিসপত্র সাধারণতঃ অরক্ষিত ভাবে ফেলিয়া রাখে। এই সকল রাতি নীতি হইতে প্রমাণ হয় যে, ভারতবাসীর বুদ্ধি সুধীর ও সৎ। কিন্তু তাহারা এমন অনেক কাজ করে, যাহা অনুমোদন করা যায় না; যথা, তাহারা একাকী বসিয়া আহার করে, তাহাদের মধ্যে সকলে একত্র বসিয়া আহার করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপিত নাই। যাহার যখন ইচ্ছা, সে তখন আহার করে। সুসামাজিক এবং সভ্যদের পক্ষে ইহার বিপরীত বিধিই

হিতকর। ভারতবাসীরা আহারার্থ উপবিষ্ট হইলে তাহাদের সম্মুখে এক ত্রিপদ টেবিল রক্ষিত হয়; ইহার উপর সোণার বাটীতে পর্য্যায়-ক্রমে অন্ন ও অন্যান্য সুখাদ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে।

শারীরিক ব্যায়াম ক্রিয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার কুস্তি ও গাত্র মর্দনই ভারতীয়গণের সর্ব্বাধিক প্রিয়। তন্মধ্যে এরূপ কাষ্ঠ নির্ম্মিত মুদ্গর দ্বারা গাত্র মর্দ্দন ইহাদের আরও প্রিয়। ইহাদের শব মন্দির নিরলঙ্কার এবং কবর গুলি অনুচ্চ। যদিও ভারতীয় গণের আচার

পোষাক পরিচ্ছদ;

ব্যবহার অত্যন্ত সরল, তথাপি সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার প্রিয়তা অত্যধিক। ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ চারু স্বর্ণ-কার্য্য-শোভিত এবং বহু মূল্য রত্নরাজি খচিত। ইহারা সুন্দর মলমলের ফুলদার জামা ব্যবহার করে। অনুচর বর্গ ইহাদের মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্ত্তন করে। ইহারা সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যাহাতে চেহারা সুশ্রী এবং সুন্দর দেখায়, তজ্জন্য অনেক প্রকার শিল্প নৈপুণ্যের সহায়তা গ্রহণ করে। ভারতীয়গণ সত্য ও সদ্‌গুণ উভয়েরই খুব আদর করে। এই নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে উন্নত জ্ঞানার্জ্জন না করিলে কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া কেহই সবিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা ভাজন হয় না। ভারতীয়গণ মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। ইহারা কন্যা পণ স্বরূপ কন্যা দাতাকে এক যোড়া বলীবর্দ্দ প্রদান করিয়া তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করে। স্ত্রী জীবন যাত্রার সমস্ত কার্য্যের সহায় হইবে বিশ্বাসে ইহাদের অনেকে বিবাহ করে. কেহ কেহ সুখলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ করে, কেহ কেহবা সন্তান দ্বারা গৃহ পূর্ণ করিবার মানসে বিবাহ করিয়া থাকে।

ভারতীয় রাজন্যগণের শরীর রক্ষার ভার স্ত্রীলোকদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহারা এই সকল স্ত্রীলোক তাহাদের পিতার নিকট

হইতে ক্রয় করিয়া আনয়ন করেন। প্রহরী ও অন্যান্য সৈনিকপুরুষ দ্বারের বহির্দ্দেশে অবস্থিত করে। যদি কোন স্ত্রীলোক রাজাকে মদমত্ত অবস্থায় নিহত করে, তবে সে পরবর্ত্তী রাজার মহিষী হয়। পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃসম্পত্তি লাভ করে। ভারতবর্ষের নরপতিবৃন্দ সাধারণতঃ দিবাভাগে নিদ্রা যান না। আর রাত্রিতে প্রাণ বিনাশের জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধার লাভোদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ খট্টাপরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়েন।

রাজ শরীররক্ষয়িত্রী নারী; রাজার আচার ব্যবহার.

নরপতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন এবং বিচার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ জন্য রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিচার কালে রাজা সমস্ত দিবস বিচারালয়ে অবস্থান করেন; এমন কি, সুগোল মসৃণ মুদ্গারযোগে শরীব মর্দ্দন প্রভৃতি দ্বারা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সময় উপস্থিত হইলেও রাজা বিচারকার্য্য হইতে অবসৃত হইতে পারেন না। কার্য্যেলিপ্ত থাকিবার সময়েই চারিজন অনুচর তাঁহার গাত্র মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করে। পূজার সময়েও রাজাকে একবার রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত মৃগয়ার সময়েও রাজা নিজ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। মৃগয়ার সময়. রাজা সুরাভক্ত দলবল সহ মত্তাবস্থায় যাত্রা করেন। চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে এবং এই চক্রের বহির্দ্দেশে বল্লমধারী সৈনিক পুরুষগণ শ্রেণী বদ্ধ হইয়া সজ্জিত থাকে। তাঁহার গম্য পথের দুই পার্শ্ব রজ্জুদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই রজ্জুর বেষ্টন মধ্যে স্ত্রী পুরুষ কেহ আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়। এই সমারোহের অগ্রে অগ্রে একদল লোক ঢাক ও ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে গমন করে। রাজা একটি উচ্চ স্থান হইতে রক্ষিত বনে বাণ নিক্ষেপ করেন। আর তাঁহার

রাজ বিচার, মৃগয়া

পার্শ্বেই দুই তিন জন অস্ত্র-সজ্জিতা কামিনী দণ্ডায়মান থাকে। খোলা ময়দানে মৃগয়াকালে রাজা হস্তীপৃষ্ঠ হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহবা রথে, কেহবা অশ্বে, কেহবা হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় হয় এবং ঠিক যুদ্ধ সজ্জার ন্যায় বেশভূষা ধারণ করে। দেখিলে বোধ হয়, তাহারা যুদ্ধার্থ চলিয়াছে।

ভারতবাসী ও কুসীদ
অপরাধীর দণ্ড।

ভারতবাসীরা কখন কুসীদ গ্রহণ করে না, বা কাহারও নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত নহে। তাহারা কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না। এই সকল কারণেই তাহাদের কোন প্রকার চুক্তি বা প্রতিভূ আবশ্যক হয় না। ভারতবাসীর আইনে হাওলাত বা আমানত আদায় করিবার কোন প্রকার বিধান নাই। কোন উত্তমর্ণ প্রতারিত হইলে সে ব্যক্তি শঠকে বিশ্বাস করিয়াছে বলিয়া নিজ অদৃষ্টকে দোষ দিয়াই সন্তোষ লাভ করে। যদি কেহ অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ করে, তবে রাজা তাহার মস্তক মুণ্ডনের বিধান করেন। এই শাস্তি সকল শাস্তি অপেক্ষা গুরুতর। ভারতীয়গণ মধ্যে যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অঙ্গের শেষভাগ কাটিয়া ফেলিবার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ পা খোঁড়া করিয়া দেয়, তাহা হইলে শাস্তি স্বরূপ তাহার একখানি পা কাটা যায়; উপরন্তু একখানি হাতও কাটিয়া লওয়া হয়। যদি কেহ কোন শিল্পীর হস্ত কি চক্ষু নষ্ট করে, তবে তাহার মৃত্যু দণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

অশ্ব ও হস্তী রাজার সম্পত্তি। কোন রাজা ও রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি গণই অশ্ব ও হস্তী রাখিতে পারেন, অন্যকাহারও রাখিবার নিয়ম নাই।

ভারতীয় রাজন্যগণ বিদেশীয়দের নিমিত্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখেন। বিদেশীয়দের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, তাহাই

পর্য্যবেক্ষণ করা এই সকল কর্ম্মচারীর প্রধান কর্ত্তব্য। যদি বিদেশীয়দের মধ্যে কেহ পীড়িত হয়, ইঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার্থ কবিরাজ নিযুক্ত করিয়া তাহার শুশ্রূষাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন, সে মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি আত্মীয় স্বজন মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে সমস্ত মোকদ্দমায় বিদেশীয়গণ কোনও রূপে সংসৃষ্ট থাকে, বিচারকগণ সে সমস্ত মোকদ্দমা অতি যত্ন সহকারে নিষ্পত্তি করেন, বিদেশীয়দের প্রতি কোনওরূপ যৎসামান্য অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হইলে অপরাধিগণ বিশেষরূপে দণ্ডিত হয়।

বিদেশীয়দের প্রতি রাজানুগ্রহ।

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে কাহারও প্রতি বাণিজ্য বিভাগের, কাহারও প্রতি নাগরিক বিভাগের, কাহারও প্রতি সৈনিক বিভাগের ভার ন্যস্ত আছে। কেহবা নদনদী পরিদর্শন করেন, মিশরদেশে যেরূপ ভূমিপরিমাপ হয়, সেইরূপ ভূমি মাপ করেন, এবং মূল কৃত্রিম নদী হইতে শাখা কৃত্রিম নদীতে জল নির্গত হইবার জন্য যে সকল ক্ষুদ্র নালা আছে, তাহা পরিদর্শন করিয়া সমস্ত কৃত্রিম নদীতে যাহাতে সমানরূপে জল যায়, তৎ বিধানে নিযুক্ত থাকেন। শিকারীদিগের তত্ত্বাবধান এবং তাহাদের দোষগুণ বিচার করিয়া দোষ গুণানুযায়ী তাহাদের শাস্তি পুরস্কার দিবার ভারও এই সকল কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। ইহারা কর আদায় করেন এবং কাঠুরিয়া, সূত্রধর, লৌহকর্ম্মকার এবং খণিজ-পদার্থ উত্তোলনকারীদিগের কার্য্য পরিদর্শন করেন। ইহারা পথ প্রস্তুত করেন এবং দশ দশ ষ্টেডিয়া অন্তর পথ প্রদর্শক এবং দূরত্ব জ্ঞাপক এক এক ক্ষুদ্র স্তম্ভ স্থাপন করেন।

রাজকার্য্য বিভাগ, রাজকর, শুল্ক।

যাহাদের প্রতি নাগরিক কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, তাহারা ছয় দলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দলে পাঁচজন করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ। প্রথম দলের

লোক সাধারণতঃ দেশীয় শিল্পের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। দ্বিতীয় দলের লোক প্রধানতঃ বিদেশীয়দের আদর অভ্যর্থনাদি কার্য্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং বিদেশীয়দের সেবা শুশ্রূষার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাহাদের যোগে তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দলের লোক সমস্ত অধিবাসীদের জন্ম মৃত্যুর তালিকা সংগ্রহ করেন। এই তালিকা যে কেবল কর ধার্য্যের জন্যই সংগৃহীত হয়, তাহা নহে; ছোট বড় যে কেহ মৃত্যু মুখে পতিত হউক, তাহা রাজার অবিদিত না থাকে, ইহাও এই তালিকা সংগ্রহের একটি কারণ। চতুর্থ দল ব্যবসায় বাণিজ্যের বিষয় পরিদর্শন করেন। এই দলের লোকের উপর ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্ত ভার অর্পিত রহিয়াছে; সাময়িক ফসল যাহাতে সাধারণের জ্ঞাতসারে বিক্রীত হয়, সে বিষয়েও ইহাদের দৃষ্টি রাখিতে হয়। দ্বিগুণ কর আদায় না করিয়া ইহারা কাহাকেও দুই প্রকার পণ্য বিক্রয় করিতে দেন না। পঞ্চম দল কলকারখানা নির্ম্মিত সমস্ত বস্তু পরিদর্শন এবং সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতসারে বিক্রয় করেন। নূতন জিনিস ও পুরাতন জিনিস পৃথক ভাবে বিক্রীত হয়। দুইরকম জিনিস এক সঙ্গে বিক্রয় করিলে বিক্রেতার অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। ষষ্ঠদল যত জিনিস বিক্রয় হয়, তাহার মূল্যের দশমভাগ রাজার অংশরূপে আদায় করেন। এই দশম অংশ সম্বন্ধে প্রতারণা করিলে তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। এই সমস্ত দল উপরি উক্ত কার্য্য সমূহ পৃথক ভাবে সম্পন্ন করেন। প্রত্যেক দলের উপর পৃথক পৃথক কার্য্যভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত যে সকল বিষয়ের উপর সাধারণের হিতাহিত নির্ভর করে, তাহা সকলেরই দেখিতে হয়, যথা সরকারী দালানাদির উপযুক্ত সংস্কার, জিনিসপত্রের মূল্যনিরূপণ এবং বাজার, বন্দর ও মন্দিরের তত্ত্বাবধান।

সৈন্য বিভাগের কার্য্য পরিচালন জন্য এক শ্রেণীর শাসনকর্ত্তা

আছেন, ইহারাও ছয় দলে বিভক্ত। পাঁচ পাঁচ জন কর্ম্মচারী লইয়া এক একটী দল। এক দলের কর্ম্মচারীগণ নৌ-সেনার তত্ত্বাবধান করেন; দ্বিতীয় দলের কর্ম্মচারীগণ অস্ত্র শস্ত্র, সৈন্য ও যুদ্ধ নিয়োজিত পশ্বাদির খাদ্য এবং যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বহনোপযোগী গোযানাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই দলের লোক যুদ্ধের সময় ঢাক ও ঘণ্টা বাজাইবার জন্য পরিচারক ও রণতুরঙ্গের জন্য সহিস এবং যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য শিল্পী সংগ্রহ করিয়া দেন। ঘণ্টার ধ্বনি হইলেই ইহারা অশ্বের খাদ্য আহরণকারী-দিগকে ঘাস ইত্যাদি আনয়ন জন্য প্রেরণ করেন এবং দণ্ড পুরস্কারাদি নানারূপ বিধান দ্বারা ঐ সকল কার্য্য অতি সত্বর ও নিরাপদ ভাবে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দল পদাতিকগণের তত্ত্ব লইবার জন্য নিযুক্ত হন। চতুর্থ দল যুদ্ধ তুরঙ্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন। পঞ্চম দল যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্যে এবং ষষ্ঠ দল রণকুঞ্জরের তত্ত্বাবধানে সময় অতিবাহিত করেন।

সৈন্য বিভাগ।

রণকুঞ্জর এবং রণতুরঙ্গের জন্য হস্তী এবং অশ্বশালা ও যুদ্ধাস্ত্রের জন্য অস্ত্রাগার আছে। যুদ্ধান্তে যুদ্ধের হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্র স্ব স্ব গৃহে ফিরাইয়া দিতে হয়। হস্তী পরিচালনার্থ বল্গার ব্যবহার নাই। বলীবর্দ্দ সকল যুদ্ধরথ টানিয়া থাকে, রথের সঙ্গে অশ্ব বান্ধা থাকে মাত্র। রথ চালকের পার্শ্বে দুই জন অস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষ উপবিষ্ট থাকে। রণকুঞ্জরের পৃষ্ঠোপরি চারি জন লোক উপবেশন করে, তাহাদের তিন জন বাণ নিক্ষেপকারী, একজন হস্তীর চালক।

ভারতীয়গণের সভ্যতার প্রসঙ্গে স্বতঃই তাহাদের বর্ণভেদ প্রথার কথা আসিয়া পড়ে। মেগাস্থিনিসও এতৎ সম্পর্কীয় বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয়গণ যে তৎকালে চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কার্য্য-

ক্ষেত্রে তাহাদিগকে যে সকল কার্য্যে নিয়োজিত দেখিয়াছিলেন, তদনুসারে সাতটী জাতি বা বর্ণ গণনা করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা জন্মগত বর্ণবিভাগ, মেগাস্থিনিস তাহা পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহার বর্ণনাতেও চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত কোন বর্ণের পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই; তিনি একাধিক বার গণনা করিয়া সাতটি জাতি বা বর্ণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা এক্ষণ মেগাস্থিনিস লিখিত বিবরণের সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ণভেদ, সপ্তজাতি।

ভারতীয় সভ্যসমাজভুক্ত জনসঙ্ঘ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে। কেহ ভূমি কর্ষণ করে, কেহ যুদ্ধ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে, সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও ধনী সম্প্রদায় রাজকার্য্য, বিচার কার্য্য এবং মন্ত্রণাদানে নিরত আছে। অন্য এক শ্রেণী দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলনে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। এই শাস্ত্রের আলোচনা প্রায় ধর্ম্মচর্য্যার তুল্য দাঁড়াইয়াছে। উল্লিখিত দর্শন শাস্ত্রবেত্তৃগণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন করেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে একটি অর্দ্ধসভ্য জাতি দেখা যায়; ইহারা বিপুল শ্রমসাধ্য হস্তীধৃত করণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এই সকল লোকই হস্তীগুলিকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকে।

ভারতীয়গণ সাতটি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম জাতি এক দল দার্শনিক পণ্ডিত দ্বারা গঠিত। ইঁহারা সংখ্যায় যদিও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অল্প, তথাপি সম্মানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, সাধারণ কর্ত্তব্যের দায় হইতে মুক্ত থাকায় ইঁহারা কাহারও প্রভু বা কাহারও দাস নহেন। লোকে জীবিতের জন্য যাগ যজ্ঞ ও মৃতের জন্য শ্রাদ্ধ শান্তি সম্পাদন উদ্দেশ্যে ইঁহাদিগকেই নিযুক্ত করিয়া থাকে। কারণ তাহারা ইঁহাদিগকে

দার্শনিক।

দেবানুগৃহীত এবং পরলোকের অবস্থাভিজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করে। এই সমস্ত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইঁহারা বহুমূল্য দানসামগ্রী ও নানা অধিকার প্রাপ্ত হন। অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সুবাতাস, রোগ ও অন্যান্য যে বিষয় লোকে অগ্রে জ্ঞাত হইলে সাবধান হইতে পারে, তাঁহারা সে সমস্ত বর্ষারম্ভে সমবেত লোক সমীপে পরিব্যক্ত করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের সবিশেষ উপকার সাধন করেন। এইরূপে সকলেই বৎসরের ফলাফল অবগত হইয়া ভাবী অনটন মোচন জন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হয় এবং অভাবের সময় যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার উপায় করিতে যথাসাধ্য যত্ন করে। যে পণ্ডিত গণনায় ভুল করেন, তাহার লোক নিন্দা ভিন্ন অন্য কোনও শাস্তি হয় না বটে; কিন্তু তিনি জীবনে আর কখনও গণনা কার্য্য করেন না। রাজা প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে এক মহাসভা আহ্বান করিয়া দর্শন শাস্ত্রবেত্তৃগণকে নিমন্ত্রণ করেন। এই সভায় দার্শনিকগণ যদি কোন সাধারণ হিতকর বিষয়ে কিম্বা গো পশ্বাদির উন্নতি বিষয়ে কিম্বা অন্য কোন হিতজনক বিষয়ে কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন বা পরিদর্শন করিয়া থাকেন, তবে তাহা ঘোষণা করেন। যদি কাহারও উদ্ভাবিত বা পরিদৃষ্ট তত্ত্ব ক্রমান্বয়ে তিনবার নিষ্ফল হয়, তবে শাস্তি স্বরূপ আর কখন তাঁহার উদ্ভাবিত বা পরিদৃষ্ট তত্ত্ব গৃহীত হয় না। পক্ষান্তরে যাহার উদ্ভাবিত বা পরিদৃষ্ট তত্ত্ব হিতজনক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাঁহাকে রাজকর হইতে মুক্তি দান করা হইয়া থাকে।

কৃষকশ্রেণী।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় জাতি কৃষকশ্রেণী। ইহারা সংখ্যায় অন্যান্য জাতি হইতে অনেক বেশী। ইহাদিগকে সাধারণ কর্ত্তব্য বা যুদ্ধাদি কিছুই করিতে হয় না। এইজন্য ইহারা কেবল কৃষিকার্য্যেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে। ইহাদের স্বভাব অত্যন্ত মৃদু ও সরল। ইহারা যখন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত

থাকে, তখন শত্রুগণও ইহাদের প্রতি কোন অত্যাচার করে না। এই জাতি জনসাধারণের বিশেষ উপকারী, এই হেতু কেহই ইহাদের কোন ক্ষতি করে না। এইরূপে উৎসাদন হইতে রক্ষিত হওয়ায় ভূমিতে এতই শস্য উৎপন্ন হয় যে, মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই কৃষি দ্বারা সংগৃহীত হইয়া থাকে। কৃষকেরা তাহাদের স্ত্রী পুত্র লইয়া পল্লীতে বাস করে, কখনও নগরে আইসে না। তাহারা রাজাকে ভূমিকর প্রদান করে,কারণ সমস্ত ভূমিতেই রাজার অধিকার; রাজা ভিন্ন আর কাহারও ভূসম্পত্তিতে অধিকার নাই। রাজা ইহাদের নিকট ভূমিকর ব্যতীত উৎপন্ন শস্যেরওএক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াথাকেন।

পশু পালক

ভারতবর্ষের তৃতীয় জাতি পশু পালক। ইহারা নগর কিম্বা পল্লীতে বাস করে; তাম্বু পাতিয়া জঙ্গলে বাস করে এবং শীকার করিয়া ও ফাঁদ পাতিয়া অরণ্যচর পশু ও অহিতকর পক্ষীর বংশ নির্ম্মূল করে। ইহাই ইহাদের একমাত্র ব্যবসায় বলিয়া ইহারা অতীব আগ্রহ সহকারে উহাতে মনোনিবেশ করে এবং যে সকল বন্য পশু পক্ষী কর্ত্তৃক শস্য বিনষ্ট হয়, তাহার বিনাশ সাধন করিয়া শস্য রক্ষা করে।

শিল্প ব্যবসায়ী

ভারতবর্ষের চতুর্থ জাতি শিল্প ব্যবসায়ী। শিল্প ব্যবসায়ীদের মধ্যে কতক লোক যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে। আর অবশিষ্ট লোক কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করে। ইহারা রাজ সরকারে কোন কর দেয় না, উপরন্তু রাজকোষ হইতে ভরণ পোষণ পাইয়া থাকে। অস্ত্র নির্ম্মাতা ও জাহাজ নির্ম্মাণকারিগণ রাজার কাজ করিয়া আহার ও বেতন প্রাপ্ত হয়। সেনাপতি সেনা দিগকে অস্ত্র প্রদান করেন। নৌসেনাপতি যুদ্ধ জাহাজ ভাড়া দিয়া মাল আমদানী রপ্তানী এবং লোক যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেন।

ভারতবর্ষের পঞ্চম জাতি যুদ্ধ ব্যবসায়ী। ইহারা সুব্যবস্থিত ও সুসজ্জিত এবং সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানীয়। দেশে যখন শান্তি বিরাজ করে, তখন ইহারা আলস্য এবং বিলাসিতায় দিন কর্ত্তন করে। সৈন্য সামন্ত, যুদ্ধতুরঙ্গ এবং রণকুঞ্জর ইত্যাদি সমস্ত সৈনিক বল রাজব্যয়ে রক্ষিত হয়। যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা রাজব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া আবশ্যক মত যুদ্ধে গমন জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। তাহারা কেবল নিজের শরীরটি সঙ্গে লইয়া যায়, আর সব রাজার।

যুদ্ধ ব্যবসায়ী

ভারতবর্ষের ষষ্ঠ জাতি পরিদর্শক শ্রেণী দ্বারা গঠিত। ভারতে যেখানে যাহা কিছু হয়, সমস্ত পরিদর্শন করিয়া রাজ দরবারে অথবা রাজার অনুপস্থিতিতে দেশ রক্ষকের নিকট তাহার বিবরণী প্রদান করাই ইহাদের নিয়মিত কার্য্য।

পরিদর্শক

ভারতবর্ষের সপ্তম জাতি মন্ত্রি মণ্ডলী দ্বারা গঠিত। ইঁহারা সাধারণ কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। সংখ্যায় ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা কম; কিন্তু সচ্চরিত্রতা ও জ্ঞানবত্তার জন্য ইঁহারা সকলের নিকট সবিশেষ আদরণীয়, কারণ এই জাতির মধ্য হইতেই রাজমন্ত্রী, ধনাধ্যক্ষ এবং বিচারক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সেনা ও প্রধান দেশরক্ষকও এই জাতি হইতেই নির্ব্বাচিত হন।

মন্ত্রি মণ্ডলী

এইরূপে ভারতীয় অধিবাসিগণ উপরোক্ত কয়েক ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কেহই অন্য জাতির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না, এবং জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোন শিল্প ব্যবসায় শিক্ষা করিবার অধিকারও ইহাদের নাই;—দৃষ্টান্ত যথা, একজন সৈনিক পুরুষ কখনও কৃষক অথবা একজন শিল্পী কখনও দার্শনিক হইতে পারেন না। সদ্গুণশালী বলিয়া দার্শনিকদের সম্বন্ধে এই নিয়ম বলবৎ নহে।

ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ নামক দুই দলে বিভক্ত। এই দুই দলের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সমধিক সম্মানার্হ, কারণ তাঁহাদের মতের স্থিরতা সকল সময়েই সমান। গর্ভের সঞ্চার হইবার সময় হইতেই ইঁহাদের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান আরম্ভ হয়। শিক্ষিত লোক মন্ত্র দ্বারা সন্তানের মঙ্গল উপলক্ষে মাতাকে সন্তানের হিতকর নানা উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। যে সন্তানের মাতা ঐ সকল উপদেশ খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে, তাহার সন্তান সৌভাগ্যশালী হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই তাহাকে কোন না কোন সুশিক্ষিত অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। সন্তান যতই বড় হইতে থাকে, তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য ততই অধিক সুশিক্ষিত অভিভাবক নিযুক্ত হয়েন। দার্শনিকগণ নগরের সম্মুখে এক নিভৃত কুঞ্জে গমন করেন। তাঁহারা অতি সামান্য ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। নলের নির্ম্মিত শয্যায় এবং হরিণ চর্ম্মে তাঁহারা শয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা মাংসাদি আহার করেন না এবং স্ত্রী-সঙ্গাদি সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্ভোগ হইতে বিরত থাকেন। তাঁহারা কেবল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া সময় যাপন করেন এবং শিশু-দিগকে শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। অধ্যয়ন সময়ে শিক্ষার্থীকে অতি মনোনিবেশ সহকারে গুরুর বাক্য শ্রবণ করিতে হয়। সে সময়ে কথা বলা কি অন্যরূপ শব্দকরা, কি থুথু ফেলা, সমস্ত নিষিদ্ধ। যদি কেহ এই নিষেধ অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে আত্মসংযমে অক্ষম বলিয়া তাহাকে সমাজ হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হয়। সপ্তত্রিংশৎ বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া শিষ্যগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃত হইয়া জীবনের শেষ ভাগ সুখ ও শান্তিতে যাপন করেন। এই সময় তাঁহারা সুন্দর ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন এবং অঙ্গুলি ও কর্ণে স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ

থাকেন। এই সময় তাঁহারা মাংস আহার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু যে সমস্ত পশু গৃহ কার্য্যের সহায়তা করে, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করেন না। তাঁহারা উষ্ণ ও অধিক মসল্লা দ্বারা পক্ক আহারীয় আহার করেন না। তাঁহারা বহু সন্তান লাভের আশায় একাধিক রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সমাজে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত না থাকায় সাংসারিক কাজ কর্ম্ম ও অভাবমোচন জন্য তাঁহাদের বহু সন্তান আবশ্যক হয়।

স্ত্রীশিক্ষা।

ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ আপনাদের পত্নীদিগকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেন না। কারণ হঠাৎ তাঁহারা কুস্বভাবান্বিতা হইলে শাস্ত্রের যে সব গূঢ় তত্ত্ব ইতর জাতির নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, তৎসমুদয় তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে। আর এক কারণ এই যে, স্ত্রীগণ যদি দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন; কারণ দর্শনশাস্ত্রে যাহারা প্রগাঢ়রূপে ব্যুৎপন্ন হন, তাঁহারা ইহজীবনের সুখ, এমন কি, জীবন মরণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং সেরূপ জ্ঞান লইয়া তাঁহারা কদাচ অন্যের অধীনে বাস করেন না।

ইহকাল ও পরকাল।

মৃত্যু ভারতীয় দার্শনিকগণের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। তাঁহারা ইহজন্মকে শিশুর গর্ভস্থিত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন, এবং মৃত্যুই দর্শনশাস্ত্রের প্রিয় শিষ্যবর্গের পক্ষে সুখ ও প্রকৃত জন্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা অনেক প্রকার সংযম শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই সংসারে ভাল বা মন্দ কোন বিষয় আছে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা জীবনকে নিশার স্বপ্ন স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন; নতুবা কিরূপে একই বিষয়ে কেহবা সুখ, কেহবা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে? এবং

কিরূপেই বা একই বিষয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুভূতি হইয়া থাকে।

ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে এই দার্শনিকগণের মত অত্যন্ত অপরিপক্ক।

দার্শনিক অভিমত।

যাহা হউক, অনেক বিষয়ে তাঁহাদের মত গ্রীকদের মতের অনুরূপ। গ্রীকদের ন্যায় তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর আদি আছে এবং অন্ত আছে; পৃথিবীর আকার গোল; যে শক্তির দ্বারা ইহা নির্ম্মিত ও শাসিত, সে শক্তি ইহার সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছেন। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, এই বিশ্ব সৃষ্টিকালে অনেক মূল উপাদান কার্য্য করিয়াছে। এই সকল উপাদান মধ্যে ভূমণ্ডল অপদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। চারিটিমূল উপাদানের সঙ্গে আর একটি উপাদান আছে। এই পঞ্চম উপাদান দ্বারা ব্যোম ও তারকা মণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। ভূমণ্ডল ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। উৎপত্তির বিবরণ এবং আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত ঠিক গ্রীকদের অনুরূপ। আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং পরজন্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্লেটোর ন্যায় তাঁহারা রূপকদ্বারা স্বমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই সকল দার্শনিক মাংস

ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের আচার ব্যবহার

ও সর্ব্বপ্রকার অগ্নিপক্ক বস্তুর আহারে বিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ফলাহারে পরিতৃপ্ত থাকেন। এই ফলও তাঁহারা বৃক্ষ হইতে আহরণ করেন না। যে সকল ফল পক্কাবস্থায় বৃক্ষতলে পতিত হয়, তাহাই তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। তুঙ্গভদ্রা (কৃষ্ণার শাখা) নদীর জলই তাঁহাদের পানীয়। তাঁহারা আজীবন উলঙ্গাবস্থায় যাপন করেন, কারণ তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের নির্দ্দেশানুসারে শরীর আত্মার আচ্ছাদন মাত্র। তাঁহাদের ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু এই আলোক

আমাদের পরিদৃশ্যমান আলোক অথবা সূর্য্য বা অগ্নির জ্যোতিঃ নহে। তাঁহাদের ঈশ্বর শব্দময়; এই ঈশ্বর স্ফূর্ত্তবাক্য নহেন, তত্ত্বজ্ঞানলব্ধ বাণীমাত্র। তাঁহার কৃপায় সূক্ষ্মদর্শিগণ তত্ত্বজ্ঞানের অন্তর্নিহিত রহস্য সমূহ দর্শন করেন। যাহা হউক, এই যে আলোক শব্দ নামে কথিত এবং পরমেশ্বররূপে পূজিত, তাহা কেবল ব্রাহ্মণ গণের নিকটই প্রকাশিত হয়, কারণ তাঁহারা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন, অহঙ্কার আত্মার আবরণ। আমাদের আলোচ্য সম্প্রদায়ীগণ মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভক্তি-পূর্ণ স্বরে পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ করেন এবং স্তবদ্বারা তাঁহার মহিমা ঘোষণা করেন। তাঁহারা বিবাহ করেন না, তাঁহাদের আবাসস্থল বালক বালিকার আনন্দ ধ্বনিতে মুখরিত হয় না। যাহারা এই সম্প্রদায় ভুক্ত হন, তাঁহারা আর কখনও স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না।

শ্রমণগণ মধ্যে যাহারা বিশেষ সম্মানার্হ তাহাদের নাম হিলোবিত্ত। তাঁহারা নিভৃত বন মধ্যে বাস করেন। সেখানে তাঁহারা বন্য ফলমূল আহার করিয়া এবং বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা করপুটে জল তুলিয়া পান করেন। গ্রীসদেশে এনক্রেটাই আখ্যাত ধার্ম্মিকগণ যেমন বিবাহাদি করেন না, ইঁহারাও সেইরূপ বিবাহাদি করেন না। তাঁহারা রাজার সহিত দূতদ্বারা কথোপকথন করেন। রাজা তাঁহাদের দ্বারা দেবতার পূজা ও উপাসনাদি করাইয়া থাকেন।

শ্রমণগণের শ্রেণীবিভাগ

আর এক দল দার্শনিকের উল্লেখ করিতেছি। ইহারা হিলোবিত্ত-দের অপেক্ষা কম সম্মানার্হ। ইহারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী এবং মানব প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত। ইহারা কেবল দালভাত ভোজন করেন। এই আহারীয় যাচ্ঞা মাত্রই সংগৃহীত হয়; যাহাদের বাটীতে তাঁহারা আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহাদের নিকটও পাওয়া যায়।

তাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যাগুণে বিবাহ বৃক্ষে ফলোৎপাদন করিতে সমর্থ হন এবং পুত্র কি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিবে,তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। তাঁহারা আহার বিষয়ে রীতিমত সতর্কতাদ্বারা রোগ নিষ্কর্ষ করিয়া থাকেন, ঔষধ প্রায়শঃ ব্যবহার করেন না। প্রলেপ ও মর্দ্দনের ঔষধই তাঁহারা অধিক ব্যবহার করেন। অন্যান্য ঔষধ তাঁহারা অহিতকর বলিয়া মনে করেন। এই জাতীয় এবং অন্যান্য জাতীয় দার্শনিকগণ অবিরত পরিশ্রম ও দুঃখ সহ্য করিয়া কষ্ট সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া থাকেন। এমন কি,তাঁহারা সমস্ত দিন নিশ্চল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত দৈবজ্ঞ, ইন্দ্রজাল বিদ্যাবিদ এবং মৃতের সৎকারাদি ক্রিয়াভিজ্ঞ আরও অনেকব্যক্তি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভিক্ষাকরিয়া জীবন যাপন করেন।

যে সকল ব্যক্তি সুশিক্ষা ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও ভক্তি ও পবিত্রতার অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করিলে কুসংস্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কোন কোন দার্শনিকের সঙ্গে মিলিত হইয়া আর্য্য-নারীগণও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় সম্ভোগ হইতে বিরত থাকেন।

ভারতবর্ষের দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে বুদ্ধের অনুবর্ত্তক আছেন।

বুদ্ধদেব। বুদ্ধের অলৌকিক গুণ ও পবিত্রতার জন্য তাঁহারা বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিয়া সম্মান করেন।

দার্শনিকগণ আত্মহত্যা। আত্মহত্যা দর্শনশাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া মনে করেন না। যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহারা অত্যন্ত নির্ব্বোধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

মেগাস্থিনিস পাটলীপুত্র। তৎকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর পাটলীপুত্রের যে বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

ভারতবর্ষে এত অধিক নগর আছে যে, যথাযথরূপে তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করাও সুকঠিন। যে সকল নগর নদীতীরে বা সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত, তৎসমুদয় ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া কাষ্ঠ দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকে; কারণ সে সকল স্থানের সবেগ নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বৃষ্টিপাত এবং তটবিধৌতকারিণী সমতল ক্ষেত্র প্লাবিনী প্রখর স্রোতস্বতী এত অধিক অনিষ্ট সাধন করে যে, তৎসমুদয় স্থানের নগর অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল নগর অত্যচ্চ স্থানে বা দেশ রক্ষণোপযোগী সুস্থানে অবস্থিত, তৎসমুদয় ইষ্টক ও কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। প্রাসাই দেশে গঙ্গার সহিত সোন নদীর মিলন স্থলে অবস্থিত পাটলীপুত্র (পালি বোথরা) নামক নগর ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার আকৃতি একটি চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়। এই নগর চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উক্ত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রাচীর শর নিক্ষেপের উপযোগী বহুছিদ্র সম্বলিত। নগরের সম্মুখেই নগর রক্ষা এবং নগরের গলিত পদার্থ নির্গত হইবার জন্য একটি পরিখা বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষের যে প্রদেশে এই নগর অবস্থিত, সে প্রদেশের অধিবাসিগণ ভারতবর্ষের মধ্যে অতি সুপ্রসিদ্ধ এবং প্রাসাই নামে পরিচিত। (১)

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষের নদনদীর যে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠক বৃন্দকে উপহার প্রদান করিয়া এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক বৃহৎ এবং নাব্য নদনদী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নদনদী উত্তরাংশের সীমা সংলগ্ন পর্ব্বতমালা হইতে

(১) প্রাসাই শব্দ সম্ভবতঃ প্রাচ্য শব্দের অপভ্রংশ। পঞ্জাবীরা সুদূর পূর্ব্ববর্ত্তী মগধ রাজ্যের অধিবাসীদিগকে প্রাচ্যনামে অভিহিত করিতেন বলিয়া বোধ হয়।

সমুদ্গত হইয়া সমতল ভূমি প্লাবিত করিয়া ধাবিত হইতেছে। এবং ইহাদের অধিকাংশই নানা শাখা প্রশাখা সহ অবশেষে গঙ্গাগর্ভে মিলিত হইতেছে। গঙ্গার উদ্ভব ক্ষেত্রের পরিসর ৩০ ষ্টেডিয়া; ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত; এবং "গঙ্গা রাঢ়ী" নামক জনপদের পূর্ব্ব সীমায় যে মহাসাগর তাহাতেই সমস্ত জলরাশি পতিত হইয়া থাকে। গঙ্গারাঢ়ীর অধিবাসীবর্গ বহুসংখ্যক মহাকায় রণকুঞ্জর পালন করিয়া থাকে। তজ্জন্য কোন বিদেশীয় রাজা কখনও তাহাদের দেশ পদানত করিতে পারেন নাই; কারণ সকলেই মহাবলশালী বহুসংখ্যক রণ কুঞ্জরকে যথেষ্ট ভয় করিয়া থাকে। গঙ্গার উপকূলে সমুদ্রের নিকট যে সকল জাতি বাস করে তাহারা কলিঙ্গ নামে আখ্যাত হয়। গঙ্গার তীরে মালাও আখ্যাত একটি জাতিও বাস করে। মালাই পর্ব্বত এই মালাই অধ্যুষিত দেশে অবস্থিত।

নদনদী

সিন্ধু নামধেয় গঙ্গার ন্যায় আর একটি সুবৃহৎ নদ গঙ্গার ন্যায় উত্তর প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, এবং পথিমধ্যে ভারতের এক সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে। বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইবার সময়ে ইহার সহিত আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাব্যনদী মিলিত হইয়াছে; তন্মধ্যে হুপানিস (বিপাসা), হুডাস পিস (বিতস্তা) এবং একে সনিস (চন্দ্রভাগা) উল্লেখযোগ্য। এই সকল নদনদী ব্যতীত আরও ছোট বড় বহু প্রবাহ প্রবাহিণী ভারতবর্ষকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিবিধ প্রকার শস্য ও উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন করে। দেশীয় দার্শনিক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এদেশের নদী ও জলের আধিক্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সিথীয়ান, ব্যাকটেরিয়ান ও এরিয়ান গণের যে সমস্ত বাসভূমি আছে, তাহা ভারতবর্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ, সুতরাং, সেই

সমস্ত দেশের জল প্রাকৃতিক নিয়মের অনুশাসনে চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া নিম্নের সমতল ক্ষেত্রে একত্র হয় এবং তাহাতেই ভারতীয় ক্ষেত্র জলার্দ্র থাকে ও ভারতে বহু প্রবাহ প্রবাহিণীর উৎপত্তি হয।

প্লিনি।

সুবিখ্যাত লেখক প্লিনি ২৩ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত কোমো নগরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কোমো নগরে তাঁহার ভূসম্পত্তি ছিল। নৃপতিকুলকলঙ্ক নিরোর মৃত্যুর পর তিনি রোম নগরে গমন করেন। অতঃপর তাঁহার উপর অজস্রধারে রাজানুগ্রহ বর্ষিত হয়; তিনি সম্রাট ভেসপাসিযান এবং রাজকুমার টিটাসের শ্রদ্ধা ও প্রীতির আস্পদ ছিলেন। প্লিনি তাঁহাদের অধীনে বিশিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং অবসর কাল সাহিত্য চর্চ্চায় যাপন করেন। ৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত প্রাকৃতিক ইতিহাস পরিসমাপ্ত হয়; তিনি এই গ্রন্থ স্বীয় পৃষ্ঠপোষক টিটাসের নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। ইহার পর তিনি মাত্র দুই বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অতি শোচনায় হইয়াছিল। আগ্নেয় গিরি ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পি এবং হারকুলিয়ান নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতকালে প্লিনি শ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। প্লিনির গ্রন্থে তাদৃশ মৌলিকতা পরিদৃষ্ট না হইলেও তাহা নানা বিষয়ক বহু তথ্যের সমাবেশ জন্য মূল্যবান। বস্তুতঃ তদীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে উপলব্ধি হয় যে, তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা অতিশয় বলবতী ছিল। প্লিনির ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের এক সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্লিনি

রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা এই জীবনী পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, আহার অথবা ভ্রমণ কালে তাঁহার নিকট গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্ম পাঠক নিযুক্ত থাকিত। প্লিনি সর্ব্ববিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন এবং অতি অসার গ্রন্থ হইলেও সার সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তিনি অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্লিনির ইতিহাস সুবৃহৎ পুস্তক, সপ্তত্রিংশতি খণ্ডে বিভক্ত। ষষ্ঠ খণ্ডে ভারতবর্ষীয় ভূগোলবৃত্তান্ত সম্পর্কীয় প্রস্তাব সন্নিবদ্ধ আছে।

প্লিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন;—"ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতি ও নগর দেখিতে পাওয়া যায়। আলেকজণ্ডারের বিজয় বাহু পাশ্চাত্য জাতি সমূহের সমক্ষে এই দেশের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিল, তার পর তদীয় পরবর্ত্তী সিলিকাস এবং এণ্টিওকাস ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য দেশ সমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কে সহায়তা করেন। নৌসেনাপতি পাট্রোক্লেস এবং রাজদূত মেগাস্থিনিস ও ডিওনিসাস প্রভৃতি লেখকগণ ভারতীয় জাতি ও রাজন্যবৃন্দের তথ্য প্রকাশ করেন। আলেকজণ্ডারের সহচরগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের গ্রীক-বিজিত অংশেই পঞ্চ সহস্র সুদৃশ্য নগর বিদ্যমান ছিল, এই সকল নগরের কোনটিরই পরিমাণ এক ক্রোশের ন্যূন ছিল না; ঐ ভূমিতে নয়টি বিভিন্ন জাতির বাস ছিল। ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর তৃতীয় অংশ বলিয়া পরিগণিত ছিল; ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অগণ্য ছিল। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অগণ্য হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল; পৃথিবীর নানা দেশবাসী মধ্যে এক মাত্র ভারতবাসীই স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে অনভ্যস্ত ছিল। সেনসা নামক আমাদের এক জন প্রতিবেশী ভারত-

গ্রীক সংস্রব, গ্রীক বিবরণী।

বর্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে ভারতবর্ষের নদীর সংখ্যা ৬০ এবং জাতির সংখ্যা ১১৮ ছিল।"

ভারতভূমি চিরকাল ধনশালিনী; অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৈদেশিকগণ ধনলোভে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন; ভারতবাসীও পরদেশ হইতে ধন আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে বিদেশে গমন করিতেন। প্লিনির গ্রন্থ হইতে আমরা এতৎসম্বন্ধীয় অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি। একদা কতিপয় ভারতবাসী বাণিজ্য পোতারোহণে ইউরোপ গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হওয়াতে তাঁহাদের পোত জর্মণীর উপকূলে নীত হয়। সুয়েভর অধিপতি তাঁহাদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় দেখিয়া ধৃত করেন এবং উপঢৌকন রূপে গলের শাসনপতি মেটিলাসসেনারের নিকট পাঠান। বণিকগণ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক এক সপ্তাহকাল পথ অতিবাহিত করিয়া ইয়ারকাস নদীতে উপনীত হইতেন; এই নদীর সহিত সর্ব্বজন পরিচিত অক্সাস নদীর সংযোগ ছিল। তাঁহারা ইয়ারকাস ও অক্সাস উত্তীর্ণ হইয়া কাস্পিয়ানের কূলে উপনীত হইতেন। এই স্থান হইতে স্থলপথে ভারতীয় পণ্যরাজি ইউরোপের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িত। প্লিনির গ্রন্থে ঈদৃশ একাধিক বাণিজ্য পথের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ ভারতীয় বাণিজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যগত বাণিজ্যের নিমিত্ত অনেক পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত থাকিলে ইউরোপীয় বণিকগণ চল্লিশ দিনে মুজিরিস নামক বন্দরে উপনীত হইতেন। ভারতবর্ষের বন্দর সমূহের মধ্যে মুজিরিসই ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ছিল। ভারতসমুদ্র জলদস্যু পূর্ণ ছিল। এই কারণ বাণিজ্য পোত সকলে উৎকৃষ্ট তীরন্দাজগণ অবস্থিতি

ভারত বাণিজ্য।

করিত। মুজিরিস বন্দর বাণিজ্যের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধাজনক ছিল। মুজিরিসের অদূরবর্ত্তী নাইট্রিয়াস (বর্ত্তমান ম্যাঙ্গালোর) নামক স্থানে দস্যুরা বাস করিত; মুজিরিসে রপ্তানীর জন্য বিক্রেয় মালের আমদানী অল্প হইত; মুজিরিসের কূল হইতে বাণিজ্য পোত সকল দূরে থাকিত বলিয়া পণ্য সকল পোত হইতে তীরে এবং তীর হইতে পোতে উত্তোলন করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার প্রয়োজন ছিল। (ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত) নিসিনভন বা বেকার বন্দর বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল স্থান ছিল। কোওনারা (বর্ত্তমান টেলিচারি) নামক স্থান হইতে বেকার বন্দরে বহুল পরিমাণে গোলমরিচ আগত হইত। ইউরোপীয় বণিকগণ ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ফলতঃ তাঁহারা এক বৎসরেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিতেন।

তাদৃশ প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল। প্লিনির গ্রন্থেও তাহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত বর্ণনা মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আমরা তৎ-সংকলনে বিরত রহিলাম।

প্লিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের কি বৃক্ষ-লতা, কি পশুপক্ষী, সমস্তই বলিষ্ঠ ও বৃহদাকার। আমরা এই প্রসঙ্গে তাহার গ্রন্থ হইতে কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি; "ভারত-

পশুপক্ষী।

বর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার পশু পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতেছি যে, ভারতীয় কুকুর অন্য দেশের কুকুর অপেক্ষা বৃহৎ এবং ভারতীয় বৃক্ষ সকল এত উচ্চ যে, তাহার উপর দিয়া তীর নিক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষের ভূমি উর্ব্বরা, আব হাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং জল পর্য্যাপ্ত বলিয়া (বৃক্ষাদি

এতদূর বৃহদাকার হইয়া থাকে যে) একটি মাত্র ডুম্বর বৃক্ষের তলে একদল অশ্বারোহী সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয় অবিশ্বাস্য হইতে পারে, কিন্তু এইরূপই কথিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নল খাগড়া দ্বারা ডিঙ্গি নৌকা প্রস্তুত করা হয়; এই নল খাগড়া অতি দীর্ঘ বলিয়া উহার একটি গাঁইট পরিমিত লম্বা ডিঙ্গি নৌকা প্রস্তুত করিলেই তাহাতে তিন জন পর্য্যন্ত লোক আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিতে পারে।"

ভারতবাসী

অতঃপর প্লিনি ভারতবাসী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহা সর্ব্ববাদী স্বীকার্য্য যে, অনেক ভারতবাসী দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাত; তাহারা নিষ্ঠীবন ফেলে না এবং মস্তিষ্ক, চক্ষু ও কর্ণের বেদনায় পীড়িত হয় না, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশে কখন কখন ব্যথা অনুভব করে; ভারতবাসী সূর্য্যের নাতিশীতোষ্ণ তাপে শারীরিক বলিষ্ঠতা লাভ করে। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিকগণ সূর্য্যাভিমুখে নিশ্চল রূপে চক্ষু স্থাপন করিয়া একভাবে অথবা উত্তপ্ত বালুকার উপরে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন। * * * তোরণ, কোরামণ্ডি নামক একটী ভারতীয় জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, ইহারা জঙ্গলে বাস করে; ইহাদের বাক্‌শক্তি অতি সামান্য স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারা পেচকের মত এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করে, ইহাদের এই চীৎকার শুনিতে ভয়াবহ। কোরোমণ্ডিদের শরীর লোমাবৃত, তাহাদের চক্ষু নীলাভ ধূসরবর্ণ এবং দন্ত কুকুরের ন্যায়। ইউডো সাক্স লিখিয়া গিয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী পুরুষের পায়ের পাতা একহাত লম্বা, কিন্তু রমণীগণের পায়ের পাতা এত ক্ষুদ্র যে তাহা চড়াই পাখীর পা নামে কথিত হয়। (১)

(১) The reference may be to the Chinese. J. W. Mc Rindle.

* * * ভারতবাসী একশত ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তাহারা জরাগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পায় না। মৃত্যুকালে তাহাদের শরীরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যেন অর্দ্ধ বয়সে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ভারতবর্ষে কলিঙ্গ নামে এক জাতির বাস। পঞ্চম বৎসরে কলিঙ্গ রমণী অন্তর্ব্বত্নী হয়; অষ্টম বর্ষেই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। (১) অন্যান্য স্থানে এরূপ লোক দেখা যায়, যাহাদের লেজ জন্মাবধি লম্বা চুলে আবৃত। এই সকল লোক অতি দ্রুতগামী। অন্য এক জাতীয় লোকের কর্ণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। ভারতবর্ষের সীমান্তবর্ত্তিনী নদীর অপরতীরে ওরাইটি নামক জাতির বাস। ওরাইটীরা কেবল মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহারা নখ দ্বারা মৎস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রুটী প্রস্তুত করে।

আলেকজণ্ডারের রণতরীর অধ্যক্ষগণ আরাবিস নদীর তীরবাসী গিড্রোসিয়ান জাতির সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারা মৎস্যের হন্বস্থি (jawbones) দ্বারা গৃহের ছাদ নির্ম্মাণ করে। এই সকল মৎস্যের অনেকগুলি চল্লিশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।"

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৃক্ষ ও শস্য

ভারতভূমি প্রকৃতির রম্য কানন; এই স্থানে নানা জাতীয় বিচিত্র দৃশ্য বৃক্ষলতা বিদ্যমান। প্লিনির গ্রন্থেও ইহার সাক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তদীয় গ্রন্থে বহু জাতীয় বৃক্ষ লতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তৎসমুদয়ের ভারতীয় নাম প্রদত্ত না হওয়াতে পাঠকগণের কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিবার উপায় নাই। যাহা হউক, প্লিনি বর্ণিত কোন কোন বৃক্ষ লতার বিষয় আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। আবলুস বৃক্ষ কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিত; ভার্জ্জিল লিখিয়া গিয়াছেন

* (১) The Calinga lived along the more northern shore of Bengal. Their Capital was Purthalis. G. W. Mc Rindle.

যে, আবলুস কাঠ কেবল ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইত। প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে ভারতবাসী এক শত আবলুস কাঠের তক্তা এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমিত স্বর্ণ ও গজদন্ত রাজকর স্বরূপ পারস্যাধিপতির নিকট প্রেরণ করিত। ভারতবর্ষে ডুম্বর বৃক্ষ অতি ঘনভাবে জন্মিত বলিয়া তাহার তলে লতামণ্ডপের মত হইত; তৎস্থানে মেষপালকেরা গ্রীষ্মকাল যাপন করিত। ভারতবর্ষে এক প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিত; এই বৃক্ষের ফল অতি সুমিষ্ট ছিল। ভারতীয় কৃষককুল মধ্যে অনেকে উহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত। ঐ ফল বৃক্ষের ত্বকে জন্মিত এবং অত্যন্ত সুস্বাদ রসের জন্য খ্যাত ছিল। এক একটী ফল এত বড় হইত যে, একটী ফলেই চারিজন ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারিত। প্রাগুক্ত বৃক্ষের ন্যায় আর এক প্রকার বৃক্ষ জন্মিত। এই বৃক্ষের ফল উক্ত ফল অপেক্ষা সুমিষ্ট ছিল কিন্তু তদাহারে পেটের পীড়া উপস্থিত হইত; এই কারণ আলেকজণ্ডার তদীয় সৈন্যবৃন্দকে উহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আর এক জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত। ভারতবাসী এই বৃক্ষ হইতে এক প্রকার ক্ষৌম বস্ত্র প্রস্তুত করিত। ভারতবর্ষের জলপাই গাছ ফলহীন ছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গোলমরিচের গাছ জন্মিত। এক জাতীয় বৃক্ষের ত্বক জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে আমাশয় রোগ নিবৃত্তি পাইত। আরব দেশেও চিনি প্রস্তুত হইত; কিন্তু ভারতীয় চিনিই লোকের অধিকতর প্রিয় ছিল। ভারতজাত চিনি এক প্রকার নলের রস হইতে প্রস্তুত হইত। এই রস নির্য্যাসের মত সাদা ছিল। ভারত সীমান্তে এরাইন নামক দেশে এক প্রকার বিষাক্ত গুল্ম জন্মিত; ইহার মূল মূলার মত এবং পাতা Laurel গুল্মের (পূর্ব্বে এই গুল্মের পত্রে সম্মান সূচক মুকুট প্রস্তুত হইত) মত ছিল। এই গুল্মের গন্ধ অশ্বের চিত্ত আকর্ষণ করিত। এই

কারণ আলেক্জণ্ডার ভারত সীমান্তে পৌঁছিলে তাঁহার অধিকাংশ অশ্বারোহী সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গেড্রেসিয়া প্রদেশেও আলেকজণ্ডারের অশ্বারোহী সৈন্যের ঐরূপ দশা হয়। আলেকজণ্ডারের রণ-তরীর যে সকল অধ্যক্ষ ভারত সমুদ্রে নৌ পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা এক প্রকার জলজ বৃক্ষ দর্শন করেন। এই বৃক্ষ জলে থাকিলে উহার পাতা সবুজ দেখাইত, কিন্তু জল হইতে উত্তোলন করিলেই উহা লবণে পরিণত হইত। ভারতীয়গণ তালের রস দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিত। বস্তুতঃ সমগ্র প্রাচ্য দেশেই তালের রস দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিবার প্রথা বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে বাদাম, তিল এবং চাউল হইতে তৈল প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষ কর্ষণজাত এবং স্বজাত,—এই দুই প্রকার যব জন্মিত। ভারতবাসী যবচূর্ণ দ্বারা উৎকৃষ্ট রুটী এবং মণ্ড প্রস্তুত করিত। কিন্তু অন্নই তাহাদের প্রিয় খাদ্য বস্তু ছিল। ইউরোপের আতা ফলের ন্যায় এক প্রকার ফল ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যাইত। এই ফল হইতে ভারতবাসী এক প্রকার সূত্র প্রস্তুত করিত।

ভারত ভূমি বহুবিধ রত্ন প্রসবিনী; ভারতজাত বহু রত্ন পৃথিবীর অন্য স্থানে অপ্রাপ্য। প্লিনি স্বীয় ভারত বৃত্তান্তের একাংশ রত্নাদির বিস্তৃত বর্ণনায় পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ বিস্তৃত বর্ণনা পাঠক-গণের প্রীতিপ্রদ হইবে না বিবেচনা করিয়া আমরা তৎসঙ্কলনে বিরত রহিলাম। ভারতবর্ষীয় মহাত্মা এবং গণৎকারগণের বিশ্বাস ছিল যে, প্রবালের মাদুলী ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিপদ দূর হয়। এই কারণ প্রবালের নামে ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত।

———

ভারত-বাণিজ্য।

!! খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন অজ্ঞাতনামা গ্রীক বণিক আফ্রিকার তীরভূমির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মিশর দেশের দক্ষিণ সীমান্তে বেরেণ-ইকি নামক বন্দরে এই অজ্ঞাতনামা লেখক বাস করিতেন; সেই স্থান হইতে তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে পূর্ব্ব-আফ্রিকার বন্দর সমূহে আগমন করেন। তারপর আফ্রিকার উপকূল পরিত্যাগ করিয়া আরব দেশে উপনীত হন। তৎকালে ভারতবর্ষাভিমুখে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া এই পর্য্যটনপ্রিয় বণিক ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে আগমন করেন এবং তৎস্থানের প্রধান প্রধান বন্দর পরিদর্শন করিয়া স্বীয় বাণিজ্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

অজ্ঞাত নামা লেখক

এই বিবরণী হইতে আমরা তৎকালের ভারত বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি; এই কারণ পাঠকপাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণ কল্পে উহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

আমাদের লেখক আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী একাধিক বাণিজ্যপথের উল্লেখ করিয়াছেন। বাণিজ্য-পোত দক্ষিণ উপকূলের বেরেণ-ইকি বন্দর পরিত্যাগপূর্ব্বক গার্ডফুই অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্ব উপকূল ঘুরিয়া লোহিত সাগরে উপনীত হইত। এই লোহিত সাগরের তীরে মিওসোরমোস ভারতবর্ষের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইত। লোহিত সাগর হইতে দুই পথে বণিকগণ যাতায়াত করিত। বৈদেশিক বণিকগণ ভারতীয় পণ্য দ্রব্যে অর্ণবপোত পূর্ণ করিয়া

বাণিজ্য পথ

আফ্রিকার বন্দর সমূহে উপনীত হইতেন। অনেক সময় বণিকগণ অন্যদেশগামী অর্ণবপোতের কিয়দংশও আফ্রিকার জন্য পণ্য দ্রব্যে পূর্ণ করিতেন ; এই সকল অর্ণবপোত আফ্রিকার উপকূল দিয়া গমন করিবার সময় তাঁহারা ঐ সমস্ত দ্রব্য নামাইয়া রাখিতেন।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ হইতে খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয় আমদানী রপ্তানীর সুদীর্ঘ তালিকা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের চাউল, ঘি, চিনি, কার্পাস, মসলিন, রেশম প্রভৃতি আফ্রিকার বন্দর সমূহে আনীত হইত।

আমদানী রপ্তানীর তালিকা।

ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ঘৃত বারুগজা (বর্ত্তমান ব্রোচ) নামক বাণিজ্য কেন্দ্রে নীত হইত। তার পর বারুগজা অধিবাসীরা উহা মিশর প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করিত। জার্ম্মাণ পণ্ডিত লাসন সাহেব-কৃত পাঠানুসারে এই পণ্য ঘৃত নহে, শস্য বিশেষ। বৈদেশিকগণ ভারতজাত চিনির নাম ইক্ষুজাত মধু দিয়াছেন। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের নলখাগড়া মধুমক্ষিকা ব্যতিরেকেই মধু প্রদান করে। পাশ্চাত্য লেখককুলে এরিষ্টটলের অন্যতম প্রধান শিষ্য থিওপ্রাস্‌টস সর্ব্বপ্রথম ভারতজাত চিনির উল্লেখ করেন। বণিকগণ বারুগজার বন্দর হইতে মিশরের অন্তর্গত বরবরিয়ার বাণিজ্য-শালায় ভারতজাত চিনির আমদানী করিতেন। অতি প্রাচীনকালে ভারতজাত সূক্ষ্ম বস্ত্র কেবল আফ্রিকায় নহে, ইউরোপেও নীত হইয়াছিল। কার্পাস শব্দ ইতালীর ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল ; লাটিন ভাষায় কার্বাসাস শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় ; কার্বাসাস শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম বস্ত্র। ইউরোপের সভ্যজনপদ সমূহে এবং মিশরে ভারতজাত সূক্ষ্মবস্ত্রের যথেষ্ট আদর ছিল। এই সকল সূক্ষ্মবস্ত্রমধ্যে বঙ্গীয় মসলিনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বৈদেশিক লেখকগণ বঙ্গীয় মস্‌লিনের বর্ণনায় স্ব স্ব গ্রন্থের কিয়দংশ

পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানে এই মস্‌লিন প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষ হইতে মিশরের অন্তর্গত সমুদ্র-বন্দর অদোলিতে লাক্ষা প্রেরিত হইত। পণ্ডিত সালামসিয়াস নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে লাক্ষার রপ্তানী হইত না, কিন্তু লাক্ষা-রঞ্জিত অঙ্গরাখা প্রেরিত হইত।

বাণিজ্য-বন্দর

খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে আরবের উপকূলে মৌজা নামক এক সমুদ্র-বন্দর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎকালে মৌজার বাণিজ্যখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মৌজা বন্দর আরব পোতাধ্যক্ষ এবং সাধারণ নাবিকগণ দ্বারা পূর্ণ এবং বাণিজ্য-কোলাহলে সর্ব্বক্ষণ মুখরিত থাকিত। আরবীয় বণিকগণ স্বদেশীয় বাণিজ্যপোত সজ্জিত করিয়া একদিকে আফ্রিকা ও অন্য দিকে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-ব্যবহারে লিপ্ত হইত। মৌজার প্রায় সমস্ত অধিবাসী বণিক অথবা নাবিক ছিল; বস্তুতঃ এই বন্দর বাণিজ্যের পক্ষে সাতিশয় অনুকূল স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। উহার চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার মূল্যবান পণ্যদ্রব্য পাওয়া যাইত; তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্তর্গত বারুগজা অর্থাৎ ব্রোচ নামক বাণিজ্যশালা হইতে বহু মালের আমদানী হইত। বস্তুতঃ সেই প্রাচীন কালে মৌজা আরব দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল; বর্ত্তমান সময়ে এই স্থান একটী সামান্য পল্লীগ্রামে পরিণত হইয়াছে এবং মোখা নামক বাণিজ্য-ক্ষেত্র হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত রহিয়াছে। মৌজার বন্দরে বিদেশ হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্যের আমদানী হইত, আমরা এখানে তৎসমুদয়ের তালিকা প্রদান করিতেছি। বেগুনি রঙ্গের মোটা ও পাতলা কাপড়; আরবীয়-গণের রুচিসঙ্গত কাটাপোষাক (ইহার অধিকাংশ পোষাকই সাধারণ রকম ও সাদাসিদে ছিল; সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য এবং স্বর্ণের কারুকার্য্য-খচিত পোষাকও পরিদৃষ্ট হইত); জাফরান, সুগন্ধি, মসলা,

মসলিন, লম্বা অঙ্গরাখা, লেপ, তোষক ইত্যাদি, নানারঙ্গের রেশম, সুরা, শস্য।

সেই প্রাচীন কালে পারস্যের উপকূলে এপোলোগাস নামক একটি বন্দর অবস্থিত ছিল। এপোলোগাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্য উপসাগরের পথে ছয়দিন অতিবাহিত করিলে বণিকগণ পারস্যের অন্তর্গত ওমানা নামক আর একটী বন্দরে উপনীত হইতেন। এই উভয় বন্দরের সহিত বারুগজা অর্থাৎ ব্রোচের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। ভারতীয়গণ সুবৃহৎ অর্ণবপোত সকল তাম্র, চন্দনকাষ্ঠ, হরিণশৃঙ্গ, এবং শিশু ও আবলুস কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিয়া পারস্যের বন্দরদ্বয়ে আনয়ন করিতেন। তারপর তাঁহারা মুক্তা, বেগুনিরঙ্গ, সুরা, খর্জ্জুর (ইহার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী ছিল), স্বর্ণ এবং দাস দাসী ক্রয় পূর্ব্বক তৎসমুদয় সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

বারুগজা ব্যতীত ভারতবর্ষের আর একটী বাণিজ্য-প্রধান নগরের নাম আমরা জানিতে পারি। এই নগরের নাম বরবরিকন। বরবরিকন সিন্ধুসাগর-সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টের জন্মের ১২০ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুনদের তীর হইতে নর্ম্মদা নদীর তীর পর্য্যন্ত সমগ্র সৌরাষ্ট্র ভূমি শক জাতীয়দিগের আবাসস্থল রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। বিদেশাগত বাণিজ্যপোত সমূহ বরবরিকন নামক বন্দরে পৌঁছিলে আরোহী বণিকগণ নঙ্গর ফেলিতেন এবং শক জাতির নিমিত্ত নানাবিধ বস্ত্র, সুরা, কার্পাস, রঙ্গিন প্রস্তর, প্রবাল, কাচপাত্র, রৌপ্যপাত্র, মসলা প্রভৃতি প্রেরণ করিতেন। অতঃপর বৈদেশিক বণিকগণ কাম্বে উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বারুগজানামক বন্দরে উপনীত হইতেন। তৎকালে বারুগজার পার্শ্ববর্ত্তী সৌরাষ্ট্র প্রদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ধান্য প্রভৃতি বিবিধ শস্য, তৈল, মাখন, মসলিন, মোটা কাপড় পাওয়া যাইত। বিদেশে রপ্তানীর জন্য এই সকল জিনিস বারুগজায় নীত হইত। বারুগজা

(১) সমুদ্রকূল হইতে ত্রিশ মাইল দূরে নর্ম্মদা-তটে অবস্থিত ছিল। এই ত্রিশ মাইলে নৌপরিচালন সাতিশয় দুরূহ ছিল; নদী খরস্রোতা এবং পাহাড়ময় চড়াপূর্ণ ছিল। তজ্জন্য তদ্দেশীয় ধীবরগণ বিদেশাগত অর্ণবপোত সকলের পথ প্রদর্শন নিমিত্ত রাজাদেশে নিযুক্ত থাকিত।

এই আলোচ্য গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমরা পরিজ্ঞাত হইতে পারি যে তৎকালে চিরখ্যাত উজ্জয়িনী নগরীর অস্তিত্ব ছিল, এবং তথা হইতে সর্ব্বপ্রকার পণ্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও বিদেশে রপ্তানীর নিমিত্ত বারুগজায় নীত হইত।

আমাদের গ্রন্থকর্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, বারুগজা হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে দক্ষিণদেশ বিস্তৃত ছিল। এই দক্ষিণদেশের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-নগরের নাম পৈথানা এবং তাগরা ছিল। বারুগজা হইতে পদব্রজে যাত্রা করিলে পৈথানায় পৌঁছিতে বিংশতি দিন অতিবাহিত হইত। পৈথানার পূর্ব্বদিকে দশ দিনের পথ ব্যবধানে তাগরা অবস্থিত ছিল। টলেমি পৈথানার স্থানে বৈথানা লিখিয়াছেন। প্রাচীন পৈথানা বা বৈথানার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী তাগরা দক্ষিণদেশের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। কতিপয় পুরাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মতে বর্ত্তমান দৌলতাবাদই প্রাচীন তাগরা; কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদীসম্মত নহে।

দক্ষিণদেশ

(১) ঋষি ভৃগুর নাম হইতে বারুগজ নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার উইলসন Indian castes নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ভৃগু শব্দের বিশেষণ ভার্গব। ভৃগুর শিষ্যগণ এই স্থানে বাস করিতেন, এজন্য উহার নাম হইয়াছিল ভার্গবক্ষেত্র। তারপর ভার্গবক্ষেত্র শব্দ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভৃগুকচ্ছ এবং বারুগজা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই দুই বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে অতি দুর্গমপথে অশ্বযানে বিপুল পণ্যসম্ভার বারুগজায় নীত হইত।

আমাদের অজ্ঞাতনামা লেখকবর্ণিত দক্ষিণ দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজ্যের নাম ছিল আরিয়াকি বা আর্য্যকি। এই নাম হইতে অনুমান করা যায় যে, অনার্য্যজাতি-অধ্যুষিত দক্ষিণ দেশে ঐ স্থানেই সর্ব্ব প্রথমে আর্য্যজাতির উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরিয়াকি বা আর্য্যকির বর্ত্তমান নাম মহারাষ্ট্র বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কল্যাণনগর এই দেশের প্রধান নগর ছিল।

দক্ষিণদেশের বিবরণের শেষে আমরা কেপরোবোট্রস নামধেয় একজন অধিপতির রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে কেপরোবোট্রসের সংস্কৃত নাম কেরলপুত্র। টলেমি-প্রণীত বিবরণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, তাহার রাজধানীর নাম করৌরা ছিল। বর্ত্তমান কোয়েম্বাটুর জেলার অন্তর্গত করুর নামক স্থান প্রাচীন করৌরা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। করুর শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ নগর।

পূর্ব্বোক্ত করৌরার পার্শ্বেই নেলকুণ্ডানামক এক নগর বিদ্যমান ছিল। এই নগরের অধিপতির নাম বা উপাধি পাণ্ডিয়ন ছিল। টলেমির গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে পাণ্ডই। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে পাণ্ডই ও পাণ্ডু শব্দ অভিন্ন। এজন্য আমরা অনুমান করিতেছি যে, কালক্রমে পাণ্ডুর বংশ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে রাজত্ব করিত এবং তাহারই এক শাখা বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর দেশের পার্শ্বে সমুদ্রের উপকূলে আসিয়া পড়িয়াছিল। নেলকুণ্ডা নদীর তীরে অবস্থিত এবং সমুদ্র হইতে ১২০ ষ্টেডিয়া দূরবর্ত্তী ছিল। ভিনসেণ্ট নামক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, বারুগজা ও নেলকুণ্ডা তৎকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। সম্ভবতঃ আমাদের অজ্ঞাতনামা লেখক ভারতবর্ষের উপকূল দিয়া নেলকুণ্ডার পর আর

অগ্রসর হয়েন নাই, এই স্থানেই পর্য্যটনের শেষ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আর কতিপয় স্থানের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এতন্মধ্যে অনুগঙ্গ প্রদেশের নাম উল্লেখযোগ্য। অনুগঙ্গ প্রদেশের যে বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। আমরা এইমাত্র জানিতে পারি যে, গঙ্গা নদীর তীরে এক সুবৃহৎ নগর অবস্থিত ছিল এবং সেই নগর হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অত্যুৎকৃষ্ট মসলিন প্রভৃতি রপ্তানি হইত।

অজ্ঞাতনামা লেখকের বিবরণের অসম্পূর্ণতা

রাজভবনে বিলাসিতা

আমাদের অজ্ঞাতনামা লেখক ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিবরণেই স্বগ্রন্থ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার কীদৃশ ছিল, তাহার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। তথাপি বাণিজ্যপ্রসঙ্গেই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে ভারতীয়গণের আচার ব্যবহারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এক স্থানের উল্লেখ করিতেছি। তৎকালে অনেক রাজপুরে বিলাসিতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। বৈদেশিক বণিকগণ সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য বহুমূল্য রৌপ্যপাত্র, বাদ্যযন্ত্র, সুন্দরী রমণী, মহার্ঘ অলঙ্কার এবং উৎকৃষ্ট মদিরা উপহার স্বরূপ প্রদান করিতেন।

ষ্ট্রাবো।

ষ্ট্রাবোর ভূগোল বৃত্তান্ত

ষ্ট্রাবোর ভূগোল বৃত্তান্ত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পুরাকালে পৃথিবীর ভূগোল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ষ্ট্রাবোর গ্রন্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সমূহের

সভ্যতার বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থের একাংশে ভারতবর্ষের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ষ্ট্রাবো অতি প্রাচীন লেখক। সম্রাট অগষ্টসের রাজত্বকালে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ষ্ট্রাবো বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই পর্য্যটন লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার গ্রন্থের বহুল অংশ লিখিত হইয়াছিল। ষ্ট্রাবো বহু দেশ পর্য্যটন করিলেও, কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল গ্রীক লেখক ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহাদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই ষ্ট্রাবো স্বগ্রন্থের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অধ্যায় সংকলিত করিয়াছিলেন।

ষ্ট্রাবোর ভূগোলের ভূমিকা।

ষ্ট্রাবো ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অধ্যায় সংকলিত করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—"আমি পাঠকবৃন্দকে এই অধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া তীক্ষ্ণ সমালোচনায় ক্ষান্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কারণ, ভারতবর্ষ বহুদূরে অবস্থিত। আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই ঐদেশে গমন করিয়াছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সুবিস্তৃত দেশের একাংশ মাত্র স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহাদের সংকলিত ভারত বিবরণীর অধিকাংশ জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক লিখিত ভারত বিবরণীর পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহচর লেখকগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহাতেও পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য রহিয়াছে। সহচর লেখকগণের প্রত্যক্ষ দর্শনমূলক বৃত্তান্তেও অনৈক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে; এরূপ অবস্থায় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল বৃত্তান্ত সংগৃহীত

হইয়াছে, তাহা যে ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ, ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদয় গ্রীক বণিক নীলনদ, আরব্য উপসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ গঙ্গা নদীর তীর দেশ পর্য্যন্ত গমন করেন। এই সকল বণিক অশিক্ষিত। তাঁহারা আপনাদের পরিদৃষ্ট স্থানের বৃত্তান্ত সংগ্রহে অক্ষম। যদি আমরা আলেকজণ্ডারের সহচর লেখকগণের বৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লিখিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করি, তবে ভারত-তত্ত্ব আরও অস্পষ্ট হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ, আলেকজণ্ডার আত্মম্ভরিতা নিবন্ধন এই সকল বৃত্তান্ত যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। লিয়রকক লিখিয়া গিয়াছেন যে, আলেকজণ্ডার সসৈন্যে গিড্রোসিয়া দেশ অতিক্রম করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বে সম্রাজ্ঞী সিমিরেমিস ও সম্রাট সাইরাস ঐপথে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই শত্রু হস্তে পরাজিত হন। সিমিরেমিস বিংশতি-সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করেন। সাইরাসের সঙ্গে তদপেক্ষাও ন্যূন সংখ্যক (সাত) সহচর ছিল। আলেকজণ্ডার বিবেচনা করেন যে, যদি তিনি বিজয় গৌরবে গিড্রোসিয়া অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তি-সৌরভে চারিদিক পূর্ণ হইবে। সম্রাজ্ঞী সিমিরেমিস ও সম্রাট সাইরাস কর্ত্তৃক ভারত অভিযানের বৃত্তান্ত আলেকজণ্ডার সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যশোমাল্যে ভূষিত হইবার সংকল্প করেন। কিন্তু তাঁহাদের ভারত অভিযানের বৃত্তান্ত কি বিশ্বাসযোগ্য? মেগাস্থিনিসও এই সকল বৃত্তান্তে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই; তিনি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের

তাদৃশ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তৎসংক্রান্ত যাহা কিছু অলৌকিক নহে, তাহাই আমাদিগকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।”

ষ্ট্রাবো এইরূপ উপক্রমণিকার পর ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ঐ বিবরণের কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি। সমগ্র ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ; এই দেশের অনেক নদ নদী গঙ্গা ও সিন্ধুতে পতিত হইয়াছে; বহুসংখ্যক নদ নদী সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে; ভারতীয় নদ নদীর মধ্যে গঙ্গা ও সিন্ধুই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষে বর্ষাকালে শণ, যোয়ার, তিল ও ধান, এবং শীতকালে গম, যব ও দাইল ইত্যাদি বপন করা হইয়া থাকে। ইথিওপিয়া ও মিশরে যে সকল পশু পক্ষী পালিত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষেও তৎসমুদয় দেখা যায়। ভারতবর্ষে কেবল পর্ব্বত ও উপত্যকা ভূমিতেই বৃষ্টি ও তুষার পাত হয়; সমতল ভূমি কেবল নদীর জলে সিঞ্চিত হইয়া থাকে। শীতকালে পর্ব্বতমালা তুষারাবৃত হয়; বসন্তের প্রারম্ভে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়; ক্রমশঃ এই বৃষ্টি বাড়িতে থাকে; তারপর দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হয়; এই সময় ইটিসিয়ান বায়ু প্রবাহিত হয়; নদ নদী সকল তুষার ও বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া তীরবর্ত্তী সমতলভূমি প্লাবিত করে। ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক নগর মৃত্তিকার বাঁধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল নগর বর্ষাকালে দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বর্ষান্তে মৃত্তিকা অর্দ্ধ শুষ্ক হইতে না হইতেই শস্য বপন করা হইয়া থাকে। কৃষিবিদ্যানভিজ্ঞ শ্রমজীবীরা ক্ষেত্র কর্ষণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; তথাপি বৃক্ষ সকল সতেজ হইয়া উঠে, এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য পাওয়া যায়। ধান্য বৃক্ষ আইলের উপর রোপিত হয়; এবং বর্ষার জলেও বিনষ্ট হয় না।

প্রাকৃতিক বিবরণ।

ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক নগর ও প্রদেশের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা তাঁহার গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি যে, খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশীলা নগরী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাহার শাসনের জন্য সুব্যবস্থা সকল প্রবর্ত্তিত ছিল। তক্ষশীলার চতুঃপার্শ্বস্থ দেশ জলপূর্ণ ও উর্ব্বর ছিল। তক্ষশীলা-পতির শাসিত দেশের এক প্রান্তে ঝিলাম প্রবাহিত ছিল। এই ঝিলামের অপর পারে চিরখ্যাত পুরু রাজার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পুরু রাজার রাজ্যে ন্যূনাধিক তিন শত নগর বিদ্যমান ছিল; সমগ্র দেশ শস্য-শ্যামল ও সুবিস্তীর্ণ ছিল। এই রাজ্যের পার্শ্বেই কাথাইয়া নামে আর একটি রাজ্যের পশ্চিমে রাভি প্রবাহিতা হইত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান অমৃতসর জেলাই পুরাকালে কাথাইয়া নামে পরিচিত ছিল। এই দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ সাতিশয় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিল। তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালী ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিত। কাথাইয়া রাজ্যে একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল; কোনও শিশু সন্তান দুই মাসে পদার্পণ করিলে রাজকর্ম্মচারিগণ আসিয়া তাহাকে পরিদর্শন করিতেন। পরিদর্শনের বিষয়ীভূত সন্তানের শারীরিক সৌন্দর্য্য যথেষ্ট কিনা, এবং তাহাকে জীবিত রাখা সঙ্গত কিনা, তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাকে পরিদর্শন করিবার জন্য উপনীত হইতেন। তাঁহারা পরিদর্শনান্তে শিশু সন্তানটিকে জীবিত রাখিতে হইবে, কি মারিয়া ফেলিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আদেশ দিতেন। কাথাইয়ার অধিবাসীরা নানাপ্রকার তরল রং দ্বারা দাড়ি গোঁফ রঞ্জিত করিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও এই প্রথা পরিদৃষ্ট হইত। কাথাইয়ার অধিবাসীরা মিতব্যয়ী ছিল; কিন্তু তাহাদের অলঙ্কারপ্রিয়তা অত্যধিক ছিল। কাথাইয়া রাজ্যের আর একটি

ভারতবর্ষের নগর ও প্রদেশ সকলের বিবরণ।

প্রথার বিষয় লিপিবদ্ধ হইতেছে। বিবাহকালে বর কন্যা ও কন্যা বর মনোনয়ন করিত। পতি মৃত হইলে স্ত্রী স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করিত। কখনও কখনও ভারতমহিলা পরপুরুষে আসক্তা হইয়া স্বামীকে হত্যা করিত; তাহাদিগকে এই পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সহমরণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল; বিষ প্রয়োগে হত্যার নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই সতীদাহ হইত।

সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্ত্তী দেশে নয়টি বিভিন্ন জাতির বাস, এবং পাঁচ হাজার নগরের অবস্থান ছিল। এই সকল নগরের কোনটির পরিমাণই এক ক্রোশের ন্যূন ছিল না। এইস্থানে মালই নামে এক বৃহৎ জাতির বাস ছিল। মালই জাতি হইতেই বর্ত্তমান মুলতান নগর মুলতান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মালই জাতি সাতিশয় পরাক্রমশালী ছিল। মালই জাতির একটি ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ কালে মহাবীর আলেকজণ্ডার আহত হন। এই আঘাতে তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। মালই জাতিকে পরাজিত করিবার জন্য আলেকজণ্ডারকে ঘোর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ঐ প্রদেশে সাবোস নামে আর একটি জাতির বাস ছিল। সাবোস জাতির রাজ্যের রাজধানীর নাম সিন্ধু-মান ছিল। ম্যাকক্রিণ্ডিল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সিন্ধুমানের বর্ত্তমান নাম সেওয়ান। সাবোস জাতির বাসভূমির পার্শ্বে মৌসিকনোস নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মৌসিকনোস রাজ্য পরবর্ত্তী কালে উত্তর সিন্ধুরাজ্য নামে পরিচিত হয়। আলোর এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থে মৌসিকনোস রাজ্যের বহু প্রশংসাবাদ বিদ্যমান। তাঁহারা আরও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয় জাতি মাত্রেই মৌসিক-নোসবাসি সুলভ গুণরাজির অধিকারী ছিলেন। যাহা হউক, ঐ দেশের অধিবাসীরা অতিশয় দীর্ঘজীবী ছিল; তাহারা সাধারণতঃ

১৩০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত। মৌসিকনোস রাজ্য ধন ধান্যে পূর্ণ থাকিলেও মিতব্যয়িতা তাহাদের চরিত্রের লক্ষণ ছিল। তাহাদের স্বাস্থ্য অনবদ্য ছিল। মৌসিকনোসবাসীদের মধ্যে কতকগুলি অনন্য সাধারণ রীতিনীতিও পরিদৃষ্ট হইত। আমরা এই সকল রীতিনীতির উল্লেখ করিতেছি। উৎসব-উপলক্ষে মৌসিকনোসবাসীরা কেবল মৃগয়ালব্ধ মাংস ভোজন করিত। তাহাদের দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের আকর বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিতে বিরত থাকিত। তাহারা মনোযোগ পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত; তদ্ব্যতীত অন্য কোনও শাস্ত্রের অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগ দিত না। কারণ, কোনও বিদ্যায় (যেমন যুদ্ধবিদ্যা) সবিশেষ পারদর্শিতা লাভের জন্য যত্ন করা তাহাদের মধ্যে অন্যায় আচরণ বলিয়া পরিগণিত ছিল। নারীর মর্য্যাদা রক্ষা এবং নরহত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য আবশ্যক না হইলে তাহারা কখনও আইনের শরণাপন্ন হইত না।

ষ্ট্রাবো পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশস্থিত রাজ্য ও জাতি সমূহের বর্ণনার পরই মগধ রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে পঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশ ও মগধ রাজ্যের মধ্যে বহু সংখ্যক রাজ্য বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রীক-লেখকগণের ভারত-বিবরণীতে ঐ সমুদয় রাজ্যের উল্লেখ নাই। আলেক-জণ্ডার শতদ্রুর তীর হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য তদীয় সহচর লেখকগণের অভিজ্ঞতা সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে হিরোডোটাস ও টীসিয়াস প্রধান। মেজর রিলেন সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সিন্ধুনদের পূর্ব্ববর্ত্তী মরুভূমির অতিরিক্ত স্থান হিরোডোটাসের অজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল। ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে টিসিয়াসের অভিজ্ঞতাও এইরূপ সঙ্কীর্ণ। আলেকজণ্ডারের

মগধ রাজ্যের বিবরণ।

পরবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে মেগাস্থিনিস প্রধান। তিনি রাজদূতরূপে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে অবস্থিতি করিতেন। এই কারণ তাঁহার অভিজ্ঞতা মগধ রাজ্যে আবদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ তৎকালে মগধ রাজ্যই বিপুল বৈভবে ও প্রবল প্রতাপে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল; এইজন্য মেগাস্থিনিস ও তাঁহার অনুবর্ত্তী লেখকগণ সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শ স্থল মগধ রাজ্যের সভ্যতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াই মনে করিয়া ছিলেন যে, ঐ অসম্পূর্ণ বিবরণী হইতেই ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নিকট ভারতীয় সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে। ষ্ট্রাবো স্বয়ং কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক-গণের গ্রন্থ অবলম্বনে স্বীয় বিবরণী সংকলন করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার গ্রন্থেও পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও মগধ রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী রাজ্য ও জাতি সমূহের বৃত্তান্ত অলিখিত রহিয়াছে। তিনিও পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের পরেই মগধ রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবোর বর্ণনা হইতে প্রাচীনকালের মগধ রাজ্যের ঐশ্বর্য্যাদির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এখানে সে বর্ণনার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি।

গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পালিবোথরা (পাটলীপুত্র) অবস্থিত ছিল। (১) এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টেডিয়া (১ ষ্টেডিয়া ৬০৬¾ ফিট) এবং প্রস্থে ১৫ ষ্টেডিয়া ছিল। পাটলীপুত্রের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাচীর পরিদৃষ্ট হইত। শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ঐ প্রাচীর গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র ছিল। যে প্রদেশে এই নগর অবস্থিত ছিল,

(১) বর্ত্তমান পাটনার অদূরে প্রাচীন পাটলীপুত্র অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান পাটনার অদূরেই শোণ গঙ্গার সহিত মিলিত ছিল; তারপর ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ মাইল সরিয়া গিয়াছে। The ruins of the old city of Pataliputra now lie deep entombed below the foundation of the modern city (Patna). This fact was brought to light in 1876 when the workmen employed in digging a tank between the market place of Patna and its Ry station

তাহার অধিবাসীরা ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে, এবং প্রাসাই নামে পরিচিত হয়।

পালিবোথরা বা পাটলিপুত্র নগরের বর্ণনার পর ষ্ট্রাবো নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রীকগণ মগধ ও অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই দূরতা ও অজ্ঞতা নিবন্ধন অলৌকিক অথবা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। ষ্ট্রাবো এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া অলৌকিকতা ও অতিরঞ্জনের কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তারপর তিনি স্বাভাবিক ও অলৌকিক,—উভয়বিধ বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা তন্মধ্য হইতে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিলাম, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

যে রমণী তাহার প্রণয় পাত্রের নিকট হইতে হস্তী উপহার প্রাপ্ত হইত, তাহার সমাদরের সীমা থাকিত না; গ্রীক লেখক নিয়ারকস্ এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্য একজন গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নরপতি ব্যতীত অপর কাহারও রাজবিধিক্রমে হস্তী ও অশ্ব পালন করিবার অধিকার ছিল না। বর্ষাকালে সর্পাদির অত্যন্ত উপদ্রব হইত; এজন্য ভারতবাসীরা সমুচ্চ খট্টা নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি শয়ন করিত। অসংখ্য সর্প জলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইত; এইরূপে সর্পকুলের ধ্বংস না হইলে সমগ্র দেশ জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ভারতবাসীরা পত্রাদি লিখিবার জন্য

ভারতবাসীর আচার ব্যবহার।

discovered at a depth of some 12 or 15 feet below the swampy surface the remains of a long built wall with a line of palisades of strong timber running near and almost parallel to it and slightly inclined towards it. It would thus appear that the wooden wall of Palibothra was in reality a line of palisades in front of a wall of brick.

এক প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিত। এই বস্ত্র লিখনোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ঘনভাবে বয়ন করিয়া লওয়া হয়। ভারতবাসীরা কোনও উৎসব উপলক্ষে শোভা-যাত্রা করিলে, মহিষ, পালিত সিংহ প্রভৃতি বন্য পশু ও বিচিত্র পক্ষ বিহঙ্গ সমূহ লইয়া যাইত।

পুরাকালে ভারতীয়গণ সংযমাচারের জন্য বিখ্যাত ছিল। সুরা ভারতীয় সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিল। ভারতবাসীদের সুরা পান সম্বন্ধে ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, ভারতবর্ষের রাজন্যকুলে সুরার প্রচলন ছিল। কিন্তু গ্রীক লেখক এথেন আইওসের মতে, ভারতীয় রাজন্যগণের পক্ষেও মিতাচারই প্রশংসার্হ ছিল। কারটিয়াস নামক এক-জন গ্রীক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসি মাত্রেই সুরাপানে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু মেগাস্থিনিস অন্য প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; তাঁহার মতে, কেবল যজ্ঞের সময় সুরাপান করিবার নিয়ম ছিল। মালবারের বন্দর সমূহে মদ্য বিক্রীত হইত। কিন্তু উহার মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল বলিয়া কেবল ধনীর সন্তানেরাই তাহা ক্রয় করিতে পারিত। অনুগাঙ্গ প্রদেশে কেহ সুরাপান করিয়া মত্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ তাহার কঠোর দণ্ডের বিধান করিতেন। ভারতবর্ষে সোম নামক লতা হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত ; ভারতীয়গণ সুরাপান করিবার পূর্ব্বে তাহা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইত।

সুরা পান।

পুরাকালে সংযম ও কষ্ট সহিষ্ণুতা ভারতবর্ষীয়দিগের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তাঁহাদের সুরাপান-বিরতিতে সংযমের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের জীবন কতদূর কষ্ট সহিষ্ণু ছিল, সাধুসন্ন্যাসিগণের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই তাহা আমাদের উপলব্ধি হইতে পারে। সিসেরু লিখিয়াছেন,—"আর কোন দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত ও

ভারতবাসীর কষ্ট সহিষ্ণুতা।

বনরাজি পূর্ণ নহে। এই দেশে যাঁহারা মুনি ঋষি নামে পরিচিত, তাঁহাদের চির জীবন উলঙ্গভাবে অতিবাহিত হয়. তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে পার্ব্বত্য তুষার ও শীতের তীক্ষ্ণতা সহ্য করেন। যে সময় তাঁহারা জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করেন, তখনও তাঁহাদের মুখ হইতে কাতর ধ্বনির লেশমাত্রও উত্থিত হয় না।" সিসেরুর এই মতের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিবার জন্য আমরা এরিয়ানের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি।—"ভারতীয় সাধুসন্ন্যাসিগণ উলঙ্গ অবস্থায় গমনাগমন করেন; তাঁহারা শীতকালে দেহ উষ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত আকাশতলে অবস্থিতি করেন, তারপর গ্রীষ্ম সমাগমে সূর্য্যতাপ অসহ্য হইয়া উঠিলে, ছায়া-শীতল বৃক্ষতলে গমন করেন।" ষ্ট্রাবো কতিপয় সাধুর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে প্রাচীনকালের সাধুসন্ন্যাসিগণের জীবন যাপন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারি। এজন্য আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

সম্রাট আলেকজণ্ডার তক্ষশিলায় উপনীত হইয়া তদ্দেশীয় সাধু সন্ন্যাসিগণের অদ্ভুত আচার ব্যবহারের বিষয় অবগত হন। তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কতিপয় সাধুসন্ন্যাসিকে আহ্বান করেন। কিন্তু কেহ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে বলিতেন। সম্রাট এই বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক স্ব-শিবিরে আনয়ন করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন; অপর পক্ষে, তাঁহাদের বাসস্থানে তাঁহার নিজের গমনও অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কারণে তিনি অনেসিক্রিটস নামক একজন সহচরকে প্রেরণ করেন। অনেসি

ভারতীয় সাধুর বিবরণ

ব্রিটস তক্ষশিলার সাধুসন্ন্যাসিগণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—তক্ষশিলা নগরী হইতে ২০ ষ্টেডিয়া দূরবর্ত্তী সাধুসন্ন্যাসিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই যে, সেখানে পনর জন সাধু বাস করিতেছেন। তাঁহাদের কেহ উলঙ্গ অবস্থায় শয়ন করিয়া, কেহবা উলঙ্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই ভাবে নিশ্চল মূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিতি করেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে তাঁহারা ঐ আবাস স্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরীতে গমন করেন। সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। এই স্থানের রৌদ্র এত প্রখর যে, দ্বিপ্রহর কালে নগ্নপদে ভ্রমণ করিলে নিশ্চয়ই যন্ত্রণা পাইতে হয়। আমি কলানস নামক একজন সাধুর সহিত আলাপ করি। আমার সঙ্গে আলাপের সময় তিনি প্রস্তর খণ্ড সমূহের উপর শয়ন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনারা কিরূপ জ্ঞানবান, তাহা পরীক্ষা করিয়া সম্রাটকে জানাইবার নিমিত্ত তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন। কলানস আমার আলখেল্লা, প্রশস্ত টুপি ও লম্বা জুতা দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন; তারপর বলিতে লাগিলেন,—বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী যেরূপ ধূলি পূর্ণ, পুরাকালে সেইরূপ শস্যপূর্ণ ছিল। তৎকালে জল, মধু, দুগ্ধ, তৈল ও সুরার পৃথক পৃথক প্রস্রবণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মানবজাতি বিলাসিতা ও আত্মম্ভরিতা নিবন্ধন গর্ব্বিত ও অশিষ্ট হইয়া উঠিল; এজন্য ইন্দ্র ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ সমুদয়ের বিলোপ সাধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে চির-জীবন পরিশ্রম করিয়া অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত অভিশাপ দিয়াছেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারের অবসান হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা দূরীভূত হইবে বলিয়া বোধ হয়। যদি আমার উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে সমস্ত গাত্রবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক উলঙ্গ অবস্থায় আমার সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর।

কলানসের বাক্যে কি কর্ত্তব্য, আমি তাহা চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানগরিষ্ঠ সাধু মন্দনিস কলানসকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন তুমি যে সকল দোষের নিন্দা করিতেছ, তোমার বাক্যে তৎসমুদয় অর্থাৎ অশিষ্টাচারাদি প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সম্রাট প্রশংসা ভাজন; কারণ, তিনি বিপুল ভূভাগের অধীশ্বর হইয়াও জ্ঞানান্বেষণে নিরত রহিয়াছেন। আমি এ পর্য্যন্ত আলেকজণ্ডার ব্যতীত আর কোনও সশস্ত্র দার্শনিক দেখি নাই। যাঁহাদের অনুগত লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার ও অবাধ্য লোকদিগকে বলপ্রয়োগ করিয়া সংযমাচার শিক্ষা দিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যদি জ্ঞানবান হয়েন, তবে পৃথিবীর মহত্তম মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। যে নীতি আমাদিগকে সুখ ও দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে সমর্থ, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুঃখ পরিশ্রম হইতে স্বতন্ত্র। দুঃখ মনুষ্যের শত্রু, পরিশ্রম মনুষ্যের বন্ধু। লোকে মানসিক শক্তির বিকাশের জন্যই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। তাহারা কেবল মানসিক শক্তি বলেই বিবাদ বিসংবাদের নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়া সর্ব্বসাধারণকে সদুপদেশ দিতে পারিবে। তক্ষশিলার অধিবাসিগণের পক্ষে আলেকজণ্ডারকে সাদরে অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য। যদি তক্ষশিলার অধিবাসীরা আলেকজণ্ডারের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান হয়, তবে তাঁহার উপকার হইবে; আর যদি তিনি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হন, তাহা হইলে তক্ষশিলার অধিবাসীরা উপকার লাভ করিবে।" গ্রীক জাতির মধ্যে পূর্ব্বোদ্ধৃত মত সকল প্রচলিত আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে মন্দনিস আমাকে প্রশ্ন করেন। আমি তদুত্তরে বলি, পিথাগোরাস এই প্রকার নীতির প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এবং শিষ্যবর্গকে মাংসাহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি সক্রেটিস ও ডাওজিনিসের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি তাঁহারাও ঐ প্রকার মতাবলম্বী।

আমার বাক্যে মন্দানিস উত্তর করেন, "আমার বিবেচনায় আপনাদের সমস্ত মতামতই সমীচীন; আপনারা কেবল একটি ভুল করেন,—আপনারা প্রকৃতি অপেক্ষা অভ্যাসের অধিক পক্ষপাতী, ইহাই আপনাদের ভুল। আপনারা এই প্রকার ভ্রান্তবিশ্বাসী বলিয়াই উলঙ্গ অবস্থায় বাস ও যৎসামান্য আহার করিতে কুণ্ঠিত হন। যে গৃহের সংস্কারের প্রয়োজন অল্প, তাহাই খুব মজবুত। আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভাবী শুভাশুভ, বৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও লোকপীড়া সম্বন্ধীয় তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকি।" এই সকল সাধু সন্ন্যাসীর নিকট প্রত্যেক ধনবানের গৃহদ্বার উন্মুক্ত। তাঁহারা অবাধে অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতে পারেন। সাধুসন্ন্যাসিগণ ধনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজন ও কথোপকথন করেন। যদি কোনও সাধু পীড়াগ্রস্ত হন, তবে তাঁহার সম্মানের অত্যন্ত লাঘব হয়; তজ্জন্য পীড়িত হইলে তাঁহারা জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

আলেকজণ্ডারের আগমন কালে প্রাগুক্ত সাধুসন্ন্যাসিগণ ব্যতীত আর দুইজন সাধু তক্ষশিলায় বাস করিতেন। তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সাধুর মস্তক মুণ্ডিত ছিল; কিন্তু কনিষ্ঠ সাধুর মস্তক কেশাবৃত ছিল। এই দুই জন সাধুরই অনেক শিষ্য ছিল। তাঁহারা অবসর কাল হাট বাজারে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের উপদেষ্টা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তাঁহারা বিনামূল্যে বিক্রেতাদিগের জিনিস পত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা তিল ও মধু দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। এই সাধুদ্বয় একদা সম্রাট আলেকজণ্ডারের শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজ-শিবিরে আসন পরিগ্রহ করিতে অস্বীকৃত

হইয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া আহার করেন। তারপর তাঁহাদের একজন উন্মুক্তস্থানে পৃষ্ঠোপরি শয়ন করিয়া এবং অপর জন একপদে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হাতে তিন হস্ত পরিমিত কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিয়া সমস্ত দিন রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। কনিষ্ঠ সাধু আলেকজণ্ডারের সহিত কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হন। সম্রাট তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া পাঠান; তদুত্তরে তিনি বলেন যে, প্রয়োজন হইলে সম্রাট তাঁহার সমীপে আগমন করিতে পারেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সাধু সম্রাটের সমভিব্যাহারে গমন করেন। রাজ সহবাসে তাঁহার জীবন যাত্রার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই কারণে কতিপয় ব্যক্তি, তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তিনি তিরস্কৃত হইয়া উত্তর করেন, আমি চল্লিশ বৎসর তপশ্চর্য্যা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; আমার এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। (১)

তক্ষশিলার সাধু সন্ন্যাসিগণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ষ্ট্রাবো তক্ষশিলার ও অন্যান্য প্রদেশের প্রকৃতিপুঞ্জের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া

(১) যেরূপে সম্রাট আলেকজণ্ডারের সহিত সাধু যুগলের সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা কৌতুকাবহ। আলেকজণ্ডার সসৈন্যে গমন করিতেছিলেন; এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, দুইজন সাধু তাঁহাকে দেখিয়া পদ দ্বারা মাটীর উপর সজোরে আঘাত করিলেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর করিলেন, হে সম্রাট! আমরা যতখানি ভূমি আঘাত করিয়াছি, পৃথিবীর মনুষ্য মাত্রেই কেবল ততখানি ভূমির অধিকারী; যদিও আপনি আমাদের ন্যায়ই একজন মনুষ্য, তথাপি অনধিকার চর্চ্চা প্রিয়তা ও দাম্ভিকতা বশতঃ পৃথিবীর বিপুল অংশ অধিকার করিয়া নিজের ও অন্যের কষ্টের কারণ হইয়াছেন। কিন্তু শীঘ্রই আপনার মৃত্যু হইবে, এবং কবরের জন্য যে পরিমাণ ভূমি আবশ্যক, কেবল তাহাই আপনার অধিকারে থাকিবে।

দিলাম। এই দেশের ব্যবস্থা সমূহ অলিখিত, এবং অন্যান্য জাতির ব্যবস্থা অপেক্ষা বিভিন্ন ছিল। ভারতবর্ষের কোনও জাতির কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইলে তাহার পাণি-প্রার্থিগণ তদীয় পিত্রালয়ে সমাগত হইয়া মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেন। যিনি ইহাতে জয়শ্রী লাভ করিতেন, তিনি কন্যা রত্নের অধিকারী হইতেন।

প্রকৃতি-পুঞ্জের আচার ব্যবহার।

কেহ দারিদ্র্য নিবন্ধন কন্যার বিবাহের ব্যয় ভার বহন করিতে অসমর্থ হইলে, সে কন্যাসহ বাজারে গমন পূর্ব্বক ঢাক বাজাইতে আরম্ভ করিত। ঢক্কানিনাদ শ্রবণ করিয়া বিবাহার্থিগণ সমাগত হইলে, কন্যা যাহার মনোনীত হইত, তাহার হস্তেই কন্যাকে সমর্পণ করিবার নিয়ম ছিল। (১) বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া সন্তোষ সহকারে জীবন বিসর্জ্জন করিত। কোনও রমণী পুড়িয়া মরিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার বড় নিন্দা হইত (২)। এই দেশে আর একটি প্রথা বিদ্যমান ছিল; কতিপয় পরিবারের লোক এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্ষেত্রকর্ষণ করিত; তারপর শস্য পক্ক হইলে তাহা বিভাগ করিয়া লইবার নিয়ম ছিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য প্রাপ্ত হইলে তাহারা উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিত, এবং আবাদের সময় সমাগত হইলে পুনর্ব্বার ক্ষেত্রকর্ষণে নিযুক্ত

---

(১) বিবাহ সম্বন্ধে এই প্রথা আমাদিগকে স্বয়ংবরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(২) ভারতবর্ষের সতীদাহ প্রথার প্রসঙ্গে সিম্বেরু যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ভারতবাসীরা বহুপত্নীক, এজন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পত্নীগণ মধ্যে কাহাকে অধিক ভাল বাসিত, বিচারালয়ে তাহার মিমাংসা হয়। যে স্ত্রী বিচারে জয়লাভ করে, সে আনন্দিত চিত্তে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন সমক্ষে পতিসহ জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ ত্যাগ করে। অপর পত্নীগণ বিমর্ষ চিত্তে গৃহে প্রতিগমন করে॥"

হইত। ফলতঃ, যাহাতে আলস্য প্রশ্রয় না পায়, তজ্জন্যই প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ধনু ও বাণ এই দেশের সাধারণ অস্ত্র ছিল। ঐ সকল বাণ তিন হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইত; কেহ কেহ বা বল্লম, ঢাল ও প্রশস্ত তরবারি ব্যবহার করিত। এতদ্দেশীয়েরা তাম্র পাত্র ব্যবহার করিত; কিন্তু তৎসমুদয় ঢালাই হইত, পেটাপাত্র ছিল না; একারণ উহা মাটীতে পড়িলেই মৃৎপাত্রের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইত। প্রকৃতি পুঞ্জ রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত না; উচ্চ নীচ প্রজামাত্রেই তাঁহাকে প্রার্থনাসূচক সম্বোধন বাক্যে অভিবাদন করিত। ভারতীয়গণ ইন্দ্রদেব, গঙ্গা ও অন্যান্য দেবতার উপাসক ছিলেন। কোনও নরপতি কেশ ধৌত করিলে তাঁহার প্রজাবর্গ মহোৎসবে নিরত হইত, এবং রাজ সমীপে মহার্ঘ্য উপঢৌকন প্রেরণ করিত। তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট উপঢৌকন-প্রেরণ সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। তাহারা উৎসব উপলক্ষে মিছিল বাহির করিত। এই সকল মিছিলের প্রথম অংশে স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কারে সজ্জিত হস্তী, চতুরশ্ব পরিচালিত রথ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বলীবর্দ্দের শ্রেণী পরিদৃষ্ট হইত। তার পর বহু সংখ্যক পরিচারক সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত নানাবিধ পানপাত্র ও তাম্র নির্ম্মিত ও মণিমুক্তা-খচিত সুখাসন, সিংহাসন, পানপাত্র, জলপাত্র ও স্বর্ণের কারু-কার্য্যবিশিষ্ট পরিচ্ছদ বহন পূর্ব্বক গমন করিত। পরিচারক শ্রেণীর শেষে মহিষ, তরক্ষু, পালিত সিংহ ও বিচিত্র-পক্ষ ও সুকণ্ঠ বিহঙ্গম সমূহ নীত হইত। চতুশ্চক্র-যানে সপল্লব বৃক্ষ সকল উত্তোলন করিয়া তাহাতে পক্ষীর পিঞ্জরগুলি ঝুলাইয়া রাখা হইত।

ষ্ট্রাবোর গ্রন্থ হইতে আমরা হিন্দুর ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের শ্রমণ—উভয় শ্রেণীর সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইতে পারি। ব্রাহ্মণগণের

অনেকে রাজনীতির আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং রাজন্য বৃন্দের উপদেষ্টার কাজ করিতেন; আবার অনেকে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠেই সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। আর্য্য-নারীবৃন্দও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সকল মহিলা সাতিশয় সংযত ভাবে জীবন যাপন করিতেন।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ।

ষ্ট্রাবো শ্রমণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—শ্রমণগণ ব্রাহ্মণগণের বিরোধী, তার্কিক ও বাকবিতণ্ডাপ্রিয়। যে সকল ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ ও শারীর-স্থান-বিদ্যা শিক্ষায় নিরত, শ্রমণগণ তাঁহাদিগকে প্রতারক ও নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করেন। শ্রমণগণ পর্ব্বতে, নগরে ও পল্লীতে বাস করেন। পর্ব্বতবাসী শ্রমণগণ কৃষ্ণাজিন পরিধান করেন এবং নানা প্রকার বৃক্ষমূল ও ঔষধ সঙ্গে রাখেন। তাঁহারা যাদুবিদ্যা বলে রোগ নিবারণ-সক্ষম, এইরূপ প্রকাশ করেন। বৌদ্ধ বিহারে শ্রমণগণের সঙ্গে বৌদ্ধ রমণীরাও বাস করেন; কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন; নগরবাসী শ্রমণগণ শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন।

আমরা ষ্ট্রাবোর গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, পুরাকালে ভারতবাসিমাত্রেই শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিত। তাহাদের দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রু ছিল; তাহারা দীর্ঘ কেশরাজি দ্বারা বেণী বন্ধন করিত।

ষ্ট্রাবো স্বগ্রন্থে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। আয়ারসি নামক একজাতি তানাইস নদীর কূলে বাস করে। একারডিয়াস নদীর কূলে সিরাসেস নামক আর এক জাতির বাস। কাস্পিয়ান উপসাগরের কূলবর্ত্তী অধিকাংশ স্থান এই দুই জাতির

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য।

অধিকৃত বলিয়া ভারতীয় পণ্য সহজেই তাহাদের হস্তে আসিয়া পড়ে। তাহারা আর্ম্মেনিয়ান ও মেদেস জাতির নিকট হইতে ঐ সকল পণ্য ক্রয় করিয়া লয়। তাহারা স্বর্ণ খচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আপনাদের ধন গৌরবের পরিচয় প্রদান করে। বৈদেশিক বণিকগণ কাস্পিয়ান উপসাগরের প্রবেশ-দ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক হেকটম্‌ফিলস (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান দামাঘন) নামক স্থানে (১৯৬০ ষ্টেডিয়া), তথা হইতে হিরাটে (৪৫৩০ ষ্টেডিয়া), তথা হইতে সিস্তান প্রদেশের প্রধান নগর ফারে (১৬০০ ষ্টেডিয়া) তথা হইতে উলালবরাট নামক স্থানে (৪১২০ ষ্টেডিয়া) এবং তথা হইতে কাবুলে (২০০০ ষ্টেডিয়া) আগমন করে। তাহার পর তাহারা কাবুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১০০০ ষ্টেডিয়া অতিক্রম করিয়া ভারত সীমায় উপনীত হয়। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে নৌযোগে অক্সস নদীর পথে কাস্পিয়ান উপসাগরের কূলে ভারতীয় পণ্য আনয়ন করে। (১)

(১) ষ্ট্রাবোর গ্রন্থেও ভারতীয় বর্ণভেদ প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে বৃত্তান্ত মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত: এইজন্য আমরা তাহার উল্লেখ নিস্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিলাম।

টলেমি।

——:*:——

প্রসিদ্ধনামা টলেমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মিশরের অন্তর্গত আলেকজণ্ড্রিয়া নগরীতে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীতপটু ছিলেন, তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে লোক মুগ্ধ হইত।

টলেমির ভূগোল বৃত্তান্ত

টলেমি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ে অলমাজেষ্ট নামধেয় একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, অলমাজেষ্টের পরিশিষ্টরূপে তদীয় ভূগোল-বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছিল।

টলেমির ভূগোল-বৃত্তান্তও আট অধ্যায়ে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ; ইহার একটি অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

টলেমি পৃথিবী গোলাকাররূপে বর্ণনা করিয়া তাহার পরিধি ১৮০০০০ ষ্টেডিয়া এবং মধ্য রেখার এক ডিগ্রির বিস্তার ৫০০ ষ্টেডিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই অঙ্কপাত ভ্রমাত্মক, এজন্য তদীয় গ্রন্থোল্লিখিত নগর, নদ, নদী ইত্যাদির বর্ত্তমান নাম ও অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু তথাপি লাসেন, ইউল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধানে ও চিন্তাবলে এবিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু নদের পশ্চিম কূলের বহু অংশ ভারত-বর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কান্দাহার, গজনী, কাবুল, বাল্ক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা ছিল। এই সকল জনপদে হিন্দু রাজন্যগণ রাজত্ব করিতেন। পুরাকালে কান্দাহার গান্ধার, বাল্ক বাহ্লীক, কাবুল কবোর নামে পরিচিত ছিল।

ভারতবর্ষের সীমা নির্দ্দেশ

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় ইমায়ুস নামক পর্ব্বত বিস্তৃত ছিল। ইমায়ুস সংস্কৃত হিম শব্দের অপভ্রংশমাত্র। গ্রীকগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ইমায়ুস পর্ব্বত এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে শাকই, কম্বোজ, কিরাতাই প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জাতির বাস ছিল।

টলেমি স্বীয় গ্রন্থে সিন্ধু নদের মুখ হইতে গঙ্গা নদীর মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভারতীয় উপকূলের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তদনুসারে ভারত উপকূলবর্ত্তী প্রধান প্রধান জনপদের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সিরিষ্ট্রীনি সৌরাষ্ট্রের অপভ্রংশ। বর্ত্তমান সময়ে উহা গুজরাট নামে পরিচিত। সিরাষ্ট্র প্রাগুক্ত দেশের প্রধান নগর ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই নগর জুনাগড় নামে পরিচিত, তৎপূর্ব্বে জীর্ণ নগর নামে পরিচিত হইয়াছিল। জুনাগড়ের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীনত্বের অসংখ্য নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। জুনাগড়ের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে অশোকের, স্কন্ধ গুপ্তের এবং রুদ্রদাসের অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

গুজরাট

মনগ্লোসন বর্ত্তমান সময়ে মনগ্রোল নামে পরিচিত হইতেছে। মনগ্রোল দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী একটি সমুদ্র বন্দর এবং জুনাগড় করদ রাজ্যের অধীন।

লারিক লাসেনের মতে সংস্কৃত রাষ্ট্রিক এবং প্রাকৃত লাটিক শব্দের অপভ্রংশমাত্র, লারিক বা রাষ্ট্রিক বর্ত্তমান গুজরাট দেশের একাংশব্যাপী ছিল। লার শব্দ লাট শব্দের অপভ্রংশ। গ্রীক লেখকবর্গ লার শব্দের শেষে স্বদেশীয় 'ইক্' শব্দ যোগ করিয়া লারিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বারুগজা (সংস্কৃত নাম ভৃগুকচ্ছ এবং আধুনিক নাম বরোচ) ও উজ্জয়িনী নামক প্রসিদ্ধ স্থানদ্বয় লারিক দেশের অন্তর্গত ছিল।

নৌসরিপ বর্ত্তমান সময়ে নৌসরি নামে পরিচিত। নৌসরি আধুনিক সুরাটের অষ্টাদশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

পৌলিপৌল বর্ত্তমান সময়ে সঞ্জন নামে পরিজ্ঞাত। সঞ্জন নৌসরি নামক স্থানের অনাতদূরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

আরিয়াকি বা আর্য্যাকি আধুনিক মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বনাম ছিল। এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসী আর্য্যজাতিসম্ভূত ছিল। আর্য্য নরপতি তথায় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালে এই দেশের চতুষ্পার্শ্বে আর্য্যেতর জাতির বাস ও রাজত্ব ছিল; এই কারণে আমাদের বর্ণিত জনপদ আর্য্যাকি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরিয়াকি বা আর্য্যাকি তিন অংশে বিভক্ত ছিল। একাংশে সদিনেইস বংশীয়গণ আধিপত্য করিতেন, তাঁহাদের আধিপত্য সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সদিনেইস বংশীয়গণের আধিপত্যাধীন সমুদ্রোপকূলে সমৃদ্ধ বণিকগণ বাস করিত। আরিয়াকি বা আর্য্যাকিতে অন্ধ্র বংশীয়গণেরও আধিপত্য ছিল।

মহারাষ্ট্র

সৌপর বর্ত্তমান সময়ে সুপারা নামে পরিচিত। সুপারা বাসিন নামক স্থানের ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীন কালে সৌপর বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সুপারার পার্শ্বে পুরাতন অট্টালিকাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে অশোকের লিপি এবং বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পশ্চিম উপকূল

সিমিলা আধুনিক চৌলের পূর্ব্ব নাম ছিল। চৌল বোম্বাইয়ের দক্ষিণ দিকে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। সিমিলা প্রাচীন ভারতের একটি প্রসিদ্ধ বন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পর্ত্তুগিস বণিকগণের প্রথম আগমন কালেও সিমিলার বাণিজ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। যে সকল বৈদেশিক বণিক বাণিজ্যোপলক্ষে সিমিলায় আগমন করিতেন,

টলেমি তাঁহাদের প্রমুখাৎ নানা তত্ত্ব অবগত হইয়াই পশ্চিম ভারতের ভূগোল-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন।

হিপ্পকোর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ঘোড়াবন্দর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল, পণ্ডিত ভগবান লাল ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

টলেমি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত নগরের অধিকাংশই বাণিজ্য-প্রধান গঞ্জ ছিল। আমরা বাহুল্যভয়ে ঐ সমুদায় স্থানের কেবল নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। (১) বার্লতিপত্র, (২) মন্দগোর, (৩) খেরসোনিসস্, (৪) নিত্র, (৫) তিণ্ডিস, (৬) ব্রহ্মগড়, (৭) কলই করিয়াস, (৮) মৌছিরিস, (৯) পদ পিরৌর, (১০) সেমনি, (১১) কোরঔরা, (১২) মেলকিন্দ, (১৩) বকরেই, (১৪) এলঙ্গকল, (১৫) কোত্তিয়ার, (১৬) বোম্বল। এই সমস্ত স্থানের বর্ত্তমান নাম সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়।

কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ স্থান

কুমারিয়া কুমারিকা অন্তরীপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কুমারী দুর্গার অন্যতম নাম। কুমারী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া স্থানটি ঐ নাম প্রাপ্ত হয়।

সসিকোরেই বর্ত্তমান সময়ে তুতিকোরিণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তুতিকোরিণ বর্ত্তমান সময়ে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর। সসিকোরেইও প্রাচীন কালে বাণিজ্যস্থানরূপে প্রসিদ্ধ ছিল।

কোলখোই নগর কুমারিকা অন্তরীপের পূর্ব্বাংশে বিদ্যমান ছিল। এই স্থান মুক্তার কারবারের জন্য শ্রীসম্পন্ন ছিল। কোনকই বা কোরকই প্রাচীন কোলখোই রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে প্রাচীন পাণ্ড্য (টলেমি লিখিয়াছেন পাণ্ডিয়ন) বংশের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এই স্থানেই তাঁহাদের রাজ্যের

রাজধানী ছিল, তাহার পর মাদুরায় রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান তিনেভেলি জিলার অধিকাংশ পাণ্ড্যরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পাণ্ড্য রাজ্য কোইম্বাটুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কোরির আধুনিক নাম কাল মিয়র, ইহা একটি অন্তরীপ।

বাটোই বর্ত্তমান সময়ে তাঞ্জোর জিলায় পরিণত হইয়াছে।

প্যারালিয়ার আধুনিক নাম ত্রিবাঙ্কুর। প্যাবালিয়া ত্রিবাঙ্কুর আখ্যা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পুরালী নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই কারণে ত্রিবাঙ্কুরের অধিপতিগণের উপাধি পুরালীশাল ছিল।

সোর চোলের অপভ্রংশমাত্র। চোল অতি প্রাচীন রাজ্য।

করৌরার আধুনিক নাম করুর; করৌরা খাবিরস নামক নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। খাবিরস বর্ত্তমান সময়ে কাবেরী নামে খ্যাত। খাবিরস বা কাবেরী অর্দ্ধগঙ্গা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই জন্য পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন যে, যে সকল আর্য্য এই স্থানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, গঙ্গাতীরে তাঁহাদের আদি বাস ছিল। করৌরা চেরা বা কেরলপুত্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। চেরা বা কেরলপুত্র অতি প্রাচীন রাজ্য।

কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যগত প্রদেশের কতিপয় স্থানের বর্ণনা টলেমির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল স্থানের বর্ত্তমান অবস্থান ও নাম সম্বন্ধে অনেক তর্ক ও মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে আমরা কেবল তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। (১) পোদৌকি, [বাণিজ্য স্থান] (২) মেলানজি [বাণিজ্য স্থান] (৩) কোন্তিস, (৪) মনরফ [বাণিজ্য স্থান] (৫) কণ্টকশীল [বাণিজ্য স্থান] (৬) কোদ্দৌরা, (৭) অল্লসিগিনি।

টলেমি উড়িষ্যা দেশের কতিপয় নগরের ও নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল নগরের ও নদীর নামের সহিত উড়িষ্যার বর্ত্তমান

নগরের ও নদীর নামের সাদৃশ্য নাই। টলেমি প্রদত্ত দুইটি নগরের নাম উল্লিখিত হইতেছে। ননিগইনা এবং কন্নগর।

উড়িষ্যা।

পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ননিগইনা শ্রীক্ষেত্র পুরী এবং কন্নগর সূর্য্যক্ষেত্র কনারক ব্যতীত আর কোন স্থান নহে।

টলেমি কোশম্ব নামক একটি নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইউলের মতে বর্ত্তমান বালেশ্বর নামক স্থানই টলেমির কোশম্ব। কিন্তু লাসেন লিখিয়াছেন যে, সুবর্ণরেখা নদার মুখে কোশম্ব নগর বিদ্যমান ছিল; যদি লাসেনের নির্দ্দেশ প্রকৃত হয়, তবে কোশম্ব নগর কালগর্ভে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে; উহার চিহ্নমাত্রও নাই। পুরাকালে এলাহাবাদের নিকট যমুনাতীরে কৌশাম্বী নামে একটি বিখ্যাত নগরী বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধগণ কৌশাম্বীকে পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য করিতেন। নামসাদৃশ্য দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, যমুনাতীরবর্ত্তিনী কৌশাম্বীর রাজবংশীয়গণ টলেমির কোশাম্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন।

টলেমি গঙ্গা নদীর পঞ্চ মুখের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কম্বিসন, মেগা, কম্বেরিখন, সিউদস্তমল এবং এণ্ডিবোল। গঙ্গার সর্ব্বপশ্চিম মুখের নাম কম্বিসন। কম্বিসন সম্ভবতঃ ভাগীরথী।

গঙ্গানদী।

লাসেনের মতে পুরাকালে সুবর্ণরেখা গঙ্গানদীর এক শাখা ছিল এবং কম্বিসন নামে সুবর্ণরেখাই উদ্দিষ্ট হইতেছে। টলেমি দুইটি নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, একের নাম পোলোবা অপরের নাম তিলো গ্রামণ।

টলেমি কাশ্মীরের নাম কাশপেইরিয়া লিখিয়াছেন। 'রাজতরঙ্গিণী' অনুসারে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজা মেঘবাহনের শাসনকালে কাশ্মীরের বিপুল সমৃদ্ধি ও প্রবল প্রতাপ

কাশ্মীর।

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের অধিকার পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

টলেমি বিপাশা, শতদ্রু, যমুনা এবং গঙ্গার উদ্ভবস্থানবর্ত্তী দেশ কিলিন্দ্রিনি নামে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। কিলিন্দ্রিনির সংস্কৃত নাম কুলিন্দ। মহাভারতে কুলিন্দবাসীদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা রাজসূয় যজ্ঞকালে উপহার স্বরূপ স্বর্ণ প্রদান করিয়াছিল।

উত্তর ভারত

উত্তর ভারতে পাণ্ডই নামে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া টলেমি স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। টলেমির পাণ্ডই রাজ্য পাণ্ডব-রাজ্য, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থেও পাণ্ডবরাজ্যের উল্লেখ আছে। 'ললিত বিস্তর' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। ইহার পরবর্ত্তীকালে পাণ্ডবগণ আদিস্থানচ্যুত হইয়াছিলেন এবং নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। রাজপুতানা, পঞ্জাব, অনুগাঙ্গপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে তাঁহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

বর্ত্তমান লাহোর প্রাচীন লবকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অযোধ্যার অধিপতি লব এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শাগল সংস্কৃত সাহিত্যে শাকল লিখিত হইয়াছে। শাকল প্রাচীন মদ্ররাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান লাহোরের পশ্চিমদিকে ৬০ মাইল দূরে শাকল অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইন্দবর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে এই নগর বিদ্যমান ছিল।

মহারাজ শত্রুঘ্ন ভারতবর্ষের ললামভূতা মথুরা নগরীর প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়েও মথুরার পূর্ব্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। টলেমি এই মথুরার নামই বিকৃত করিয়া মদোরা লিখিয়া গিয়াছেন।

লাসেন এবং অন্যান্য পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে গগাসমিরা বর্ত্তমান আজমীরের নামান্তরমাত্র।

ইউলের মতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এররস নামে পরিচিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীবৃন্দাবনের একাংশে অবস্থিত; সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীবৃন্দাবনই টলেমির উদ্দিষ্ট ছিল।

উত্তর পঞ্চালরাজ্যের রাজধানীর নাম অহিচ্ছত্র ছিল। টলেমি এই অহিচ্ছত্রের নাম অদিসদর লিখিয়াছেন। এক বিষধর সর্প একদা উত্তর পঞ্চাল রাজ্যের নিদ্রিত প্রথম অধিপতির মস্তকোপরি ফণা বিস্তৃত করিয়াছিল। এইজন্য তদীয় রাজধানী অহিচ্ছত্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কণৌজ বা কান্যকুব্জ টলেমির হস্তে পতিত হইয়া কাণগোরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গা নদীর অন্যতম শাখা কালিন্দী নদীর তীরে এই নগর অবস্থিত ছিল।

টলেমির হস্তে পতিত হইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানের নাম বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল; কেবল নাসিক নগরের নাম পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

নাসিক।

রামাজ্ঞায় অনুজ লক্ষ্মণ এইস্থানে স্পর্ণখার নাসিকা কর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে নাসক ভারতবাসীর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

টলেমি পালিম্‌বোথরা ও মেগাস্থিনিস পালিবোথরা লিখিয়াছেন। এই দুই নগরী অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পালিম বোথরা অথবা

মগধ রাজ্য।

পালি বোথরা প্রাসাই রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রাসাই প্রাচ্য শব্দের অপভ্রংশ। গ্রীকগণ মগধ সাম্রাজ্যের এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। মগধ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বঃ

দিগন্তিতা নিবন্ধন এই নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। পালিম বোথরা অথবা পালি বোথরার প্রকৃত নাম পাটলীপুত্র ছিল। বর্ত্তমান পাটনার নিকট বর্ত্তী স্থানে পাটলীপুত্রের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ

পুরাকালে তাম্রলিপ্তি (আধুনিক তমলুক) সাতিশয় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। পালি সাহিত্যে তাম্রলিপ্তি তাম্মালিতিরূপে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্মালিতি সহজেই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তামাল তিসে পরিণত হইয়াছিল।

পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রীক-বর্ণিত গঙ্গারাঢি ও রাঢ়ভূমি অভিন্ন। এই দেশের রাজধানী গঙ্গি নামে অভিহিত হইয়াছে। গঙ্গি কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা আজ পর্য্যন্তও নির্ণীত হয় নাই।

ইউল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, টলেমির হস্তে কর্ণসুবর্ণ নামক রাজ্য বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কাটসিনা হইয়াছে। পুরাকালে আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলায় কর্ণসুবর্ণ নামে এক পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আমরা টলেমি-বর্ণিত ভারত-বিবরণের স্থূল মর্ম্ম প্রদান করিলাম। এই প্রবন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল, তদ্ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক নগর, পর্ব্বত এবং নদ নদীর বৃত্তান্ত তদীয় পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। এতৎসমুদায়ের অধিকাংশেরই অবস্থান ও ব্যাপ্তি এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই; যে গুলির অবস্থান ও ব্যাপ্তি নির্ণীত হইয়াছে, তাহাও তাদৃশ প্রসিদ্ধ ছিল না। এই কারণে আমরা তৎসকলের উল্লেখে বিরত হইলাম।

টলেমির গ্রন্থে অনেক ভারতীয় জাতির এবং বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণ পাঠে তৎকালের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য এই বিবরণের কিয়দংশ সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি।

কাবুল ও সিন্ধু নদের সঙ্গমস্থল হইতে সিন্ধু নদের মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশে শিথিয় অর্থাৎ শকগণ আধিপত্য করিতেন। শকগণ মধ্য এসিয়া হইতে আগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কালক্রমে ভারত-বর্ষের ধর্ম্ম ও আচারব্যবহার গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবাসীর তুল্য হইয়াছিলেন।

রাজবংশ ও রাজ্য-সমূহের বিবরণ

সিন্ধু নদের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ যে স্থান হইতে সিন্ধু নদ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বদিকে আভীরগণ বাস করিত। আভীর শব্দ সংস্কৃত, ইহার অর্থ গোপালক। দেশীয় শব্দ আহির।

ভারতবর্ষের প্রখ্যাতনামা নগর নাসিকের পূর্ব্বদিকে পুলিন্দেই জাতির বাস ছিল। এই প্রদেশে পুলিন্দেইগণের প্রবল প্রতাপ পরিদৃষ্ট হইত। পুলিন্দেই জাতি ভারতবর্ষের অনার্য্য আদিম অধি-বাসী ছিল।

নর্ম্মদানদীবিধৌত প্রদেশের একাংশে প্রপিওটাই জাতি বাস করিত। এই স্থানে কোসা নাম্নী একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোসা নগরীতে হীরক পাওয়া যাইত।

তাপ্তি নদীর তীরদেশ হইতে সাতপুরা শৈলমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে ফিলিটাই জাতি বাস করিত। লাসেন ফিলিটাই ভীল জাতির অপভ্রংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভীল শব্দের সংস্কৃত নাম ভিল্ল। ভীলগণ সাতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ছিল বলিয়া আর্য্যগণ তাহাদিগকে ভিল্ল নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া আমরা অনুমান করিতেছি; কারণ, ভিল্ল শব্দের অর্থ ধনুক।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ভাইওলিঙ্গেই জাতি বাস করিত। পাণিনি এই জাতিকে ভুলিঙ্গী নামে পরিচিত করিয়াছেন।

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আরণ্য প্রদেশে শবরেই জাতির বাস ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে শবরেই জাতি শবর নামে কথিত হইয়াছে।

উত্তর ভারতের পশ্চিমে রাজপুতানায় পোরৌরোই বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। পোরৌরোই পৌরব শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে পৌরব রাজগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরবগণ যমুনা ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। পরবর্ত্তী কালে এতদপেক্ষা বিস্তৃত স্থানে তাঁহাদের আধিপত্য পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। গ্রীক বীর আলেকজণ্ডারের ভারত আক্রমণ সময়ে মহারাজ পুরু পঞ্জাবের একাংশে আধিপত্য করিতেন। ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পুরু তাঁহার নাম নহে, পরন্তু উপাধিমাত্র ছিল এবং পৌরববংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহার ঐ উপাধি হইয়াছিল। আলেকজণ্ডারের পরবর্ত্তী কালে পৌরবগণ প্রমর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং রাজপুতানায় তাঁহাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

শোণ ও নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-স্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে মন্দলইগণ আধিপত্য করিতেন।

পালিমবোথরায় প্রাসাইকি অথবা প্রাসাইগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কার্টিসিনা, গঙ্গারাঢ়ি এবং তামালতিসে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বিদ্যমান ছিল। তামালতিস বা তাম্রলিপ্তি সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

কিরাদিয়া জাতি লৌহিত্য-তীরবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিত। কিরাদিয়া শব্দের সংস্কৃত কিরাত। পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র নদ লৌহিত্য নামে পরিচিত ছিল।

বৈদেশিক সাহিত্যে ভারতবর্ষ।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষাংশে মিসিয়াদেশে ডিওন নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের অনেক কাল রোম নগরে অতিবাহিত হয়। গুণ-মুগ্ধ জনসাধারণ ডিওনকে খ্রসোসটম অর্থাৎ স্বর্ণ মুখ উপাধি প্রদান করে। কিন্তু তাঁহার ভাষা অতিশয় অলঙ্কার পূর্ণ, বর্ণনা অতিরঞ্জনদুষ্ট। তিনি ভারতবর্ষের বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণ ও তাঁহার অন্যান্য রচনাও বক্তৃতার ন্যায়ই দোষগুণ বিশিষ্ট। আমাদের প্রবন্ধের মুখবন্ধ স্বরূপ তদীয় ভারত বিবরণের মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে।

ডিওন

ভারতীয়গণ অত্যন্ত সুখী। তাহাদের নদীতে জল নাই; একটি স্বচ্ছ সুরাপূর্ণ, অন্যটি মধুপূর্ণ, অন্য একটি তৈল পূর্ণ। এই সকল নদী পৃথিবীর বক্ষঃস্থল স্বরূপ শৈল মালা হইতে বহির্গত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। শক্তি সামর্থ্যে ও আমোদ প্রমোদে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত ভারতবাসীর বহু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে লোক কষ্টসাধ্য ও অপকৃষ্ট উপায়ে সঞ্চয় করিয়া থাকে;—তাহাদিগকে বৃক্ষ হইতে ফল, গোবৎসকে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ ও মধুমক্ষিকার চক্র ভগ্ন করিয়া মধু অপহরণ করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সঞ্চয়-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিশুদ্ধ। ভারতীয় রাজন্যগণ একমাস কাল নদনদী হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল সঞ্চয় করেন। ইহাই রাজকর; অবশিষ্ট একাদশ মাস প্রকৃতি পুঞ্জের সঞ্চয় সময়-রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভারতীয়গণ নদীর উৎস-স্থানে বা তটদেশে পুত্র-কলত্রাদি

ডিওনের ভারত বিবরণ

সহ ক্রীড়া-কৌতুকে কাল যাপন করিতেছে; তাহাদের জীবন যাত্রা প্রণালী চির উৎসব ময়। ভারতবর্ষের নদী সমূহের তীরে সতেজ প্রস্ফুট পদ্মফুল সকল চতুর্দ্দিকের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই সকল পদ্ম অতি সুখাদ্য; অন্যান্য দেশের পদ্মফুলের ন্যায় কেবল গো জাতির আহার্য্য নহে। ভারতবর্ষে একপ্রকার বীজ উৎপন্ন হয়। ইহা গম ও যব অপেক্ষা সুখাদ্য। ইহার খোসা গোলাপফুলের পাপড়ীর ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বৃহৎ ও সুগন্ধ। ভারতবর্ষীয়েরা ইহার ফল মূল উভয়ই আহার করে। এই বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। তাহাদের স্নানের জন্য দুইপ্রকার জলাশয় বিদ্যমান আছে; একপ্রকার জল উষ্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা স্বচ্ছ। অন্যপ্রকার জল গভীরতা ও শীতলতা নিবন্ধন ঘন-নীলাভ। এই সকল জলাশয়ে সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্বরূপ বালক বালিকাগণ একত্র মিলিত হইয়া সন্তরণ করে। তাহারা স্নানান্তে শ্যামল তৃণ-গুল্মাস্তীর্ণ তীরদেশে সমাগত হয়। তৎকালে আনন্দ কোলাহল ও সঙ্গীতালাপের সুস্বর উত্থিত হইয়া চারিদিক মুখরিত করে। এই তীরদেশ তরু পুষ্প-শোভিত ও নয়নাভিরাম; সমগ্র প্রমোদক্ষেত্র তরু শাখা প্রশাখায় সমাচ্ছন্ন, ছায়াশীতল: বৃক্ষ সকল ক্ষুদ্র ও ফলভরে অবনত; ফল সমুদয় অনায়াসে আহরণ যোগ্য। ভারতবর্ষে বিহঙ্গের সংখ্যা বহু; তাহাদের কাকলীতে পর্ব্বতরাজি সর্ব্বদা শব্দায়মান; অন্যান্য দেশের বাদ্যধ্বনি অপেক্ষা ঐ সকল বিহঙ্গের সুমধুর অস্ফুট ধ্বনি অধিক শ্রুতি সুখাবহ; বাতাস মৃদু, গ্রীষ্মের প্রারম্ভকালের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ। আকাশ সুনীল, স্বচ্ছ ও সুন্দর, নক্ষত্ররাজি-পরিশোভিত; অন্য দেশের আকাশ তাদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে। ভারতবর্ষীয়েরা ৪০ বৎসর কাল জীবিত থাকে; (১) তাহারা চির যৌবনশালী, জরা, রোগ ও অভাব

(১) বাগ্মী ডিওন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ভারতবাসীর পরমায়ু ৪০ বৎসর।

তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করেনা। যদিও ভারতীয়গণের সুখ ভোগের সীমা নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ নামক যে এক শ্রেণীর ভারতবাসী দেখা যায়, তাঁহারা স্বদেশবাসীর নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় লোকাতীত শক্তির ধ্যানে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁহারা স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্র সাধনায় নিরত হইয়া বহুবিধ শারীরিক কষ্ট সহ্য করেন; তাঁহাদের তাদৃশ উৎকট কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণ পরম সত্যের অধিকারী হইয়াছেন। এই সত্য একবার আস্বাদন করিলে লোকে সমগ্র সত্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই পরম সত্য অশেষ; তজ্জন্য এই পথের সাধককে চিরকালের জন্য অতৃপ্তভাবে সাধনায় নিযুক্ত থাকিতে হয়।

ডিওন খৃসোসটম কর্ত্তৃক অঙ্কিত ভারতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সুখ সমৃদ্ধির চিত্র অতিরঞ্জন দুষ্ট ও অতি প্রাকৃত বর্ণনায় পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তদীয় ব্রাহ্মণ-চিত্র সত্যানুমোদিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বৈদেশিক আলেখ্য মাত্রেই ভারতীয় ব্রাহ্মণের চিত্র ভাস্বর বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে।

বারদি সানেস (বারদি সানেস সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় রাজদূত সিরিয়া দেশে গমন করেন। বারদি সানেস তাঁহাদের নিকট হইতে

কিন্তু অনেক গ্রীক লেখক ভারতবাসীকে দীর্ঘজীবী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখিতেছি যে, প্যালভিনাসের মতে কোনও কোনও স্থানের ভারতবাসীর জীবন কাল ১৫০ বৎসর ছিল। ফিলষ্ট্র্যাটোস নামক একজন গ্রীক লেখক লিখিয়াছেন যে, তক্ষশীলায় চারি শত বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির বাস ছিল। ডিওনের নির্দ্দেশের ন্যায় ফিলষ্ট্র্যাটোসের এই নির্দ্দেশও সত্য বিরুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

ভারত-তথ্য সঙ্কলন করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।) নামক এক জন লেখক লিখিয়াছেন,--ব্রাহ্মণগণ একবংশজাত; তাঁহারা বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কোনও প্রকার রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য, অথবা রাজার শাসনাধীন নহেন। ব্রাহ্মণকুলে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহাদের অনেকে পর্ব্বতে বাস করেন, অনেকের আবাস বাটী গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। পর্ব্বত-বাসী ব্রাহ্মণগণ গোদুগ্ধ ও ফল মূল দ্বারা জীবন ধারণ করেন। নদীতীরবাসিগণের আহার্য্যও কেবল ফল মূল। তবে ফল মূলের অভাবে তাঁহারা নীবার ধান্য সংগ্রহ করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকার আহার্য্য বস্তু ব্রাহ্মণ সমাজে অপবিত্র ও অধর্ম্ম জনক বলিয়া পরিগণিত। এক এক জন ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এক একটি কুটীর নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহারা এই কুটীরে বাস করিয়া প্রায় সমস্ত অহোরাত্র ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করেন। সমাজে বাস এমন কি, পরস্পরের সাহচর্য্য ও বাক্যালাপও তাঁহাদের অতিশয় অপ্রীতিকর; এই জন্য যদি কোনও কারণ বশতঃ তাঁহাদিগকে সামাজিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়, তবে তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে বাস ও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ব্রাহ্মণগণ অনেক সময় উপবাস করেন।

বারদি সানেস: তৎকর্ত্তৃক অঙ্কিত ব্রাহ্মণ চিত্র।

ক্লিমেনেস আলেকজেণ্ড্রিনাস ও প্যালডিনাস (ক্লিমেনেস খৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর এবং প্যালাডিনাস চারিশত বৎসর পরে ভারতবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।) প্রভৃতি আর কতিপয় বৈদেশিক লেখকও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের সদাচার ও সংযম সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান

ক্লিমেনেস এবং প্যালডিনাস

করিয়া গিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখে বিরত হইলাম। কিন্তু প্যালভিনাস ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে অশ্রুতপূর্ব্ব প্রথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এখানে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার একতীরে এবং ব্রাহ্মণীগণ গঙ্গার অপর তীরে বাস করেন। বর্ষা সমাগমে ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার অপর তীরে উপনীত হন, এবং চল্লিশ দিন কলত্রাদি সহ বাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তাঁহারা পরিণয়ের পর পাঁচ বৎসর বর্ষাকালে ঐ প্রকার গমনাগমন করেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই যদি কোনও ব্রাহ্মণ দুইটি সন্তান লাভ করেন, তবে তিনি তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া কলত্রাদির সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। ব্রাহ্মণ জাতির জনবৃদ্ধি সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; প্রথম, ব্রাহ্মণগণ অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রণালীতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন; দ্বিতীয়, সংযমাচারে তাঁহারা অতিশয় তৎপর।

আমরা যে সময়ের বর্ণনা করিতেছি, তৎকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ, উভয়েই ভারতবর্ষে বাস করিতেন, এবং রাজন্যবৃন্দও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তুল্য রূপে সম্মানিত হইতেন। বারদ সানেস সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন যে, রাজন্যবৃন্দ রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের দ্বারস্থ হইতেন।

বারদ সানেসের গ্রন্থের কিয়দংশ শ্রমণ সম্প্রদায়ের বিবরণে পূর্ণ। আমরা এখানে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।—ব্রাহ্মণগণ এক বংশ সম্ভূত; কিন্তু সকল বর্ণের মুমুক্ষু ব্যক্তিই শ্রমণ শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন। যদি কেহ শ্রমণ শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে গ্রাম্য বা নাগরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থানে তিনি সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ

ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ।

করেন। তাহার পর তিনি মস্তক মুণ্ডন ও শ্রমণকুল-সুলভ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শ্রমণগণের সহিত বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতে তিনি পুত্র কলত্রাদির সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, এবং তাহাদের চিন্তা হইতেও বিরত হন। দেশাধিপতি ঈদৃশ গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেন। ই হর পত্নীর সমস্ত ভার আত্মীয় স্বজনের উপর অর্পিত হয়। শ্রমণগণ নগরের বহির্ভাগে বাস করেন; ধর্ম্মের আলোচনায় তাঁহাদের অহোরাত্র অতিবাহিত হয়। তাঁহারা রাজব্যয়ে নির্ম্মিত মঠে ও মন্দিরে বাস করেন। এই সকল মঠে কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা আশ্রমের জন্য আহার্য্য বস্তু সমুদয় রাজ ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত হন। এই সকল আশ্রমে ঘণ্টাধ্বনি হইলে আগন্তুকগণ প্রস্থান করেন, এবং শ্রমণগণ উপস্থিত হইয়া ধ্যানে নিরত হয়েন। তাঁহাদের ধ্যান পরিসমাপ্ত হইলে দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি হয়। তখন তাঁহারা আহারে উপবেশন করেন। এই সময় ভৃত্যগণ অন্ন পরিবেশন করে। যদি কোনও শ্রমণ একাধিক বস্তু আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে শাক সবজী অথবা ফল দেওয়া হয়। ভোজন ক্রিয়া সমাপ্ত হইবা মাত্র তাঁহারা পুনর্ব্বার শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত হন। শ্রমণগণের পক্ষে বিবাহ অথবা ধনার্জ্জন নিষিদ্ধ।

শ্রমণগণ সম্বন্ধীয় এই বিবরণের পর বার্দি সানেস ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের পারলৌকিক বিশ্বাস কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের পারলৌকিক বিশ্বাস

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের জীবন দীর্ঘ বলিয়া তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন; জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহাদের সংশয় না থাকিলেও, তাঁহারা উহা প্রকৃতিদত্ত ভারস্বরূপ বিবেচনা করেন। এইজন্য ব্রাহ্মণ ও

শ্রমণগণ দেহ হইতে আত্মার মুক্তি সাধন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন। অনেক সময় সুস্থ ও নিরাপদ ব্যক্তিও জীবন শেষ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আপনার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তদীয় আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে এই সংকল্প হইতে প্রতিনির্ব্বৃত্ত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রকার যত্ন করেন না; বরং তাঁহাকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং পরলোকগত আত্মীয় স্বজন বর্গের নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য নানা সংবাদ বলিয়া দেন; ফলতঃ, দেহ পরিত্যাগের পর আত্মার যোগাযোগ হয়, এইরূপ তাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। পরলোকে জ্ঞাপন করিবার জন্য সংবাদাদি প্রদত্ত হইলে সংকল্পারূঢ় ব্যক্তি পবিত্রভাবে দেহান্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রজ্বলিত চিতা মধ্যে প্রবিষ্ট হন, এবং সমাগত জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। আমাদের দেশের লোক আত্মীয় স্বজনের অদূরবর্ত্তী বিদেশ গমনে যেরূপ দুঃখিত হয়, মৃত্যুও ভারত-বাসীকে ততদূর ব্যথিত করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে যাঁহারা অমরত্বের অধিকারী হয়েন, ভারত-বাসীরা তাঁহাদিগকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করেন। ভারতবর্ষে অদ্যাপি এরূপ কোনও তার্কিকের আবির্ভাব হয় নাই, যিনি গ্রীক তার্কিকের (Sophist) ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "যদি প্রত্যেকেই এই ভাবে দেহান্ত করেন, তবে সৃষ্টির কি হইবে?" পম্পিনিয়ান নামক একজন গ্রীক লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—বৃদ্ধাবস্থায় বা পীড়া উপস্থিত হইলে ভারতীয়গণ লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া নিরুদ্বেগচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা গৌরবলাভেচ্ছু হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা না করিয়া অনন্ত কুণ্ডে জীবনাহুতি দেন।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ গণের বৃত্তান্ত হইতে আমরা তাঁহাদের যাজ্য ধর্ম্ম-

তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। শ্রমণগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আদিকালে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্র পাঠ ও যজ্ঞ করিতেন। কিন্তু দেব দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিবার প্রথা ছিল না; পরে ক্রমশঃ দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের ধর্ম্ম বিশ্বাস; মূর্ত্তি পূজা

আমরা জোহান নিস ষ্টৌবস নামক একজন গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদীয় গ্রন্থে শিব-পার্ব্বতীর অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি। মহারাষ্ট্রদেশে সমুচ্চ পর্ব্বতগাত্রে একটি গুহা বিদ্যমান আছে। এই গুহায় দশ কি দ্বাদশ হস্ত পরিমিত একটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। সে মূর্ত্তির হস্তযুগল অনুপ্রস্থভাবে সংন্যস্ত। ইহার দক্ষিণাঙ্গে নরমূর্ত্তি, বামাঙ্গে নারীমূর্ত্তি। একাধারে নরনারীমূর্ত্তি দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করে; দুইটি বিসদৃশ মূর্ত্তি একাধারে অভেদ্য ভাবে গঠিত হইয়াছে। এই অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির দক্ষিণ নেত্রে সূর্য্য ও বাম নেত্রে চন্দ্র অঙ্কিত; দুই বাহুতে নানা দেবদেবী, আকাশ, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, মহাসমুদ্র ও জীব জন্তু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের চিত্র অঙ্কিত। ভারতীয়গণের বিশ্বাস এই যে, সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের আদর্শ স্বরূপ এই মূর্ত্তি স্বীয় পুত্রকে অর্পণ করেন। এই মূর্ত্তি কি কি উপাদানে গঠিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। একদা একজন নরপতি এই মূর্ত্তির এক গুচ্ছ কেশ উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রবল বেগে রক্তপাত হইতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজা ভয়ে অভিভূত ও মূর্চ্ছিত হন। ব্রাহ্মণগণ যথাশক্তি পূজা অর্চ্চনা

করিয়াও আর তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। অর্দ্ধনারী-শ্বর মূর্ত্তির মস্তকের উপর সিংহাসনে আর একটি দেব মূর্ত্তি স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এই মূর্ত্তির অঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণগণ পাখার দ্বারা বাতাস না করিলে ঐ ঘর্ম্মে ভূমিতল পর্য্যন্ত সিক্ত হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে, তৎকালে দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা অর্চ্চনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই সাকার উপাসনা ও বর্ণভেদ প্রথা ভারতবর্ষের অন্যতম বিশেষত্ব বলিয়া পরিগণিত ছিল। হিন্দুজাতি প্রধানতঃ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত ছিল। বৈশ্য সামাজিক মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা হীন ছিলেন। এ সম্বন্ধে ডিওন খৃসোসটম্ লিখিয়াছেন;—আমি ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সমুদ্রতীরবাসীদিগের সহিত বাণিজ্যার্থ ভারতীয় বণিকগণ আগমন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই জাতীয় লোকের প্রতিষ্ঠা বা সম্ভ্রম নাই; ভারতীয়গণ তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে।

চতুর্ব্বর্ণ; বিদেশগামী ভারত বণিক

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কসমস নামক একজন গ্রীক লেখক খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কসমসের উপাধি ছিল, ইণ্ডিকো প্লিসটিস। এই শব্দের অর্থ, ভারতীয় নাবিক। কসমস বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। সম্ভবতঃ তদুপলক্ষেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কসমস একস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন,—সিংহল দ্বীপের বন্দরে ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ সমূহ হইতে অর্ণবপোত আগত হয়।

কসমস, ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিবরণ

সিংহলবাসী বণিকগণও পৃথিবীর নানা স্থানে অর্ণব পোত প্রেরণ করিয়া থাকেন। চীন ও অন্যান্য দেশ হইতে সিংহল দ্বীপে মুসব্বর, চন্দন কাষ্ঠ, রেশম, লবঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ পণ্যের আমদানী হয়। সিংহলের বণিকগণ এই সমুদয় দ্রব্য ভারতবর্ষের মালাবার, কাল্লিয়ান (বোম্বাই নগরের নিকটবর্ত্তী কল্যাণের প্রাচীন নাম।) ও সিন্ধু প্রদেশে প্রেরণ করেন। এই সকল পণ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহারা মালাবার হইতে গোলমরিচ, কাল্লিয়ান হইতে তাম্র, পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার জন্য বস্ত্র ও তিল শস্য, এবং সিন্ধু প্রদেশ হইতে মৃগনাভি কস্তুরী ও রেড়ীর তৈল আনয়ন করিয়া থাকেন। সিন্ধু (সিন্ধু প্রদেশের নগর।) সৌরাষ্ট্র (সৌরাষ্ট্র প্রদেশের নগর) কাল্লিয়ান, সিবর (সম্ভবতঃ চৌল; এই নগর বোম্বাই হইতে দক্ষিণ দিকে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত।) মালাবারস্থিত নগর সমূহ (ইহার সংখ্যা পাঁচ—পারতি, ম্যাঙ্গারৌথ [ম্যাঙ্গালোর], সালোপত্তন, নল পত্তন, পৌদপত্তন। পত্তন শব্দের অর্থ,—নগর) বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল রূপে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত সমুদ্র উপকূলে ও অন্তঃপ্রদেশে বহু সংখ্যক বাণিজ্য নগর বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষ সুবৃহৎ দেশ।

ধর্ম্মবিষয়ে ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের উদারতা; খৃষ্ট ধর্ম্ম

বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ হইতে নানা ধর্ম্মাবলম্বী বণিকগণ ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন। উদার স্বভাব রাজন্য গণের অনুমতি ক্রমে তাঁহারা ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য স্থানে স্থানে স্বধর্ম্মানুগত উপাসনালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। কসমস লিখিয়াছেন,—মালাবারে একটি গির্জ্জাঘর বিদ্যমান ছিল, এবং কাল্লিয়ানে একজন পাদ্রী বাস করিতেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের পরিচয় ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দার একখানি গ্রন্থপাঠে জানা যায়, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাণ্টাইনস নামক একজন দার্শনিকের আবির্ভাব

হইয়াছিল। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মের বিস্তারের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন, এবং ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে উপনীত হন। পাণ্ডাইনস ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া দেখেন যে, তৎপূর্ব্বেই মথি-লিখিত সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, এবং কতিপয় ভারতবাসী যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

জোহানেস ষ্টোবসের গ্রন্থে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষ, তাহা অবধারণ করিবার এক অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ আছে। বারদি সানেসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া জোহানেস লিখিয়াছেন,—কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিলে, তাহাকে পদব্রজে একটি জলাশয় অতিক্রম করিতে হয়। এই জলাশয়ের গভীরতা মানুষের জানুর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক নহে; যদি ঐ ব্যক্তি যথার্থই নির্দ্দোষ হয়, তবে সে নিরাপদে ঐ জলাশয় অতিক্রম করিতে পারে; কেবল জানু পর্য্যন্ত জলে সিক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দোষী হইলে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র তাহার মস্তক পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া ইচ্ছামত দণ্ড দিবার জন্য অভিযোগকারীর হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু প্রাণ দণ্ড দিবার নিয়ম নাই।

জোহানেস ষ্টোবস, বিচার প্রণালী

ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

চৈনিক পরিব্রাজক বৃন্দের ভ্রমণ বৃত্তান্ত

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার সহিত বুদ্ধদেবের লীলাভূমির পবিত্র তীর্থ সমূহ দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, বহু বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে আপনাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রকাশে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ আলোকিত হইয়াছে। আমরা উহা পাঠ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তিনশত বৎসরের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিজ্ঞাত হইতে পারি। ফলতঃ,চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সর্ব্বথা আলোচনার যোগ্য। অদ্যাবধি ন্যূনাধিক ৪৫ জন চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ফাহিয়ান চীন দেশের শান্সীনামক প্রদেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন।

ফাহিয়ান

তাঁহার প্রকৃত নাম কুঙ্গ। তদীয় পিতা শৈশবেই তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধমঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসর বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এবং সেই সময়ে ফাহিয়ান নাম ও 'সি' উপাধি গ্রহণ করেন। 'সি' শব্দের অর্থ শাক্য-পুত্র।

ফাহিয়ান একরূপ আজন্ম সন্ন্যাসী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ও বুদ্ধদেবের জন্মভূমি দর্শনাভিলাষ প্রবল হইয়া উঠে। তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনয় পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ ও পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ সমূহ দর্শন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন।

ফাহিয়ানের সংকল্পের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া কতিপয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী তাঁহার সহযাত্রী হইবার সঙ্কল্প করেন। ফাহিয়ান তাঁহাদের সমভিব্যাহারে খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রীদল চীন সাম্রাজ্যের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গম মরুপথে অগ্রসর হন, এবং সপ্তদশ দিবস লোকালয়শূন্য পথে অতিবাহিত করিয়া, সেন-সেন (আধুনিক লিওনান) নামক দেশে আগমন করেন। একমাস কাল বিশ্রামান্তে ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ সেন-সেন দেশ পরিত্যাগ করেন, এবং পঞ্চদশ দিবস পর্য্যটন করিয়া টেঙ্গিস হ্রদের নিকটবর্ত্তী উকি (কার সহর) নামক দেশে উপনীত হন। তারপর তাঁহারা উকি দেশ হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ—পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, এবং দুর্গম পথ অতিক্রম পূর্ব্বক একমাস পাঁচ দিবসে সেটান নামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থানে ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ বিশ্রামার্থ তিন মাসের অধিক অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁহারা পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যটন করিয়া ইয়ারকন্দে উপস্থিত হন। ইয়ারকন্দে একপক্ষ বিশ্রাম করিয়া যাত্রীদল সুঙ্গলিঙ্গ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পঞ্চ বিংশতি দিবস পর্য্যটনের পর কিয়েশা দেশে উপস্থিত হন।

ফাহিয়ানের ভারত যাত্রা

এই স্থান হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। তৎকালে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও তুর্কিস্থানের কিয়দংশ ভারতবর্ষের সীমাভুক্ত ছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে সিন্ধুনদের পশ্চিম ভাগে বহু হিন্দু রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জনপদের মধ্যে টোলি (১), উদ্যান (২), গান্ধার

ভারত সীমাভুক্ত প্রদেশ সমূহ

(১) সিন্ধুনদের পশ্চিমদিকস্থিত দারিয়ান নদী ধৌত উপত্যকা ভূমি।

(২) বর্ত্তমান সোয়াত প্রদেশ।

(৩), পুরুষপুর (৪), এবং নগরহার (৫), সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ; তাহাদের নাম অদ্যাপি পরিচিত রহিয়াছে।

স্বদেশ পরিত্যাগের ন্যূনাধিক সাত মাস পরে ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। এই সাতমাস কাল তাঁহাদিগকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। জনশূন্য মরুস্থল, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বতমালা ও বেগবতী পার্ব্বত্যনদী পদে পদে তাঁহাদের পথরোধ করিত। অপরিচিত দেশের অপরিচিত অধিবাসীর ব্যবহারে অনেক সময় তাঁহাদের জীবন পর্য্যন্ত বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিত ; কিন্তু তাঁহারা সমস্ত বাধা বিঘ্নে অবিচলিত থাকিয়া, কখনও সাধুচরিত্র লোকের আতিথ্যে তৃপ্তিলাভ করিয়া, কখনও কটু কষায় বন্য ফলমূলে উদরপূর্ত্তি করিয়া, কখনও নিরম্বু উপবাস করিয়া, জ্ঞান ও পুণ্যলাভার্থ ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ মধ্য-এসিয়ার পথে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় সমগ্র মধ্য এসিয়ায় অর্থাৎ চীনের পশ্চিম সীমা হইতে কাম্পিয়ান হ্রদের উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তৃত ছিল। আমাদের যাত্রীদল এই ভূভাগে বহু সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জনপদ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। এই সকল জনপদ হইতেই তাঁহারা প্রথমে ভারতীয় সভ্যতার আভাস প্রাপ্ত হন। তদ্দেশবাসীরা আচার ব্যবহারে চৈনিক জাতির সদৃশ, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। ফলতঃ, তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সমগ্র মধ্য-এসিয়া জ্ঞানধর্ম্মে, শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্যএসিয়ার অবস্থা

(৩) বর্ত্তমান কান্দাহার।

(৪) বর্ত্তমান পেশওয়ার।

(৫) বর্ত্তমান জালালাবাদ জেলা।

যাহা হউক, ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ মধ্য-এসিয়া অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতে সিন্ধু-নদের তীরে আগমন করিলে, ফাহিয়ানের সহযাত্রিগণ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হন। অতঃপর তিনি একাকী সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইয়া বহুপথ পর্য্যটন পূর্ব্বক যমুনার তীরবর্ত্তী চিরখ্যাত মথুরা নগরে আগমন করেন।

ফাহিয়ানের ভারত প্রবেশ

ফাহিয়ান ভারতবর্ষের বহু নগর ও বৌদ্ধ তীর্থ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবরণের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধকাহিনী ও বৌদ্ধকীর্ত্তির কথায় পূর্ণ। কিন্তু তৎসত্বেও ঐ সমস্ত পাঠ করিয়া সে সময়ের ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য এখানে ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

মথুরা ;—মথুরার পার্শ্ববর্ত্তিনী যমুনা নদীর দুই তীরেই সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এইরূপ সঙ্ঘারামের সংখ্যা বিংশতি। তাহাতে তিন সহস্র শ্রমণ বাস করেন। বৌদ্ধ বিধানের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। মথুরার নিকটবর্ত্তী মরুভূমির পশ্চিম সীমান্তে পশ্চিমভারত। এই দেশের রাজন্যকুল বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। শ্রমণদিগকে দান করিবার সময় তাঁহারা রাজ মুকুট পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। রাজবৃন্দের আত্মীয় স্বজন ও মন্ত্রিগণই অন্নদানের ব্যবস্থা করেন। অন্নদান শেষ হইলে, তাঁহারা প্রধান শ্রমণের সম্মুখে গালিচা পাতিয়া উপবেশন করেন। তাঁহারা কখনও শ্রমণগণের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন না। রাজগণ কর্ত্তৃক ভিক্ষাদানের নিয়মাবলী বুদ্ধদেবের সময় হইতে চলিয়া আসি-

মথুরা

তেছে। মথুরার দক্ষিণদেশে মধ্যদেশ। মধ্যদেশ বার মাস উষ্ণ প্রধান; এখানে বরফ বা তুষার দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতি পুঞ্জের অবস্থা স্বচ্ছল; তাঁহাদিগকে লোকসংখ্যানুযায়ী কর, ভূমিকর দিতে হয় না; কেবল যাহারা রাজভূমি কর্ষণ করে, তাহাদিগকে লাভের কিয়দংশ প্রদান করিতে হয়। গমনাগমন সম্বন্ধে প্রকৃতি পুঞ্জের স্বাধীনতা আছে। কোনও অপরাধীকেই শারীরিক শাস্তি ভোগ করিতে হয় না; রাজন্যবৃন্দ অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অল্পাধিক অর্থ দণ্ড করিয়া থাকেন। এমন কি, কেহ পুনঃপুনঃ রাজদ্রোহী হইলেও কেবল তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলা হয়। রাজরক্ষীরা নির্দিষ্ট হারে বেতন পাইয়া থাকে। এই দেশে প্রাণিহত্যা নাই; লোক সমূহ মদ্য, মাংস, অথবা পেঁয়াজ রশুন ব্যবহার করেনা। কেবল চণ্ডালেরা এই সকল দ্রব্যে অভ্যস্ত। চণ্ডালদের অন্য নাম 'বদলোক'; তাহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করে যদি তাহারা কখনও নগরে বা বাজারে প্রবেশ করে, তবে সঙ্গে একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া যায়; এই হেতু জনসাধারণ তাহাদিগকে দেখিয়াই চণ্ডাল বলিয়া চিনিতে পারে, এবং তাহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে। এই দেশের লোকে হাঁস অথবা মুরগী পালন করে না; তাহাদের মধ্যে গরুর ব্যবসায়ও প্রচলিত নাই। হাট বাজারে কশাই খানা ও মদের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল চণ্ডালেরা মৃগয়া লিপ্ত হয়, এবং মাংস বিক্রয় করে। আদান প্রদান কালে কাঁড় ব্যবহৃত হয় এই দেশের রাজন্যবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকল ও নাগরিকগণ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর হইতে শ্রমণবর্গের জন্য বিহার নির্ম্মাণ ও তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য ভূমি, গৃহ ও উদ্যান দান করিয়া আসিতেছেন। এক রাজার পর আর এক রাজা তজ্জন্য তাম্রলিপি দান করিয়া থাকেন; এই কারণে কেহ সে সমুদয় বাজেয়াপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুবর্গ নিরুপদ্রবে ঐ সমস্ত

ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বিহার সমূহে প্রত্যেক শ্রমণের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে, এই সকল স্থানে তাঁহারা লোকহিতসাধন, শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যানে নিরত থাকেন।

কনৌজ

কনৌজ ;—এই নগর (১) গঙ্গার তীরে অবস্থিত। কনৌজে দুইটি মাত্র সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। সেখানে হীনযান মতাবলম্বী শ্রমণগণ বাস করেন। কনৌজের অনতিদূরে পশ্চিম দিকে একটি স্থানে বুদ্ধদেবের শুভাগমন হইয়াছিল। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবৃন্দের হিতকল্পে মানব জীবনের নশ্বরতা ও দুঃখ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তদীয় শিষ্যগণ এই ঘটনার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ কনৌজে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে।

শ্রাবস্তী

শ্রাবস্তী ;—শ্রাবস্তী (২) কোশল রাজ্যের রাজধানী। এই চিরখ্যাত নগরীর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নগরে লোক সংখ্যা নগণ্য; সর্ব্বসাকল্যে দুই শত পরিবার মাত্র বাস করিতেছে। এই নগরীতে একদা প্রসেনজিৎ রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে বহু বৌদ্ধকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া ঐ সকল

---

(১) প্রাচীন ভারতের ভূগোল নামক গ্রন্থের রচয়িতা কনিংহাম লিখিয়াছেন, ঘাগরা নদীর তীরবর্ত্তী গৈরাবাদ হইতে তাপ্তা ও যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী এটোয়া হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত কনৌজ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কনৌজ রাজ্য চক্রাকারে ৬০০ মাইল ছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নামও ছিল কনৌজ। হিউএন্ থ্ সঙ্গ লিখিয়াছেন যে, কনৌজ দৈর্ঘ্যে ৩½ মাইল ও প্রস্থে ¾ মাইল ছিল।

(২) শ্রাবস্তী অযোধ্যার অন্তর্গত রাপ্তি নদীর তীরস্থিত বলরামপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পুরাকালে শ্রাবস্তী যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার বর্ত্তমান নাম সাহেত মাহেত।

কীর্ত্তি-মন্দির দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, বজ্র ও বিদ্যুৎপাত আরম্ভ হয়; এই কারণে তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। শ্রাবস্তী নগর হইতে অনতিদূরে দক্ষিণদিকে সুদত্ত একটি সপ্ততল বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিহারের পার্শ্বে নির্ম্মল সলিল তড়াগ সমূহে, চির-হরিত তরুপূর্ণ বনরাজি ও বিচিত্রবর্ণ অসংখ্য পুষ্পশোভিত উদ্যান মালা পরিদৃষ্ট হয়। ইহার নাম জেতবন। এই স্থানে মানব জাতির উদ্ধারকর্ত্তা পঞ্চবিংশতি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের রাজন্যবৃন্দ এই জেতবনে ধর্ম্মার্থ দান করিয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই দান লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। সমস্ত রাত্রি জেতবন উজ্জ্বল দীপ মালায় আলোকিত থাকিত। একবার একটি মূষিক প্রজ্বলিত শলিতা মুখে করিয়া চন্দ্রাতপের উপর নিক্ষেপ করে; তাহার ফলে সপ্ততল বিহার ভস্মীভূত হয়। এই বিহারের অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত আদিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। (১) এই জন্য জেতবনের ধ্বংস-সংবাদে সমগ্র দেশে বিষাদের ঘনচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু ৪। ৫ দিন পরে জেতবনের একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের আদি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাতে সর্ব্বত্র বিপুল আনন্দধ্বনি উঠে। অচিরে দ্বিতল বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) বৌদ্ধ ইতিহাসে এইরূপ কথিত আছে যে, একদা বুদ্ধদেব জেত-বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় মাতার নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য স্বর্গে গমন করেন। রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া তাঁহার চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধদেব প্রত্যাগত হইলে ঐ দারু মূর্ত্তি সচল হইয়া অন্যত্র গমন করিতে উদ্যত হয়। তখন বুদ্ধদেব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, এখানে স্থির থাক; উত্তরকালে শিষ্যগণ তোমার আদর্শে আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে।

কপিল বস্তু,—এই নগরে (১) রাজা বা প্রজা, কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সমগ্র নগর একটি বৃহৎ মরুস্থলীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এখানে একদল শ্রমণ বাস করিতেছেন, তদ্ব্যতীত দশ ঘর গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ শুদ্ধোদনের ভগ্ন-প্রাসাদের অভ্যন্তরে এক খানি চিত্র বিলম্বিত আছে। এই চিত্রে বুদ্ধদেবের মাতার মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে; তাহার পার্শ্বে শ্বেত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বুদ্ধদেব মাতার উদরে প্রবেশ করিতেছেন! কপিলবস্তু নগরে বুদ্ধদেবের জীবনের বহু ঘটনার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ স্তূপ সমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু সমস্তই জনমানব শূন্য। সমগ্র নগর পরিত্যক্ত পুরীর ন্যায় মনে হয়। পথে অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কপিলবস্তুবাসীরা সিংহ ও শ্বেত হস্তীর ভয়ে কদাচিৎ গৃহের বাহির হয়।

কপিল বস্তু

কুশী নগর;—এই স্থানে (২) হিরণ্যবতী নদীর তীরে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এখানে বুদ্ধদেবের অন্তিম কালের নানা ঘটনার চিহ্ন স্বরূপ স্তূপ সমূহ বিদ্যমান আছে। কপিলবস্তুর ন্যায় কুশীনগরের জনসংখ্যাও অত্যল্প। এখানে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা শ্রমণ-সম্প্রদায়ের সহিত সংসৃষ্ট।

কুশী নগর

---

(১) উত্তর অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত চণ্ডতাল নামক নদীর তীরে নগর নামক স্থানে কপিল বস্তু অবস্থিত ছিল, কনিংহাম এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

(২) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী কাশিয়া নামক স্থানে কুশীনগর অবস্থিত ছিল।

বৈশালী ;— বৈশালীর (১) উত্তর ভাগে মহাবন নামক বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে। বুদ্ধদেব এই বিহারে অবস্থিতি করিতেন।

বৈশালী

অম্বপালি নামক একজন বারনারী বৈশালীতে বুদ্ধদেবের বাসের জন্য একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পূর্ব্বে বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন ; তিনি আপনার নির্ব্বাণ কাল আসন্ন জানিতে পারিয়া বৈশালী নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুশী নগরের অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বৈশালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন. ঐস্থানে আমার পার্থিব জীবনের বিশেষ ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি। লিচ্ছবিরা বুদ্ধদেবের অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া বুদ্ধদেবের সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রবল অনুরাগ-বশতঃ বুদ্ধদেবের অনুসরণ করিতে থাকেন। বুদ্ধদেব হঠাৎ একটি নদীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দেন, এবং তাঁহাদের ক্ষুব্ধচিত্ত শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে আপনার ভিক্ষাপাত্র অর্পণ করেন। প্রাগুক্ত ঘটনা দুইটির সাক্ষি স্বরূপ তত্তৎ স্থলে সুগঠিত স্তূপ বিদ্যমান। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির একশত বৎসর পরে বৈশালীর কতিপয় ভিক্ষু বিনয় পিটকের নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করিয়া স্ব স্ব অভিরুচি অনুসারে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কেহ তাঁহাদের আচরণের

(১) বৈশালী লিচ্ছবিগণের রাজধানী ছিল ইহারা খৃষ্টের জন্মের কিঞ্চিদধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-এসিয়া হইতে হিমালয়ের পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং মিথিলায় এক পরাক্রান্ত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। লিচ্ছবিরা বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কনিংহাম বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী বেসাড় নামক স্থান প্রাচীন বৈশালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; বৈশালী বৌদ্ধ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা বলিতেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারেই আমাদের আচার ব্যবহার নিয়মিত হইতেছে। এই জন্য সাত শত অর্হৎ ও ভিক্ষু বৈশালীতে সমবেত হইয়া বিনয় পিটকের সূত্র সকল নির্দ্ধারিত করেন।

পাটলীপুত্র ;—পাটলীপুত্র মহারাজ অশোকের রাজধানী ছিল। পাটলীপুত্র মগধের প্রধান নগর। অশোকের আদেশ ক্রমে অধি-দেবতাবর্গ প্রস্তররাশি সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; ইহার প্রাচীর, তোরণ, মর্ম্মর মূর্ত্তি, কিছুই মানব হস্ত নির্ম্মিত নহে। অশোকের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। মহারাজ অশোকের স্তূপের পার্শ্বেই মহাযান সম্প্রদায়ের একটি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায় ; এই সঙ্ঘারাম সুদৃশ্য ও মনোরম। পাটলীপুত্রে হীনযান সম্প্রদায়ের বিহারও প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দুই বিহারে ছয় সাত শত শ্রমণ বাস করেন ; তাঁহাদের আচার ব্যবহার শীলতাপূর্ণ ও সুব্যবস্থিত। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সৌগতগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন ; জ্ঞানান্বেষী শ্রমণ ও ছাত্রগণ অত্রত্য বিহারে শিক্ষার্থীর বেশে উপনীত হন। মধ্যভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা মগধের নগর সমূহই বৃহৎ। জনসাধারণ ধনী ও উন্নতিশীল ; তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও ন্যায়বাদী। প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মঞ্জুশ্রী এই নগরের মহাযান সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারামে বাস কারতেছেন ; শ্রমণ ও ভিক্ষু মাত্রই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। প্রতিবৎসর দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে দেবমূর্ত্তির অভিযান হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে নগরবাসীরা বংশদণ্ড দ্বারা চতুশ্চক্র পঞ্চতল রথ নির্ম্মাণ কারয়া তাহা বিচিত্রবর্ণ বস্ত্রে সজ্জিত করে। তাহার পর তাহারা নানাপ্রকার দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্ফটিক আভরণে

পাটলীপুত্র

ভূষিত করিয়া, রথের অভ্যন্তরে কারুকার্য্য-খচিত চন্দ্রাতপতলে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং রথের চারিকোণে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি উপবিষ্ট ভাবে স্থাপিত করে। অন্যূন বিশখানি রথ এই প্রণালীতে নির্ম্মিত ও নানা ভাবে সজ্জিত হইয়া থাকে। অভিযানের দিন বিপুল জন সমাগম হয়; শ্রমণ ও গৃহস্থ—সকলেই উৎসবে যোগদান করে। নানা প্রকার ক্রীড়া ও সঙ্গীত দ্বারা সমাগত জনমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময়ে গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ অর্পণ করিবার নিয়ম আছে। ব্রহ্মচারিগণ নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আগমন করেন। অতঃপর রথসমূহ একে একে নগর মধ্যে আনীত হয়। নগরবাসীরা সমস্তরাত্রি স্বস্ব গৃহ দীপমালায় উজ্জ্বল রাখে, এবং ক্রীড়া কৌতুক, গান বাদ্য ও ধর্ম্ম কার্য্যে নিশি যাপন করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ ও গৃহস্থগণ পাটলীপুত্র নগরের স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এই সকল চিকিৎসালয়ে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দরিদ্র, অনাথ, বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন লোক সমূহ আশ্রয় লাভ করে। তাহারা এখানে বিনাব্যয়ে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হন। চিকিৎসকগণ সবিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহাদের ব্যাধি পরীক্ষা করিয়া আবশ্যক মত ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়া আপনাদের সুবিধা মত যথাস্থানে প্রস্থান করে।

রাজগৃহ;—রাজগৃহ দুই ভাগে বিভক্ত,—নূতন ও পুরাতন। মহারাজ অজাতশত্রু নূতন রাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বর্ত্তমান সময়ে দুইটি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন রাজগৃহের দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ দূরে পুরাতন রাজগৃহ। মহারাজ বিম্বিসারের রাজত্বকালে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পাঁচটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত পুরাতন রাজগৃহকে প্রাচীরের ন্যায়

রাজগৃহ

বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবনের অনেক কাহিনী পুরাতন রাজগৃহের সহিত সংস্পৃষ্ট। তৎসমুদয়ের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ এখানে বহু স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন সমস্ত ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে; সমস্ত রাজগৃহ জনমানব শূন্য। রাজগৃহের আড়াই মাইল দূরে গৃধ্রকূট নামক পর্ব্বত শৃঙ্গ। তদুপরি বুদ্ধদেব সামাধি মগ্ন থাকিতেন।

গয়া;—গয়ার অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত নগর লোক পরিত্যক্ত মরুস্থলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। গয়া হইতে দক্ষিণদিকে সাড়ে তিন মাইল দূরে বুদ্ধগয়া। এই স্থানে বোধিসত্ত্ব ছয় বৎসর কাল সমাধি মগ্ন ছিলেন। ইহার এক

গয়া

মাইল দূরে (নৈরঞ্জন) নদীতটে তিনি (সুজাতা নাম্নী) রমণীর প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণ করেন। এই নদীতট হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন এক মাইল দূরে এক সুবিশাল বটবৃক্ষ মূলে শাক্যসিংহ ঐ পায়সান্ন ভোজন করেন, এবং তাহার পর সমাধিস্থ হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। মধ্য-ভারতবর্ষের শীতোষ্ণতা এরূপ সমতাপন্ন যে, তত্রত্য বৃক্ষ প্রভৃতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। এই কারণে ঐ বোধি-দ্রুম অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকথিত স্থান সমূহে বৌদ্ধ ধর্ম্মা-বলম্বিগণ মঠনির্ম্মাণ পূর্ব্বক বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল মঠ ও মূর্ত্তি এখনও পরিদৃষ্ট হয়। বোধিদ্রুমের নিকট তিনটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান; তথায় শ্রমণগণ বাস করেন। ইঁহারা বৌদ্ধ সঙ্ঘ-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে স্থানে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ; এই মহাতীর্থ চতুষ্টয়ের বৌদ্ধমন্দির প্রথমাবধি এক সঙ্গে জড়িত হইয়াছে।

বারাণসী ;—কাশী প্রদেশ ও বারাণসী নগরী গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। বারাণসীর কিঞ্চিদধিক তিন মাইল দূরে মৃগদাব নামক উদ্যান। এই স্থানে বুদ্ধদেব আপনার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন; মৃগদাব উদ্যানে দুইটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে; তথায় শ্রমণগণ বাস করিতেছেন। মৃগদাবে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন-সম্পর্কীয় তিনটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

বারাণসী

কৌশাম্বী ;—মৃগদাবের ত্রয়োদশ যোজন দূরে কৌশাম্বী নগরী। (১) এই স্থানে একটি প্রখ্যাত বিহার বিদ্যমান ছিল; তথায় বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাহার ভগ্নস্তূপ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

কৌশাম্বী

চম্পা।—চম্পা একটি বৃহৎ রাজ্য; (২) ইহা গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বুদ্ধদেব কিয়দ্দিবস এই রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন।

চম্পা

তাম্রলিপ্তি।—তাম্রলিপ্তি সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এই রাজ্যে চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এই দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল।

তাম্রলিপ্তি

তাম্রলিপ্তিতেই ফাহিয়ানের ভারত-ভ্রমণ শেষ হইয়াছিল। বৌদ্ধতীর্থ সকল দর্শন ও বিনয় পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ তাঁহার ভারতাগমনের উদ্দেশ্য ছিল। ফাহিয়ান পাটলীপুত্র নগরে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহার সংগৃহীত বিনয় পিটক গ্রন্থখানি এক সময়ে শ্রাবস্তীর জেতবনে অধীত হইত। বিনয়

(১) কৌশাম্বী যমুনা নদীর তীরে এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী।

(২) বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা লইয়া প্রাচীন চম্পা রাজ্য গঠিত ছিল। ইহার রাজধানীর নামও চম্পা ছিল। বর্ত্তমান ভাগলপুর সহরের ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী পাথর কাটা প্রাচীন চম্পা নগরী।

পিটক ব্যতীত অন্যান্য বহু শাস্ত্র তিনি পাটলীপুত্র নগর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান এই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন ও তাহাদের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। চিত্র অঙ্কনের জন্য তিনি তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর বাস করেন।

ফাহিয়ানের ভারত ত্যাগ

অতঃপর ফাহিয়ান বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা তাম্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণ পশ্চিম আস্তে অগ্রসর হইয়া শীতকালের অনুকূল বায়ু মুখে দুই সপ্তাহ দিবারাত্রি পোত পরিচালন পূর্ব্বক সিংহল দ্বীপে উপনীত হন।

ফাহিয়ান লিখিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে সিংহল লোক শূন্য ছিল। কিন্তু বণিকগণ বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রকারে সিংহলে সুবৃহৎ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর বৌদ্ধগণ আগমন করিয়া সিংহলবাসীদিগকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সিংহল প্রকৃতির রমণীয় লীলাস্থল, বৌদ্ধকীর্ত্তি পূর্ণ। কিন্তু ফাহিয়ান এখানে আসিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই ব্যাকুল অবস্থায় তিনি একদা একটি বৌদ্ধ মন্দিরে একখানি চৈনিক-পাখা দেখিয়া জন্মভূমির জন্য দুঃখে কাতর হইয়া পড়েন, তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হয়।

ভারত চীনের সমুদ্র পথ।

যাহা হউক, ফাহিয়ান সিংহলে দুই বৎসর যাপন করিয়া ও বিনয়পিটক প্রভৃতি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, বাণিজ্য পোতে আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই জাহাজে দুই শত আরোহী ছিল। পথি মধ্যে প্রবল ঝটিকা উঠে; প্রবল বাত্যায় জাহাজের একস্থান ভাঙ্গিয়া যায়, এবং, বহু পণ্যদ্রব্য সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়। ফাহিয়ানও আপনার জলপাত্র প্রভৃতি ফেলিয়া দেন। বণিকগণ তাঁহার গ্রন্থ ও

চিত্র সমূহ জলে ফেলিয়া দিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। একাদশ দিবস পরে ঝটিকা থামিয়া যায়, এবং যাত্রিগণ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পঁহুছিয়া জাহাজের ভগ্নস্থান সংস্কার করেন। অতঃপর তাঁহারা পুনর্ব্বার সমুদ্রপথে পোত পরিচালনে প্রবৃত্ত হন। এই সমুদ্র জলদস্যু পূর্ণ ছিল। তাহারা হঠাৎ জাহাজের উপর পতিত হইয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এই অকুল সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিবার কোনও উপায় ছিলনা; কেবল চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম নির্ণয় পূর্ব্বক পোত পরিচালিত হইত। যাহা হউক, প্রকৃতি প্রশান্ত হইল; নাবিকেরা দিক্ নির্ণয় করিয়া প্রকৃত পথে পোত পরিচালন করিল; এবং ৯০ দিন পরে যবদ্বীপের বন্দরে উপস্থিত হইল। এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ ও অপধর্ম্মাবলম্বীর বাস ছিল।

ফাহিয়ান এই স্থানে পাঁচ মাস যাপন করিয়া অন্য একখানি বাণিজ্যপোতে আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই জাহাজে লোক সংখ্যা দুই শত ছিল। তাহারা ৫০ দিনের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়াছিল। একমাস কাল জাহাজ পরিচালনের পর প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। তখন কুসংস্কারাপন্ন ব্রাহ্মণগণ বলেন, "এই শ্রমণ (ফাহিয়ান) আমাদের সঙ্গী বলিয়াই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে; ইহাকে কোনও দ্বীপে অবতরণ করিতে বাধ্য করি; একজন মনুষ্যের জন্য সকলের মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নহে।" কিন্তু ফাহিয়ানের জনৈক হিতৈষী সবিশেষ সাহস সহকারে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন;—ফাহিয়ান নির্জ্জন দ্বীপে শোচনীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। শীঘ্রই ঝটিকা থামিয়া গেল, এবং ৮২ দিবস পরে বাণিজ্য পোত চীন দেশের উপকূলে উপনীত হইল।

আমরা বিস্তারিতরূপে ফাহিয়ানের সমুদ্র যাত্রার বিবরণ বর্ণনা করিলাম। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যগত সমুদ্র পথের

অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা এই বিবরণ পাঠে উপলব্ধি হয়। পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে দুই শত বা তাহারও অধিক লোকপূর্ণ ভারতীয় বাণিজ্য পোত বিপদসঙ্কুল সমুদ্র পথে যাতায়াত করিত: এই সকল পোতের নাবিকেরা দিঙ্‌ নির্ণয় করিবার জন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র মাত্র সহায় করিয়া অসীম সাহস সহকারে সমুদ্রপথে অগ্রসর হইত; বাণিজ্য পোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও চীন দেশে গমন করিতেন; যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই সকল বিবরণ পাঠে আমাদের হৃদয়ে গৌরব বুদ্ধির উদয় স্বাভাবিক। অনেকের নিকট "এই পুরাকাহিনী স্বপ্ন-কাহিনীর ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতিভাত" হইতে পারে।

নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ফাহিয়ান স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই মহান্‌ ব্রতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎকালে বুদ্ধভদ্র নামক একজন ভারতবাসী ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চীন দেশে বাস করিতেন। তিনি ফাহিয়ানকে অনুবাদ কার্য্যে বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান চিরজীবন সন্ন্যাসব্রত পালন করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

ফাহিয়ানের অবশিষ্ট জীবন।

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ। *

সুবিখ্যাত চৈণিক পরিব্রাজক হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ ভাষার প্রাঞ্জলতা, বর্ণনার সূক্ষ্মতা এবং ভূয়োদর্শিতা বশতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ আসন লাভ করিবার যোগ্য। হিউএন্‌থসঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে ভারতীয় ইতিহাসের অনেক তমসাচ্ছন্ন অংশ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের জন্মকাল ৬০৩ খৃঃ। তিনি শৈশবকালে দারুচিনি অথবা ভেনিলা লতার ন্যায় সৌরভ পূর্ণ ছিলেন। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ কৈশোরে পদার্পণ করিয়া সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে চীনদেশের পৌরাণিক বিবরণ অধ্যয়ন করেন এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বৌদ্ধ-যতি শ্রেণীভুক্ত হয়েন। অতঃপর তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন এবং পৃথিবীর ভোগ বিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন কুটীরে, গৃহত্যাগী তপস্বীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে সংকল্প করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চাঙ্গথ্‌সি বৌদ্ধ-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম স্তম্ভরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ভ্রাতা হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের মানসিক বিকাশ সাধন জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ তাঁহার সহায়তায়

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের বাল্যজীবন ও শিক্ষা।

---

* হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের নানা প্রকার বর্ণবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের অনুকরণ করিলাম।

চীনদেশের বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ্ এবং অধ্যাপকগণের উপদেশ লাভ জন্য নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। ফলতঃ তিনি কঠোর সাধনা বলে নবীন বয়সেই শাস্ত্রজ্ঞানে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন এবং বৌদ্ধ-পৌরহিত্যের পদ লাভ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর হইয়াছিল। তৎকালে মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ নানা তর্ক বিতর্ক পূর্ণ ছিল। অধিকাংশ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতই পল্লবগ্রাহী মাত্র ছিলেন। শাস্ত্র সমূহের মূলার্থ অন্বেষণে বিরত থাকিতেন। হিউএন্থ্-সঙ্গ চৈনিক ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের অনুবাদ পাঠ করিতেন। কিন্তু তিনি ঐ সকল অনুবাদ পাঠ করিয়া সাম্প্রদায়িক তর্ক বিতর্কের মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া ছিলেন, তদুপরি তাঁহার জ্ঞানলাভ স্পৃহাও অতৃপ্ত থাকিত। এই কারণে তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া মূলগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন পূর্ব্বক সমস্ত তর্কের মীমাংসা এবং আপনার জ্ঞানলাভ স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে সংকল্প করিলেন এবং তদর্থ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধের পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া ভারত-বর্ষাভিমুখে বহির্গত হইলেন।

হিউএন্থ্সঙ্গ অপরিচিত পথে একাকী গমন করিতে লাগিলেন। সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি, দুরারোহ পর্ব্বতমালা এবং খরস্রোতা নদী,—এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন তিনি তুচ্ছ করিয়া অবিচলিত চিত্তে মধ্য-এসিয়া অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পথিমধ্যগত দেশ সমূহের ভাষা শিক্ষা করিয়া তদ্দেশ সমুদয়ের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্য অবগত হইয়াছিলেন। এই কারণ তাঁহার গ্রন্থে আমরা মধ্য-এসিয়ারও একখানি চিত্র দেখিতে পাই। তৎকালে "মধ্য-এসিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও তাম্রময় মুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে

ভারত যাত্রা, মধ্য এসিয়ার চিত্র পট।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-পুস্তক সমূহের অধ্যাপনা হইত। কৃষিকার্য্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধিবাসিগণ রেশম পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীত ব্যবসায়ীরা গান বাদ্যে আসক্ত থাকিত। এই জনপদে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল; স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীশদেশের রাজধানী এথেন্স নগর যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া সমগ্র ইউরোপে সম্মানিত হইত, উক্ত সময়ে মধ্য-এসিয়ার সমরখন্দ নগরেরও সেইরূপ প্রতিপত্তি ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ সমরখন্দবাসীদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিত।" (১) হিউএন্থ্‌সঙ্গ মধ্য এসিয়ার ফারগণা, সমরখন্দ, বোখারা এবং বল্ক অতিক্রম করিয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পাদদেশে বর্ত্তমান কোহিস্থান নামক প্রদেশে কাপাসিয়া রাজ্যে উপনীত হন।

হিউএন্থ্‌সঙ্গ কাপাসিয়া রাজ্য সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদের প্রতীতি জন্মে যে, তৎকালে তদ্দেশীয়েরা অর্দ্ধ সভ্য ছিল। এই অর্দ্ধ সভ্য জনপদ ধন-ধান্য-পূর্ণ ছিল; পৃথিবীর নানাস্থান হইতে পণ্য দ্রব্য সকল তথায় আনীত হইত। কাপাসিয়ার অধিপতি ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত ছিলেন; এই নরপতি পরাক্রমশালী ছিলেন; পার্শ্ববর্ত্তী দশটি প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি সর্ব্বদা প্রজা-রঞ্জনে নিরত থাকিতেন। কাপাসিয়ার অধিপতি বৎসরান্তে বুদ্ধদেবের সুদীর্ঘ রৌপ্যময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন; তৎকালে তাঁহার আহ্বানে মোক্ষ মহাপরিষৎ সম্মিলিত হইত; এই সময়ে রাজা

কাপাসিয়া রাজ্য

(১) ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "প্রবন্ধ মঞ্জরী"।

শোকাতুর এবং বিধবাদিগকে ধন বিতরণ করিতেন। কাপাসিয়া রাজ্যে একশত বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে ছয় হাজার পুরোহিত বাস করিতেন।

সিন্ধু নদের পশ্চিমতীরে হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ ভারতবর্ষের সীমাভুক্ত কতিপয় রাজ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন। আমরা এই সকল রাজ্যের নাম উল্লেখ করিতেছি ; লমঘান, নগরহার, গান্ধার, উদ্যান। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশিলায় গমন করেন। এই সকল রাজ্য তৎকালে কাপাসিয়ার শাসনাধীন ছিল। লমঘান প্রভৃতি রাজ্য তৎকালে উর্ব্বর এবং ফল-শস্য-পূর্ণ ছিল ; কেবল উদ্যান রাজ্যে শস্যাভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। লমঘান রাজ্যের অধিবাসীদের চরিত্র বিশ্বাসঘাতকতা এবং চৌর্য্যাপবাদে কলঙ্কিত ছিল। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরা নম্রস্বভাব, মধুরভাষী, সৎসাহসী এবং সাধু প্রকৃতি ছিল, তাহারা জ্ঞানালোচনায় অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিত। এই সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল ; প্রকৃতি-পুঞ্জ মহাযান সুলভ বৌদ্ধমতে বিশ্বাস করিত। সর্ব্বত্র বৌদ্ধমঠ ও স্তূপ বিদ্যমান ছিল। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ গান্ধার রাজ্যের প্রধান নগর পলুশ (বর্ত্তমান পেশওয়ার) নামক স্থানের বহির্ভাগে একটি বহু শাখ ঘন-পল্লব একশত ফিট উচ্চ বৃক্ষ এবং সে বৃক্ষের দক্ষিণ দিকে সম্পদ ও সৌন্দর্য্যশালী একটি চারিশত ফিট উচ্চ পঞ্চতল স্তূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজকের গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রাগুক্ত বৃক্ষ ছায়ায় সমাসীন হইয়া একদা বুদ্ধদেব কনিষ্কের আবির্ভাব এবং তৎকর্ত্তৃক বিপুলায়তন স্তূপের অভ্যন্তরে স্বীয় দেহাবশেষ অস্থিমাংসের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন। এবং মহারাজ কনিষ্ক আবিভূ্র্ত হইয়া দৈবাৎ একজন মেষপালক বালকের

সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী রাজ্যসমূহ।

মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে বৃক্ষের দক্ষিণদিকে অতুলনীয় স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ রাখিয়াছিলেন। (১) আমাদের বর্ণিত কনিষ্কের কীর্ত্তিস্তূপের ন্যায় আরও নানা কীর্ত্তি পূর্ণ স্তূপ ও মঠ ঐ সকল দেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তৎকালে তাহাদের অধিকাংশের যে প্রকার ভগ্নদশা ঘটিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, প্রকৃতিপুঞ্জ ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাহীন হইতেছিল। বস্তুতঃ অনেকে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিল, এবং বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপের পার্শ্বেই উচ্চচূড় হিন্দু দেবালয় সমূহ পরিদৃষ্ট হইত। গান্ধার রাজ্যমধ্যে এক উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বত গাত্রে ভীমাদেবীর মূর্ত্তি খোদিত ছিল। এই স্থানে নানা দিগ্দেশ হইতে জনগণ সমবেত হইয়া দেবীর পূজা অর্চ্চনা পূর্ব্বক কৃতার্থ হইত। পর্ব্বতের নিম্নদেশে মহাদেব মহেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাদেব মহেশ্বরের মন্দিরের অদূরে সলাতুর নামক পল্লীতে ব্যাকরণ শাস্ত্রবেত্তা পাণিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। (২)

ভারত ভ্রমণ।

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ তক্ষশিলা জনপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চনদবিধৌত দেশের অন্যান্য প্রদেশে প্রবেশ করিলেন; তাহার পর বহু জনপদ,—বহু রাজ্য অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুণ্যক্ষেত্রে মগধ রাজ্যে উপনীত হইলেন। অতঃপর তিনি কপিলবস্তু, কুশীনগর, শ্রাবস্তী, বারাণসী, বুদ্ধগয়া এবং রাজগৃহ প্রভৃতি

---

(১) সম্প্রতি পুরাবস্তু বিভাগের সাধনায় পেশওয়ারের নিকটে কনিষ্কের কীর্ত্তি স্তূপের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ভূগর্ভ প্রোথিত আধারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট বুদ্ধের দেহাবশেষ ব্রহ্মদেশে সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন।

(২) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষভুক্ত সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরস্থিত প্রদেশ সমূহের অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। এই

বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করিলেন এবং বিশিষ্ট শ্রমণ মণ্ডলীর সহবাসে দীর্ঘ কাল অবস্থান পূর্ব্বক বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আপনার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইলেন। হিউএন্থ্সঙ্গ স্বীয় অভিষ্টজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং মধ্যভারত, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণাপথ প্রভৃতি বিচিত্র দেশ দর্শন করিলেন। তিনি দাক্ষিণাপথ হইতে করমণ্ডল উপকূলের পথে মালবার দেশে উপনীত হইলেন এবং তারপর গুর্জ্জর ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশে গমন করিলেন। হিউএন্থ্সঙ্গ এই স্থানে ভারত-ভ্রমণ পরিসমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন এবং ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাবুলী-স্তানের পথে স্বদেশে গমন করিলেন।

সময়ের একশত বৎসর পূর্ব্বে এই সকল দেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা তুলনায় সমালোচনা জন্য প্রদর্শন করিতেছি। চৈনিক পরিব্রাজক হে সঙ্গ এবং সঙ্গ ইয়ানের ভ্রমণকাহিনী আমাদের অবলম্বন। এই দুই জন পরিব্রাজক রাজাদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতবর্ষাভিমুখে ৫১৮ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করেন। চীনের রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া ইঁহারা উচাংদেশের অন্তর্গত উদ্যান রাজ্যে আগমন করেন। "এই দেশের উত্তরে সাংলিং পর্ব্বত এবং দক্ষিণেই ভারতবর্ষ। লোকসংখ্যা এবং উৎপন্ন দ্রব্য যথেষ্ট এই প্রদেশের ভূমির উর্ব্বরতা অত্যধিক এবং জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এই স্থলেই বোধিসত্ত্ব ব্যাঘ্রীর ক্ষুন্নিবা-রণ জন্য আপন শরীর অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা নিরামিষাশী। প্রধান প্রধান উপবাসের দিন তিনি ঢক্কা, শঙ্খ, বংশী প্রভৃতি বাদন করিয়া বুদ্ধদেবের উপাসনা করেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে তিনি রাজকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। হত্যাপরাধীকে নিহত করা হয় না। সামান্য আহার্য্য সহকারে তাহাকে নির্জ্জন স্থানে নির্ব্বাসিত করা হয়। মনুষ্যের খাদ্য সামগ্রী শস্য এবং নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফল এখানে যথেষ্ট। সন্ধ্যাকালীন পূজা ও আরতির ঘণ্টা নিনাদ অনেক দূর হইতে শুনা যায়। নানাপ্রকার পুষ্পে পৃথিবী আচ্ছন্ন, পুরোহিত এবং সাধারণ লোকে

শেষ জীবন।

ইতঃপূর্ব্বেই এই ধর্ম্মবীরের বিমল যশোরাশি চীনের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; একারণ জনসাধারণ তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, চীনের সম্রাট তাঁহাকে মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হিউএন্‌থ্-সঙ্গ বিনম্র বচনে বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন।

বুদ্ধদেবের পূজার উদ্দেশ্যে তৎসমুদয় আহরণ করিয়া থাকে।" পর্য্যাটক যুগল উদ্যান রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গান্ধারে গমন করেন। "গান্ধারের অধিবাসীরা সকলেই ব্রাহ্মণ; কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধদেবকে সাতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতি এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ। সাত শত যুদ্ধ প্রিয় রণহস্তী তাঁহার অধীন। প্রত্যেক হস্তী দশজন সুসজ্জিত সৈন্য বহন করে। এই সমস্ত সৈন্য তরবারী ও বল্লম লইয়া যুদ্ধ করে। হস্তীদের শুণ্ডেও তরবারী থাকে, আবশ্যক হইলে ইহারাও তরবারী বহন করিতে পারে। রাজা নিজ সৈন্য সহ সর্ব্বদা সীমান্ত প্রদেশে বাস করেন, এই জন্য প্রজাপুঞ্জ সুখে নাই।" গান্ধার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা একটি বৌদ্ধতীর্থে উপনীত হন। এই স্থানে একজন সামান্য মনুষ্যের রক্ষার্থ বুদ্ধদেব স্বীয় মস্তক প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পর্য্যাটক যুগল তথা হইতে সিন্ধু (সিন্ধু) নদ অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা সিন্ধু অতিক্রম করিয়া তোমাকু নগরে উপনীত হন। "নগর সুরক্ষিত। অনেকগুলি জলের ফোয়ারা দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই মূল্যবান প্রস্তরাদি দৃষ্ট হয়। অধিবাসীরা সৎ এবং সাধু। নিকটে এক মন্দিরে স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি খচিত প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক দেবমূর্ত্তি পূজিত হইতেছে।" হৈসঙ্গ এবং সঙ্গইয়ান তোমাকু পরিত্যাগ করিয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হয়েন নাই। তোমাকু নগরের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী কিকলেম মন্দিরেই তাঁহাদের ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হয় এবং তাঁহারা একশত সত্তর খানি বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ১৩১৬ সনের দ্বাদশ সংখ্যা ভারতী হইতে সঙ্কলিত।

সম্রাট হিউএন্থ্ সঙ্গের তাদৃশ সংকল্পের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার বাসের জন্য একটি মঠ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি অচিরে স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন। তারপর বহুসংখ্যক সহযোগীর সাহায্যে বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দীর্ঘ-কালব্যাপি-সাধনায়। ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ৭৪০ খানা গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিলেন। এই ভাবে লোকহিতকল্পে জীবনযাপন করিয়া হিউএন্থ্ সঙ্গ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হইলেন।

কাশ্মীর ও পঞ্জাব।

কাশ্মীর।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ্ সঙ্গ তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে আগমন করেন। কাশ্মীর নৈসর্গিক শোভা ও সম্পদের জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। হিউএন্থ্ সঙ্গের গ্রন্থ হইতেও আমরা কাশ্মীরের নৈসর্গিক শোভা ও সম্পদের সাক্ষ্য লাভ করি। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণী পাঠে কাশ্মীরের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রতি-কূলভাব উপস্থিত হয়। আমাদের এই নির্দ্দেশ সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা তদীয় গ্রন্থের কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রাকৃতিক দৃশ্য, লোক চরিত্র

কাশ্মীরের চতুর্দ্দিক শৈলমালা-পরিবেষ্টিত। কাশ্মীর প্রকৃতির ঈদৃশ দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত বলিয়া অদ্যাবধি কোন নরপতি এই দেশ আক্রমণ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কাশ্মীরের রাজধানী উত্তর দক্ষিণে ১২ অথবা ১৩ লি ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪ অথবা ৫ লি। (৫ লিতে এক মাইল) আমাদের বর্ণিত দেশ সর্ব্বত্র ফলফুল-শোভিত। জল বায়ু শীতল এবং সুতীক্ষ্ণ। চারিদিকে রাশি রাশি তুষার দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুর বেগ অতি অল্প সময়ই অনুভূত হয়। জনপুঞ্জ

লঘুচিত্ত এবং অশিষ্ট; ভীরুতা এবং দুর্ব্বলতা তাহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব। কাশ্মীরের নরনারী দেখিতে সুশ্রী। তাহারা কাজকর্ম্মে ধূর্ত্ত, কিন্তু জ্ঞানানুরাগী এবং সুশিক্ষিত।

হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গের আগমন কালে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ও হিন্দু,—এই দুই ধর্ম্মেরই প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কৌতুহলোদ্দীপক এবং তাহাতে মহারাজ অশোকের চরিত্রের একদেশ প্রকটিত হইয়াছে। আমরা সে বিবরণ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কাশ্মীরে বিশ্বাসী এবং অপধর্ম্মাবলম্বী, এই দুই শ্রেণীর লোকই পরিদৃষ্ট হয়। সঙ্ঘারাম এবং শ্রমণের সংখ্যা যথাক্রমে একশত এবং পঞ্চসহস্র। মহারাজ অশোক-নির্ম্মিত চারিটি স্তূপ বিদ্যমান আছে। এই সকল স্তূপের প্রত্যেকটিতেই তথাগতের ক্ষুদ্র চিহ্ন স্থাপিত রহিয়াছে।

তথাগতের নির্ব্বাণ লাভের একশত বৎসর পরে (১) মগধের নরপতি অশোক পৃথিবীতে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন; সুদূরবর্ত্তী দেশের লোক সমূহও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিত। সর্ব্বশ্রেণীর প্রাণীই তাঁহার প্রিয় ছিল। তাঁহার সময়ে পাঁচশত অর্হৎ এবং পাঁচশত প্রচলিত মতত্যাগী পুরোহিতের বাস ছিল। এই দুই শ্রেণীই অশোক রাজার নিকট তুল্য আদর ও সম্মানভাজন ছিল। মাধব নামে একজন প্রচলিত মতত্যাগী পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য ক্ষমতা ছিল। তিনি নির্জ্জন আশ্রমবাসে প্রকৃত খ্যাতির অন্বেষণ করিতেন। তিনি চর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গরাখা এবং শুভ্র সূত্রবস্ত্র পরিধান করে। তাহারা

মহারাজ অশোক।

(১) এই নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক; মহারাজ অশোকের শিলালিপি পাঠ করিলে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভের ২২১ বৎসর পরে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল।

পবিত্র ধর্ম্মবিরোধী শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত, তাহারা তাঁহার সাহচর্য্য লাভেচ্ছু হইত এবং তাঁহার মত গ্রহণ করিত। মহারাজ অশোক ধার্ম্মিক এবং সাধারণ মনুষ্যের প্রভেদ করিতে অসমর্থ ছিলেন; এই কারণে তিনি লোকের প্ররোচনায় পুরোহিতদিগকে জলমগ্ন করিতে সংকল্প করেন। অর্হৎগণ মহারাজ অশোকের তাদৃশ সংকল্পের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া গোপনে অলৌকিক ক্ষমতা বলে কাশ্মীরে আগমন করেন। অশোক এই সংবাদ জানিতে পারিয়া পরিতপ্ত হন এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু অর্হৎগণ রাজানুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের বাসের নিমিত্ত পাঁচশত সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং সমগ্র কাশ্মীর ভূমি তাঁহাদের হস্তে দানস্বরূপ অর্পণ করেন।

মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালেই সমগ্র কাশ্মীর দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হয়। হিউএনথ্‌সঙ্গের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, উত্তর-ভারতে কনিষ্ক মহাপ্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। কনিষ্কের ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার বিশাল ক্ষমতার অনুরূপই প্রবল ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি বিধান জন্য অক্লান্তভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। আমরা হিউএনথ্‌সঙ্গের গ্রন্থ হইতে সে সকল বিবরণের মর্ম্ম সংকলন করিয়া দিতেছি।

তথাগতের নির্ব্বাণ লাভের চারিশত বৎসর পরে গান্ধারের অধিপতি কনিষ্ক কাশ্মীরের আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার রাজ-মহিমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তিনি দূরবর্ত্তী দেশ সকল স্বীয় আধিপত্যাধীন করিয়া তুলেন। কনিষ্ক রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেই বৌদ্ধশাস্ত্রের

মহারাজ কনিষ্ক।

আলোচনায় নিরত হইতেন। তাদৃশ আলোচনা কালে পরস্পর-বিরোধী নানা মত পাঠ করিয়া তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সান্দহান হন। এই কারণে মহারাজ কনিষ্ক বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রবেত্ত-গণকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে সমস্ত ভ্রম প্রমাদের মীমাংসা ও সংশয় ভঞ্জন করিয়া লইতে সংকল্প করেন। তাঁহার সাদর আমন্ত্রণে পাঁচশত আচার্য্য সম্মিলিত হন এবং তিনখানি ভাষ্যগ্রন্থ সংকলন করেন।

মহারাজ কনিষ্কের শক্তি সুদূরপ্রসারিণী ছিল, চীনদেশ হইতে করদ রাজগণ তাঁহার নিকট আপনাদের বিশ্বস্ততার প্রতিভূস্বরূপ দূত প্রেরণ করিতেন। মহারাজা এই সমুদয় দূতের সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি তাঁহাদের বাসের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা চীনাপটি নামে পরিচিত হয়।

কনিষ্কের মৃত্যু, কাশ্মীরে ধর্ম্ম-বিপ্লব।

মহারাজ কনিষ্কের মৃত্যুর পরেই তাঁহার বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয় এবং কিরাতগণ কাশ্মীর অধিকার করিয়া তত্রত্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিনাশ করে। তারপর শাক্য বংশীয়গণ কর্ত্তৃক কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে হিউএন্থ্ সঙ্গ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, মহারাজ কনিষ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, ক্রীত (Serf বা কিরাত) জাতীয় * কাশ্মীর-বাসীরা কাশ্মীর দেশ হস্তগত করে। এই রাজ বিপ্লবের দুঃশত বৎসর পরে একজন শাক্যকুমার তুখার অন্তর্গত হিমতল রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া কিরাতগণ কর্ত্তৃক কাশ্মীর হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বহিষ্কারের বৃত্তান্ত অবগত হন।

* ইহা ঘৃণা সূচক উপাধি, হীন প্রকৃতির জন্য পার্শ্ববর্ত্তী জনপুঞ্জ কর্ত্তৃক এই উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল।

তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহার ধর্ম্মানুরক্ত হৃদয়ে রোষানল উদ্দীপিত হইয়া উঠে; তিনি কিরাতগণের দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তিন সহস্র সাহসী সেনা সমভিব্যাহারে বণিকের ছদ্মবেশে কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন। তাহারা তথায় উপনীত হইলে কাশ্মীরাধিপতি তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে সসম্মানে আশ্রয় দেন। অতঃপর শাক্য নরপতি কিরাতরাজকে উপঢৌকন প্রদান ব্যপদেশে পাঁচশত অসম সাহসী কৃতকর্ম্মা সহচর সহকারে রাজসভায় উপনীত হন এবং অচিরে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার মুণ্ডপাত করেন। এইভাবে কিরাত অধিপতির বিনাশ সাধন করিয়া তিনি মন্ত্রীবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আমি হিমতলের রাজ্যাধিকারী, আমি এই নীচকুলজাত রাজন্যগণের অত্যাচারের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। সে দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। জনপুঞ্জ নির্দ্দোষ।" অতঃপর তিনি মন্ত্রীদিগকে নির্ব্বাসিত এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশ্মীর রাজ্যে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের পুনরাবাসের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আহ্বানে পরমসৌগতগণ আগত হইলে তিনি তাঁহাদের হস্তে কাশ্মীর রাজ্য অর্পণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করেন।

প্রাগুক্ত ঘটনার কতিপয় বৎসর অন্তে কাশ্মীর দেশে কিরাতগণের দ্বিতীয়বার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক একাধিকবার নির্য্যাতিত হইয়া তাহারা ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায় এবং তৎফলে বর্ত্তমান সময়ে অপধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান আছে এবং চতুর্দ্দিকে তদ্বিশ্বাসীদের ধর্ম্মমন্দির পরিদৃষ্ট হইতেছে।

পঞ্জাব।

হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গের ভারতবর্ষ পর্য্যটন কালে পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এতন্মধ্যে হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গ তক্ক,

চীনাপটি, জলন্ধর, কুলুত, শতদ্রু, বৈরাট (১) মূলতান এবং পরবত প্রভৃতি রাজ্যের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সে বিবরণ পাঠে জানিতে পারি যে, পঞ্চনদ ভূমিতে হিন্দুধর্ম্মের অধিকতর প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

পঞ্জাবের অবস্থা।

কিন্তু নানাস্থানে হিন্দুর দেবমন্দিরের পার্শ্বেই বৌদ্ধমঠ এবং সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যাইত। শতদ্রু রাজ্যের জনপুঞ্জ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সরল ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের তাদৃশ প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসত্ত্বেও আমাদের পরিব্রাজক তত্রত্য রাজধানীর সঙ্ঘারাম সমূহ পরিত্যক্ত এবং শ্রমণের সংখ্যা নগণ্য দেখেন। সেই প্রাচীন কালেও পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশ ফলশস্যপূর্ণ ছিল বলিয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ পঞ্চনদ ভূমির সর্ব্বত্রই দারুণ গ্রীষ্ম বোধ করেন; কেবল কুলুত রাজ্যে শীতাধিক্য অনুভূত হয়। এতদ্দেশবাসী জনপুঞ্জের স্বভাব চরিত্র বর্ণন কালে এক এক রাজ্যের লোকের চরিত্র এক একরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা পাঠ করিলে মোটের উপর উপলব্ধি জন্মে যে, পঞ্চনদ ভূমির অধিকাংশস্থানবাসীরা উদ্ধতস্বভাব এবং শৌর্য্যবীর্য্যশালী ছিল। চীনাপটির অধিবাসীগণ সন্তুষ্টচিত্ত, শান্তিপ্রিয়, ভীরুস্বভাব এবং উদাসীনপ্রকৃতি ছিল। শতদ্রু রাজ্যবাসীদিগকে হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ ধর্ম্মশীল, নম্রস্বভাব, তুষ্টিকর প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ পঞ্জাববাসীর অনেক সংকীর্ত্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই নির্দ্দেশের সার্থকতা প্রদর্শন জন্য তদীয় গ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে। "পূর্ব্বকালে গরিব এবং অনাথগণের প্রতিপালন জন্য তক্ক রাজ্যের স্থানে স্থানে পুণ্যশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল

(১) কানিংহাম সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বৈরাট মহাভারতোক্ত মৎস্য দেশের রাজধানী বিরাট নগর হইতে অভিন্ন।

পুণ্যশালায় তাহাদিগকে খাদ্য, ঔষধ, পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রদত্ত হইত। এই কারণেই কোন আগন্তুককেই ক্লিষ্ট হইতে হইত না।"

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ সঙ্গের পর্য্যটনকালে পঞ্চনদ প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এক সময়ে এতদ্দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা, হিউএন্থ সঙ্গের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, মিহিরকুল নামক এক হিন্দু-নরপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করেন, এবং তদবধিই বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য সে বিবরণ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

পুরাকালে (হিউএন্থ সঙ্গের ভারতাগমনের বহু পূর্ব্বে) পঞ্চনদ ভূমির অন্তর্গত সাকল নামক রাজধানীতে মহারাজ মিহিরকুল সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত অংশে তাঁহার আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল।

মহারাজ মিহির কুল

মিহিরকুল বৌদ্ধ-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হন এবং তদর্থে একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্য্যকে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণের ধনাদিতে স্পৃহা ছিল না, খ্যাতিলাভেও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন, সুপণ্ডিত এবং খ্যাতনামা বৌদ্ধাচার্য্যগণ রাজানুগ্রহ ঘৃণা করিতেন। এ জন্য তাঁহারা মহারাজ মিহিরকুলের আদেশ প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। একজন পুরাতন রাজ-ভৃত্য বহুকাল অবধি ধর্ম্ম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তর্কে প্রাজ্ঞ এবং সুবক্তা ছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণ রাজসমীপে তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে মিহিরকুল নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চনদ-ভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্কাশন করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

তৎকালে মগধে বালাদিত্য রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এই কারণ মিহিরকুলের

তাদৃশ ঘোর নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়নের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া ব্যথিত হইলেন, এবং স্বরাজ্যের সীমা সুদৃঢ় করিয়া তাঁহাকে বার্ষিক নজর দিতে অস্বীকার করিলেন। বালাদিত্যের কৃতকার্য্যে মিহির-কুলের ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; তিনি বিপুল বাহিনীসহ মগধাভিমুখে অভিযান করিলেন।

বালাদিত্য মিহিরকুলের বলবীর্য্যের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন; তিনি মিহিরকুলের অভিযানের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। বালাদিত্য প্রকৃতিপুঞ্জের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই কারণে অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগামী হইল। তিনি অনুচরগণ সহ একটী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মিহিরকুল নৌ পথে ঐ দ্বীপে উপনীত হইলেন। এই স্থানে বালাদিত্যের সুকৌ-শলে প্রবল প্রতাপান্বিত মিহিরকুল বন্দী হইলেন। ইহাতে মিহিরকুল লজ্জা ও অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া মুখমণ্ডল স্বীয় পরিচ্ছদ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। বালাদিত্যের বহু অনুরোধসত্ত্বেও তিনি মুখের কাপড় অপসারণ করিতে বিরত রহিলেন।

বালাদিত্যের মাতা অতিশয় মনস্বিনী ও জ্যোতিষ-বিদ্যা পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি অসাধারণ মিহিরকুলের পতন সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে মিহিরকুল তাঁহার সমীপে নীত হইলে তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আহা! মিহিরকুল, তুমি লজ্জিত হইও না, সমস্ত পার্থিব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য ঘটনানুসারে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হই-তেছে। তোমাকে দেখিয়া আমার পুত্রবাৎসল্য উপস্থিত হইয়াছে, তুমি মুখের কাপড় খুলিয়া ফেল এবং আমার সঙ্গে আলাপ কর।" রাজ-মাতার বহু আকিঞ্চনে মিহিরকুল মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর মাতার আদেশে

বালাদিত্য মিহিরকুলকে একজন তরুণী কুমারীর সঙ্গে বিবাহান্তে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক সসম্মানে বিদায় দিলেন। মিহিরকুলের অনুপস্থিতির সুযোগে তদীয় ভ্রাতা সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি মুক্তি লাভ করিয়া কাশ্মীরে উপনীত হইলেন। তত্রত্য অধিপতি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কাশ্মীরাধিপতি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং সে জন্য তাঁহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু মিহিরকুল অচিরে সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া কাশ্মীরের প্রজাকুলকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন এবং তার পর রাজাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইলেন। অতঃপর চতুর্দ্দিকে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষমতা লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্কাশনে বদ্ধপরিকর হইলেন। মিহিরকুল প্রবল পরাক্রমে গান্ধার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক এক হাজার ছয় শত স্তূপ এবং সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন, এবং নবতি লক্ষ বৌদ্ধ নরনারীকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন। অমাত্যগণ তাঁহাকে এই ভয়ঙ্কর কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জের পরিবর্ত্তে আপনাদের জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য প্রার্থী হইলেন। মিহিরকুল তাঁহাদিগকে উত্তর প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে সিন্ধুনদের উপকূলে তিন লক্ষ সম্ভ্রান্ত-বংশজাত নরনারীকে হত্যা করিলেন, তৎসমসংখ্যক নরনারী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল। তার পর তিনি তিন লক্ষ নরনারীকে দাস দাসীরূপে স্বীয় সৈন্য শ্রেণীতে বিতরণ করিলেন। এই সকল দুষ্কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি প্রজাকুলের অর্থ অপহরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সমস্ত দুষ্কার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হইলেন। মিহিরকুলের মৃত্যুকালে চারিদিকে বিদ্যুৎপাত ও শিলা বর্ষণ হইয়াছিল। ঘোর অন্ধকার সমস্ত

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, প্রবল ঝটিকা এবং ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইলে পবিত্র-চেতা সিদ্ধপুরুষগণ বলিয়াছিলেন, "অসংখ্য নরনারীর হত্যাসাধন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্কাশন জনিত পাপের ফলে মিহিরকুল সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ নরকে পতিত হইয়াছেন। এই নরকে তাঁহাকে অনন্তকাল যাপন করিতে হইবে।"

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্চনদ প্রদেশে সৌরধর্ম্মের প্রভূত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আমরা এই প্রসঙ্গে হিউএন্থ্ সঙ্গ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ মূলতানের বৃত্তান্তের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

মূলতান দেশ চক্রাকারে প্রায় ৪ হাজার লি; রাজধানী চক্রাকারে ন্যূনাধিক ৩০ যোজন। মূলতান রাজ্য জনপূর্ণ। অধিবাসীরা অর্থশালী। ভূমি উর্ব্বরা এবং শস্যশ্যামলা। জলবায়ু প্রীতিকর। অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সরল, তাহারা সাধুস্বভাব, জ্ঞানানুরাগী এবং গুণী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা অল্প। এই দেশে দশটি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার অধিকাংশই ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। এই সকল সঙ্ঘারামে অতি অল্পসংখ্যক শ্রমণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা বিদ্যালোচনায় নিরত আছেন; কিন্তু তাঁহাদের কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। মূলতান দেশে একটি সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান আছে, এই মন্দির অতি সুবিশাল এবং আদ্যন্ত কারুকার্য্যখচিত; তদভ্যন্তরস্থিত সূর্য্যমূর্ত্তি স্বর্ণনির্ম্মিত এবং বহুমূল্য রত্নভূষিত। সূর্য্য মূর্ত্তির ঐশ্বরিক জ্ঞান সময় সময় প্রহেলিকাবৎ লোকসমক্ষে প্রকটিত হইয়া থাকে; ইঁহার দৈবক্ষমতা সর্ব্বজনবিদিত হয়। রমণিগণ মন্দিরে গমনপূর্ব্বক গীতবাদ্য, দীপারতি এবং সচন্দন পুষ্পদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা অর্চ্চনা করেন। আদি কাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

মূলতান, সূর্য্য মন্দির

পঞ্চনদ প্রদেশের রাজন্যবৃন্দ এবং ধনবানগণ আমাদের বর্ণিত মণিমুক্তা-রত্নাদি উৎসর্গ করিতে তৎপর রহিয়াছেন। তাঁহারা একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানে গরীব দুঃখীরা আশ্রয় লাভ করে, পিপাসার্ত্তকে জল, ক্ষুধাতুরকে অন্ন এবং পীড়িতকে ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে। সমস্ত দেশ হইতে নরনারীগণ মোক্ষ কামনায় সূর্য্যদেবের উপাসনার্থ এই স্থানে আগমন করে; এই কারণ সহস্র সহস্র লোকের কলরবে মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণ-ভূমি সর্ব্বদা মুখরিত থাকে। সূর্য্যমন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব নির্ম্মলসলিলা দীর্ঘিকা দ্বারা পরিশোভিত; সে দীর্ঘিকার তীরে স্থানে স্থানে পুষ্পকুঞ্জ চারিদিকের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; এই সকল পুষ্পকুঞ্জে যাত্রিগণ অবাধে পরিভ্রমণ করিতে পারে।

আর্য্যাবর্ত্ত।

প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্থ্সঙ্গ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষ বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। তিনি তাঁহার সমসাময়িক প্রায় সকল রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুদ্ধের জন্মভূমি—পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থা আমাদিগের মানসনয়নসমক্ষে সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

উত্তর ভারত।

হিউএন্থ্সঙ্গের ভারতভ্রমণ কালে উত্তর-ভারতে ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি সংখ্যক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকলের মধ্যে কান্যকুব্জের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। তখন দ্বিতীয় শিলাদিত্য এই রাজ্যে প্রবল

প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার বাহুবলে বহু নৃপতি পরাজিত ও কান্যকুব্জ রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

ব্রহ্মপুরা রাজ্য।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতললামভূত মথুরা, স্থানেশ্বর, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। হিউএন্থ্‌সঙ্গের গ্রন্থে উত্তর-ভারতের এই সকল প্রসিদ্ধ রাজ্যের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের পাদস্থিত কতিপয় পার্ব্বত্য জাতির বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। তিনি হিমালয় প্রদেশে ব্রহ্মপুরা নামক এক রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই দেশ বর্ত্তমান সময়ে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে একজন রমণীর হস্তে এই রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। হিউএন্থ্‌সঙ্গ লিখিয়াছেন, "বহুকাল হইতে রমণীরাই এই দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে এই দেশ স্ত্রীরাজ্য নামে খ্যাত। শাসনকর্ত্রীর স্বামী 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তিনি রাজ্যের অবস্থা বা শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। পুরুষগণ কেবল যুদ্ধ ও ভূমিকর্ষণ করেন।"

হিউএন্থ্‌সঙ্গ উত্তর-ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা নানা কথায় পূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা নিম্নে তাঁহার লিখিত কতিপয় রাজ্যের বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদান করিলাম।

মথুরা।

মথুরা-রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি বিস্তৃত। রাজধানী মথুরা নগরীর বিস্তার প্রায় ২০ লি। মথুরা রাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা এবং ফলশস্যপ্রসূ। মথুরাবাসীরা আমলকীর উৎপাদনে সবিশেষ যত্নশীল। এই দেশে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

মথুরা-রাজ্য উষ্ণপ্রধান দেশ। ইহার অধিবাসীরা কোমল-স্বভাব; সন্তোষ তাহাদিগের চরিত্রগত গুণ। তাহারা গুণগ্রাহী ও বিদ্যার উৎসাহদাতা।

মথুরা-রাজ্যে বিংশতি সংখ্যক সঙ্ঘারাম ও পাঁচটি দেবমন্দির আছে। সঙ্ঘারাম সমূহে দুই সহস্র শ্রমণ এবং দেবালয় গুলিতে সর্ব্ব শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকেন। বৎসরের প্রথম, পঞ্চম ও নবম মাসে এবং প্রত্যেক মাসের নির্দ্দিষ্ট উপবাস দিনে শ্রমণগণ বৌদ্ধ স্তূপ সমীপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও উপহার প্রদান এবং পরস্পরকে অভিনন্দন করেন। তখন মণিমুক্তা-খচিত পতাকা উড্ডীন করা হয়, বহুমূল্য ছত্রে চারিদিক আচ্ছাদিত হয়, ধূপধূনাদির ধূম গগনমার্গে উত্থিত হয়, সকল স্থান কুসুমাস্তৃত হয়। দেশের রাজা ও বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ এই ধর্ম্মোৎসবে সোৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন। এই সময় শ্রমণগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। অভিধর্ম্মশাস্ত্রপাঠীরা সারিপুত্রের, ধ্যানপরায়ণগণ মৌদ্গল্য-পুত্রের এবং বিনয়শাস্ত্রপাঠীরা উপালীর স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ভিক্ষুণীরা আনন্দের, শ্রমণ সম্প্রদায়প্রবেশার্থীরা রহুলের ও মহাযানশাস্ত্রপাঠীরা বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।

বৌদ্ধ উৎসব।

স্থানেশ্বর।

স্থানেশ্বর রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৭ হাজার লি ও স্থানেশ্বর নগর চক্রাকারে প্রায় ২০ লি। এই দেশের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ, ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। কিন্তু এই দেশের জনগণ বিলাসপরায়ণ, সরলতা-হীন, নিরুৎসাহ। তাহারা যাদুবিদ্যার বিশেষ অনুরাগী। তাহাদের অধিকাংশই পার্থিবলাভসাধনে ব্রতী। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহুমূল্য ও দুর্ল্লভ পণ্যদ্রব্য স্থানেশ্বরে সঞ্চিত হইয়াছে। এ দেশে

প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার বাহুবলে বহু নৃপতি পরাজিত ও কান্যকুব্জ রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

ব্রহ্মপুরা রাজ্য।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতললামভূত মথুরা, স্থানেশ্বর, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের গ্রন্থে উত্তর-ভারতের এই সকল প্রসিদ্ধ রাজ্যের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের পাদস্থিত কতিপয় পার্ব্বত্য জাতির বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। তিনি হিমালয় প্রদেশে ব্রহ্মপুরা নামক এক রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই দেশ বর্ত্তমান সময়ে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে একজন রমণীর হস্তে এই রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ লিখিয়াছেন, "বহুকাল হইতে রমণীরাই এই দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে এই দেশ স্ত্রীরাজ্য নামে খ্যাত। শাসনকর্ত্রীর স্বামী 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তিনি রাজ্যের অবস্থা বা শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। পুরুষগণ কেবল যুদ্ধ ও ভূমিকর্ষণ করেন।"

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ উত্তর-ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা নানা কথায় পূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা নিম্নে তাঁহার লিখিত কতিপয় রাজ্যের বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদান করিলাম।

মথুরা।

মথুরা-রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি বিস্তৃত। রাজধানী মথুরা নগরীর বিস্তার প্রায় ২০ লি। মথুরা রাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা এবং ফলশস্যপ্রসূ। মথুরাবাসীরা আমলকীর উৎপাদনে সবিশেষ যত্নশীল। এই দেশে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

মথুরা-রাজ্য উষ্ণপ্রধান দেশ। ইহার অধিবাসীরা কোমল-স্বভাব; সন্তোষ তাহাদিগের চরিত্রগত গুণ। তাহারা গুণগ্রাহী ও বিদ্যার উৎসাহদাতা।

মথুরা-রাজ্যে বিংশতি সংখ্যক সঙ্ঘারাম ও পাঁচটি দেবমন্দির আছে। সঙ্ঘারাম সমূহে দুই সহস্র শ্রমণ এবং দেবালয় গুলিতে সর্ব্ব শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকেন। বৎসরের প্রথম, পঞ্চম ও নবম মাসে এবং প্রত্যেক মাসের নির্দ্দিষ্ট উপবাস দিনে শ্রমণগণ বৌদ্ধ স্তূপ সমীপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও উপহার প্রদান এবং পরস্পরকে অভিনন্দন করেন। তখন মণিমুক্তা-খচিত পতাকা উড্ডীন করা হয়, বহুমূল্য ছত্রে চারিদিক আচ্ছাদিত হয়, ধূপধূনাদির ধূম গগনমার্গে উত্থিত হয়, সকল স্থান কুসুমাস্তৃত হয়। দেশের রাজা ও বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ এই ধর্ম্মোৎসবে সোৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন। এই সময় শ্রমণগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। অভিধর্ম্মশাস্ত্রপাঠীরা সারিপুত্রের, ধ্যানপরায়ণগণ মৌদ্গল্য-পুত্রের এবং বিনয়শাস্ত্রপাঠীরা উপালীর স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ভিক্ষুণীরা আনন্দের, শ্রমণ সম্প্রদায়প্রবেশার্থীরা রহুলের ও মহাযানশাস্ত্রপাঠীরা বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।

বৌদ্ধ উৎসব।

স্থানেশ্বর।

স্থানেশ্বর রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৭ হাজার লি ও স্থানেশ্বর নগর চক্রাকারে প্রায় ২০ লি। এই দেশের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ, ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। কিন্তু এই দেশের জনগণ বিলাসপরায়ণ, সরলতা-হীন, নিরুৎসাহ। তাহারা যাদুবিদ্যার বিশেষ অনুরাগী। তাহাদের অধিকাংশই পার্থিবলাভসাধনে ব্রতী। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহুমূল্য ও দুর্ল্লভ পণ্যদ্রব্য স্থানেশ্বরে সঞ্চিত হইয়াছে। এ দেশে

কৃষিজীবীর সংখ্যা অল্প। তিনটি মাত্র সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এই সকল সঙ্ঘারামে ৭০০ হীনযান মতাবলম্বী শ্রমণ বাস করেন। এদেশে কয়েক শত দেবমন্দির আছে।

ধর্ম্মক্ষেত্র (কুরুক্ষেত্র) রাজধানী স্থানেশ্বরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। পুরাকালে দুইজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। শেষে সেইরূপ লোকক্ষয় নিবারণকল্পে তাঁহারা স্থির করেন, উভয় পক্ষের কতিপয় সৈন্য রণক্ষেত্রে শারীরিক দ্বন্দ্বে বিবাদের মীমাংসা করিবে। কিন্তু জনগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তখন নৃপতিদ্বয়ের একজন সঙ্কল্পসাধনোদ্দেশে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন।

মহাভারত।

তাঁহার নির্দ্দেশে একজন মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পর্ব্বত গহ্বরে লুকাইয়া রাখেন। অনন্তর নৃপতি স্বপ্নে ঐ গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছেন, এইরূপ রটনা করিলে পর্ব্বত-গহ্বরে ঐ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। এই গ্রন্থ পাঠে লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, রণক্ষেত্রে দেহপাত করিলে মুক্তিলাভ হয়। তখন জনগণ যুদ্ধার্থ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। তখন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং মৃতদেহ যষ্টির মত স্তূপীকৃত হয়। সেই সময় হইতে অদ্যাপি এই যুদ্ধ-প্রান্তর নরকঙ্কালে আবৃত রহিয়াছে। *

স্রুঘন রাজ্য। †

এই রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গা প্রবাহিতা, উত্তরে হিমালয় অবস্থিত। স্রুঘন রাজ্যের পরিমাণফল ৬ হাজার লি। ইহার রাজধানী চক্রাকারে

* হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার পুস্তকে মহাভারতের এইরূপ বিকৃত বিবরণ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

† পুরাকালে স্রুঘণরাজ্যে কুরুবংশীয় নৃপতিদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রায় ২০ লি। ইহার পূর্ব্ব পার্শ্বে যমুনা প্রবাহিতা। শ্রুঘন রাজ্যের লোক সত্যপ্রিয় ও সরলস্বভাব। এই রাজ্যে সঙ্ঘারামের সংখ্যা পাঁচ, এবং শ্রমণের সংখ্যা এক সহস্র। শ্রমণগণ প্রায় সকলেই হীনযান-মতাবলম্বী; অন্য মতাবলম্বীদিগের সংখ্যা অতি অল্প। এই রাজ্যে একশত দেবমন্দির বিদ্যমান।

যমুনার পূর্ব্ব দিকে ৮ শত লি দূরে গঙ্গা প্রবাহিতা। গঙ্গার জল নীলাভ এবং তাহার তরঙ্গ সাগরোর্ম্মির মত আবর্ত্তিত। ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থে গঙ্গা ধর্ম্মনদী নামে অভিহিত। এই নদীর জলে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। যাহারা জীবনে বীতস্পৃহ, তাহারা গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জ্জন করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে, এবং তাহাদের আত্মা পরলোকে পরম সুখ ভোগ করে। কাহারও মৃত্যুর পর তাহার অস্থি গঙ্গাজলে অর্পিত হইলেও তাহার আত্মার সদ্গতি হয়।

গঙ্গা।

মতিপুর। (১)

মতিপুর রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ছয় হাজার লি, রাজধানী প্রায় ২০ লি। এই দেশের অধিপতি শূদ্র বংশ জাত। তিনি দেবোপাসক; বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস নাই। জনপুঞ্জ সত্যপ্রিয় ও সরলস্বভাব। তাহারা শিক্ষার সম্মানকারী এবং যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। তাহাদের একার্দ্ধ সত্য ধর্ম্মাবলম্বী, অপরার্দ্ধ অপধর্ম্মে বিশ্বাসী। মতিপুর রাজ্যের ভূমিতে নানাবিধ ফুলফল জন্মে।

রাজধানী হইতে ৪।৫ লি দূরে একটি ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম পরিদৃষ্ট হয়।

(১) মতিপুর রাজ্য বর্ত্তমান পশ্চিম রোহিলাখণ্ডের অন্তর্গত মুন্দোর, বিজনর প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত ছিল। মেগাস্থিনিস স্বগ্রন্থে মতিপুর রাজ্যের অধিবাসীদিগকেই মথই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

এইস্থানে প্রায় ৫০ জন শ্রমণ বাস করিতেছেন। পুরাকালে এই সঙ্ঘারামে গুণপ্রভ নামক বৌদ্ধ আচার্য্য বাস করিতেন। তিনি বৌদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিলেন।

বৌদ্ধ উপাখ্যান।

তিনি প্রথমতঃ মহাযান মতে বিশ্বাস করিতেন, তারপর মত পরিবর্ত্তন করিয়া হীনযান মতাবলম্বী হন। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি নানা সন্দেহে পতিত হন। এই সময় দেবসেনা নামক একজন অর্হৎ দৈববলে স্বর্গে গমনাগমন করিতেন। আচার্য্য গুণপ্রভ মৈত্রেয়-বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার সন্দেহ সকলের মীমাংসা করিয়া লইতে সংকল্প করেন এবং তদর্থ অর্হৎ দেবসেনার সহায়তা প্রার্থী হন। তাঁহার দৈববলপ্রভাবে গুণপ্রভ মৈত্রেয়ের নিকট নীত হন, কিন্তু আত্মমদের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সমুচিতভাবে অর্চ্চনা করিতে অস্বীকার করেন এবং তজ্জন্য অভীষ্ট উপদেশ লাভ করিতে অসমর্থ হন।

আচার্য্য গুণপ্রভের সঙ্ঘারামের উত্তর দিকে আর একটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে শাস্ত্রাধিকারী সঙ্ঘভদ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। সঙ্ঘভদ্র কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা এবং তীক্ষ্ণদর্শিতা ছিল। সঙ্ঘভদ্র বিভাস শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। তৎকালে বসুবন্ধু জীবিত ছিলেন। তিনি বিভাস শাস্ত্র খণ্ডন করিয়া অভিধর্ম্ম শাস্ত্রকোষ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল এবং মার্জ্জিত, যুক্তি সকল সাতিশয় উন্নত এবং সুকৌশলে বিন্যস্ত। সঙ্ঘভদ্র বসুবন্ধুর মত খণ্ডন জন্য অভিনব শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। অতঃপর তিনি বসুবন্ধুর সঙ্গে বিচার করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু এই বিচার আরম্ভের পূর্ব্বেই হঠাৎ সঙ্ঘভদ্রের মৃত্যু উপস্থিত হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বপ্রণীত গ্রন্থের প্রচারকল্পে প্রতিদ্বন্দ্বী বসুবন্ধুকে অনুরোধ করিয়া লিপি প্রেরণ করেন। বসুবন্ধু এই লিপি পাঠ করিয়া চিন্তামগ্ন হন এবং সঙ্ঘভদ্রের গ্রন্থের প্রচার কল্পে তাহার নাম "ন্যায়ানুসার শাস্ত্র" রাখেন।

মতিপুর দেশে বিমল মিত্র নামক আর একজন অশেষ শাস্ত্রাধিকারী বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বাস্তিবাদ মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি পঞ্চনদ প্রদেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ এবং বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সমগ্র ত্রিপিটক তাঁহার অধিগত ছিল। বিমল মিত্র স্বকার্য্য সাধন করিয়া এবং বিপুল যশোভাগী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অভিলাষী হন এবং তদর্থ মতিপুর পরিত্যাগ করেন। বিমল মিত্র পথিমধ্যে সঙ্ঘভদ্র-স্তূপ দর্শন করেন, এই স্তূপ দর্শনে সঙ্ঘভদ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বসুবন্ধুর কীর্ত্তি-কলাপ তাঁহার স্মৃতিতে উদিত হয়। বসুবন্ধুর অপকীর্ত্তি তাঁহার ঈর্ষ্যার উদ্রেক করে। তিনি মহাযান মতের বিনাশ সাধন করিয়া বসুবন্ধুর কীর্ত্তি ধ্বংস এবং তারপর সেই বিনষ্ট কীর্ত্তির ভিত্তিতে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিতে অভিলাষী হন। ঈদৃশ দুরাকাঙ্ক্ষার উদয় মাত্র তাঁহার জিহ্বা বহির্গত হইয়া পড়ে এবং উষ্ণ রক্ত সঞ্চালিত হইয়া উঠে। তিনি মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনা প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যবৃন্দ সে স্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

মতিপুর রাজ্যের অন্তর্গত মায়াপুর (বর্ত্তমান হরিদ্বার) চক্রাকারে ন্যূনাধিক ২০ লি বিস্তৃত এবং জনাকীর্ণ। মায়াপুরের চারিদিকে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা প্রবাহিতা। মায়াপুর হইতে অদূরে গঙ্গাতীরে বিরাট দেবমন্দির দণ্ডায়মান। এই স্থানে বহুবিধ অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়। মধ্যভাগে একটি সুদৃশ্য তড়াগ ইহার শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। ইহা কৃত্রিমসরিৎ-যোগে গঙ্গাজলে পূর্ণ। এই স্থানে পাপক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয় হয়। বহু দূরদেশ হইতে শত সহস্র যাত্রী গঙ্গাস্নানের জন্য এই স্থানে সমবেত হয়। বদান্য রাজগণ মায়াপুরে পুণ্যশালা সংস্থাপিত করিয়াছেন ; সেই সকলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আবশ্যক পরিমাণ অর্থ উৎসৃষ্ট হইয়াছে। এই

হরিদ্বার।

সকল পুণ্যশালায় বিধবা, শোকাতুর, অনাথ, শিশু ও দীনদরিদ্রগণ সুখাদ্য ও ঔষধ প্রাপ্ত হয়। মায়াপুর গঙ্গাদ্বার নামে খ্যাত।

কান্যকুব্জ।

কান্যকুব্জ রাজ্য চক্রাকারে ৪ হাজার লি। ইহার রাজধানী শুষ্ক-পরিখাবেষ্টিত এবং একাধিক সুদৃঢ় ও উন্নত দুর্গদ্বারা সংরক্ষিত। কান্য-কুব্জ নগরের (রাজধানী) সর্ব্বত্র পুষ্পোদ্যান, বৃক্ষবাটিকা ও দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। কান্যকুব্জ বাণিজ্যস্থান। এই স্থানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য বিপুল পরিমাণে আমদানী হয়। এই রাজ্যের অধিবাসীরা ধনশালী ও সন্তোষসুখে সুখী। তাহাদিগের বাসগৃহ সুগঠিত ও সুসজ্জিত। এ রাজ্যের সর্ব্বত্র ফুল ও ফল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই স্থানের প্রকৃতিপুঞ্জ যথাসময়ে ক্ষেত্রকর্ষণ ও শস্যকর্ত্তন করিয়া থাকে। কান্যকুব্জ রাজ্যের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ ও অধিবাসী-দিগের আচার ব্যবহার সরল ও ন্যায়ানুগত। তাহাদিগের আকৃতি সুন্দর ও আনন্দবর্দ্ধক। তাহারা কারুকার্য্যখচিত উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করে। কান্যকুব্জবাসীরা অধ্যয়নশীল ও ধর্ম্মালোচনার অনুরাগী। তাহাদের বিশুদ্ধ ভাষার খ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। কান্যকুব্জ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা সমান। এ রাজ্যে শতাধিক সঙ্ঘারাম ও দশ সহস্র শ্রমণ বিদ্যমান। রাজ্যমধ্যে দুই শত হিন্দুদেবমন্দির আছে।

আমাদিগের বর্ণিত এই রাজ্যের রাজধানীর প্রাচীন নাম কুসুমপুর। বর্ত্তমান নাম—কান্যকুব্জ; তদনুসারে রাজ্যের নামও কান্যকুব্জ হই-য়াছে। কুসুমপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া কান্যকুব্জ নাম প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

মহাবৃক্ষ ঋষির উপাখ্যান।

পুরাকালে গঙ্গাতীরে একজন ঋষি বাস করিতেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল সমাধিস্থ ছিলেন। তৎকালে পক্ষীর চঞ্চু হইতে

তাঁহার স্কন্ধে (ন্যগ্রোধ) বৃক্ষের বীজ পতিত হয় ও বৃক্ষ জন্মে। এই জন্য তিনি লোকসমাজে মহাবৃক্ষ ঋষি নামে পরিচিত ছিলেন। সুদীর্ঘকাল পরে ঋষির সমাধি ভঙ্গ হয়। একদা তিনি নদীতীরে পরিভ্রমণকালে কুসুমপুর-সিংহাসনাধিপতির নৃত্যপরা শত কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের রূপলাবণ্যদর্শনমাত্র মোহিত হইয়া পড়েন ও রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট একজন কুমারীর কর প্রার্থনা করেন। কিন্তু একে একে সকল কুমারীই সেই জড়ভাবাপন্ন ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে রাজা ব্রহ্মশাপভয়ে ম্রিয়মাণ হইলে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা ঋষির বাসনা পূর্ণ করিতে সম্মত হয়েন। অতঃপর রাজা ব্রহ্মদত্ত কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ঋষির নিকট গমন করিলেন। ঋষি সর্ব্বকনিষ্ঠা কুমারীকে অবলোকন করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার শাপে অবশিষ্ট কুমারীরা কুব্জত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি কুসুমপুর কুব্জা রাজকুমারীদিগের বাসস্থান বলিয়া কান্যকুব্জ আখ্যা লাভ করিয়াছে।

কান্যকুব্জ রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতির নাম হর্ষবর্দ্ধন। তিনি বৈশ্য কুলজাত।* তাঁহার পিতার নাম প্রভাকর বর্দ্ধন। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজ্যবর্দ্ধন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরকালমধ্যেই কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের হস্তে পরাজিত ও নিহত হয়েন। তখন মন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সংবাদ

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য।

* চৈনিক পরিব্রাজক হর্ষবর্দ্ধনকে বৈশ্য কুলজাত লিখিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে কানিংহাম সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, Vaisya is here, perhaps the name of a Rajput Class, not the mercantile class or Caste among the Hindus. Baiswara, the country of Bais Rajputs comprises nearly the whole of Southern Oudh.

প্রচার করেন। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শিলাদিত্য পরাক্রমশালী। তিনি রাজ্যের নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারে সফলশ্রম হয়েন। তাঁহার বাহুবলে বহু নরপতি পরাজিত হইয়াছেন এবং কান্যকুব্জ রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইযাছে। শিলাদিত্য রাজ্যস্থিত সমস্ত সৈন্য সম্মিলিত করেন, সেনানায়ক দিগকে আহ্বান করেন। তাঁহাদের পাঁচ হাজার রণহস্তী, দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। যাহারা তাঁহার অনুগত নহে, তাহাদিগকে পরাজিত করিতে করিতে মহারাজ শিলাদিত্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে যাত্রা করেন। ছয় বৎসর অন্তে পঞ্চ ভারতের বিজয় কার্য্য সম্পন্ন হয়।(১) তিনি রাজ্য পরিবর্দ্ধন করিয়া আপন সৈন্যবলের বৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁহার ষাইট হাজার রণহস্তী এবং এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার বিজয় বাহু বিশ্রাম লাভ করে, এবং তিনি শান্তিতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে থাকেন।

শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী। তিনি সংযমাচার সাধন জন্য সমস্তই করিতেন, ধর্ম্মবল লাভ জন্য এতদূর উদ্যোগী ছিলেন যে, আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইতেন। শিলাদিত্য জীবহত্যা ও মাংসাহার সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন; এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে প্রাণদণ্ডের

(১) মহারাজ শিলাদিত্য পঞ্চভারত অর্থাৎ ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজকগণ সমস্ত ভারতবর্ষ পাঁচভাগে (Five Indies) বিভাগ করিয়াছেন, যথা, ১ম, উত্তর ভারত, এই ভাগ সিন্ধু নদের পশ্চিম প্রদেশ হইতে সরস্বতী নদীর পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ২য়,—পশ্চিম ভারত, সিন্ধুদেশ, পশ্চিম রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি এই অংশের অন্তর্গত। ৩য়,—মধ্যভারত, থানেশ্বর হইতে নর্ম্মদার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র অন্তর্গাঙ্গ প্রদেশ এই বিভাগ ভুক্ত। ৪র্থ—পূর্ব্ব ভারত, আসাম, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং গঞ্জাম, এই বিভাগের অন্তর্গত। ৫ম—দক্ষিণ ভারত।

ব্যবস্থা রহিয়াছে। তিনি নানাস্থানে বহু সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশে বুদ্ধদেবের প্রত্যেক পবিত্র চিহ্নস্থানে সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে চিকিৎসালয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকগণ চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

শিলাদিত্য প্রতি বৎসর সমস্ত দেশ হইতে শ্রমণদিগকে সম্মিলিত করিয়া থাকেন। এই সম্মিলনের তৃতীয় এবং সপ্তম দিবসে মহারাজা খাদ্য, পানীয়, ঔষধ এবং বস্ত্র, এই চতুর্ব্বিধ বস্তু দান করেন। শ্রমণবৃন্দ সমবেত হইয়া বিচার বিতর্কে নিরত হন। মহারাজা স্বয়ং তাঁহাদের বিচারের ন্যায্যান্যায্য অবধারণ করেন। তিনি গুণীর পুরস্কার এবং দোষীর দণ্ড বিধানে তৎপর। তাঁহার নিকট ধর্ম্মভাব এবং পবিত্র চরিত্র সমাদর লাভ করে; কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রজ্ঞাশালী হইলে অধিকতর সমাদর প্রাপ্ত হন। নীতিহীনতা এবং কদাচার তাঁহার অসহ্য। তিনি তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। যদি পার্শ্ববর্ত্তী কোন অধিপতি অথবা প্রধান মন্ত্রী জীবনে ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং সাধু চরিত্র লাভ জন্য অভিলাষী হন, তবে মহারাজা তাঁহাকে হস্তধারণ করিয়া আপন আসনে উপবেশন জন্য আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত বান্ধব নামে অভিহিত করিতে প্রবৃত্ত হন। শিলাদিত্য সমস্ত দিবস তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগে তিনি শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; দ্বিতীয় ভাগ ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

মোক্ষ মহাসম্মিলনী।

পঞ্চবর্ষের ব্যবধানে শিলাদিত্য মোক্ষ নামে ধর্ম্ম সম্মিলনী আহ্বান করেন এবং সেই সময় মুক্ত হস্তে দান করেন। তৎকালে দানের অযোগ্য অস্ত্রাদি ব্যতীত আর সকল দ্রব্যই বিতরিত হইত।

একবার মহারাজ শিলাদিত্য পরিদর্শন উপলক্ষে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কজিনঘর নামক এক ক্ষুদ্ররাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে আমি নালন্দার বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন কামরূপের অধিপতি কুমাররাজও নালন্দার বিহারে বাস করিতেছিলেন। মহারাজ শিলাদিত্য আমাদিগকে তাঁহার সমীপে গমন জন্য কুমাররাজকে আদেশ করিয়াছিলেন। এই কারণে আমি কুমাররাজের সমভিব্যাহারে তাঁহার সকাশে গমন করি। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চীনদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। আমার উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শিলাদিত্য স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে ধর্ম্মসম্মিলনী আহ্বান করেন এবং শত সহস্র লোক সমভিব্যাহারে গঙ্গার তীরবর্ত্তী পথে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এই বিপুল জনসঙ্ঘ নবতি দিবস পরে কান্যকুব্জে উপনীত হইয়াছিল।

অতঃপর শিলাদিত্যের আমন্ত্রণে বিংশতি দেশের অধিপতিরা স্ব স্ব অধিকারের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের সহিত আগমন করেন। শিলাদিত্যের আমন্ত্রিত ধর্ম্মসম্মিলনী উত্তর ভারতে রাজকীয় মহোৎসব-স্বরূপ ছিল। মহারাজ শিলাদিত্য এই সুবৃহৎ জনসঙ্ঘের বাসজন্য গঙ্গার পশ্চিম দিকে একটি বিরাট্ সঙ্ঘারাম ও পূর্ব্বদিকে একটি এক শত ফিট উচ্চ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সঙ্ঘারামের ও দুর্গের মধ্য-স্থলে বুদ্ধদেবের পূর্ণকায় স্বর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বসন্তকালের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশ দিবস পর্য্যন্ত এই মহোৎসব সম্পাদিত হয়। এই মহোৎসবকালে শিলাদিত্য ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সম্প্রদায়কেই সমান সমাদর করিয়া নানাবিধ সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সঙ্ঘারাম হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান বহুসংখ্যক পটমণ্ডপে পরিশোভিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মধ্যে নহবতের জন্য সংস্থাপিত উচ্চ মঞ্চ হইতে সুমধুর বাদ্যধ্বনি উত্থিত

হইত। মহোৎসবকালে প্রত্যহ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিসহ শোভাযাত্রা হইত। এই সময় সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের স্বর্ণমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া তাহার বাম পার্শ্বে ইন্দ্রের ন্যায় পরিচ্ছদ-পরিহিত শিলাদিত্য চন্দ্রাতপ ধারণ পূর্ব্বক ও দক্ষিণ পার্শ্বে কুমাররাজ ব্রহ্মার বেশে চামর হস্তে গমন করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রক্ষিরূপে পাঁচশত রণহস্তী থাকিত। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধমূর্ত্তির পুরোভাগে এবং পশ্চাদ্ভাগে এক শত হস্তী গমন করিত; ইহাদের পৃষ্ঠে বাদক ও গায়কগণ উপবিষ্ট থাকিত। শোভাযাত্রাকালে শিলাদিত্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ত্রিরত্নের সম্মান জন্য মণি, মুক্তা, নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত কুসুম বিতরিত হইত। অতঃপর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ধৌত করা হইত। তাহার পর শিলাদিত্য সেই মূর্ত্তি স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া পশ্চিম দুর্গে গমন এবং তথায় তাহার বেশভূষার জন্য মহার্ঘ রত্নখচিত সহস্র সহস্র পরিচ্ছদ উৎসর্গ করিতেন। এই সকল ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে বিপুল আড়ম্বরে ভোজ হইত, এবং তাহার পর বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া সুগভীর পাণ্ডিত্যসহকারে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে মহারাজ বিশ্রামলাভার্থ স্বীয় প্রাসাদে গমন করিতেন। মহা-সম্মিলনীর প্রত্যেক দিন মহারাজ শিলাদিত্য এইরূপ আড়ম্বর সহকারে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বহন করিতেন। *

* মহারাজ শিলাদিত্য ভারতবর্ষের অন্যতম প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তদীয় বীরত্ব, বিদ্যানুরাগ, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দানশীলতা কিম্বদন্তীতে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার সভা কোবিদবৃন্দে পরিশোভিত থাকিত। বিখ্যাত বাণভট্ট তাঁহার সভাসদ ছিলেন। শিলাদিত্য স্বয়ং সংস্কৃত-রচনায় পারদর্শী ছিলেন; তাঁহার রচনা ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের প্রাচুর্য্যে সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, 'নাগানন্দের' অভিনয়কালে শিলাদিত্য স্বয়ং জীমূতবাহনের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।

অযোধ্যা।

অযোধ্যারাজ্য চক্রাকারে ৫ হাজার লি এবং ইহার রাজধানী প্রায় ২০ লি। এই দেশে ফুল ও ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এ দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ—প্রীতিপ্রদ। অযোধ্যাবাসীরা ধর্ম্মচর্য্যায় তৎপর এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী। এই দেশে ন্যূনাধিক এক শত সঙ্ঘারাম এবং দশটি দেবমন্দির আছে। অযোধ্যারাজ্যে শ্রমণের সংখ্যা তিন সহস্র। তাঁহারা মহাযান ও হীনযান, উভয়মতানুগত শাস্ত্র-গ্রন্থই অধ্যয়ন করেন। অযোধ্যা রাজ্যের দেবমন্দিরে যে সকল অপধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন, তাঁহারা নানাসম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক নহে।

প্রয়াগ।

প্রয়াগরাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি। এই রাজ্যের রাজধানী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই দেশে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ফলবৃক্ষ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। এ দেশ উষ্ণ। ইহার অধিবাসীরা মৃদুস্বভাব। তাহারা বিদ্যানুরাগী। এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অল্প এবং দুইটি মাত্র সঙ্ঘারাম আছে। কিন্তু অপধর্ম্মাবলম্বীরা বহুসংখ্যক!

প্রয়াগ তীর্থ

প্রয়াগরাজ্যের রাজধানীতে একটি সুন্দর মন্দির আছে। অপধর্ম্মাবলম্বীদিগের পুরাণেতিহাসে এই দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; জীবমাত্রেই এই স্থানে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে। যদি কেহ এই মন্দিরে সামান্য অর্থদান করে, তবে অন্যত্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিলে যে ফল লাভ হয়, সে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যদি কেহ জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এই মন্দিরে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তবে পরকালে তাহার আত্মার

অক্ষয় সুখলাভ ঘটে। আমাদিগের বর্ণিত এই দেবমন্দিরের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দণ্ডায়মান, দেখিতে পাওয়া যায়।*

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রত্যহ শত শত লোক স্নান করে ও প্রাণত্যাগ করে। এ দেশের লোকের বিশ্বাস, স্বর্গকামীর পক্ষে তণ্ডুল কণামাত্রও গ্রহণ না করিয়া উপবাসে নদীজলে জীবন বিসর্জ্জন করা আবশ্যক। তাহাদিগের বিশ্বাস, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। এই জন্য বহুদূর হইতে এবং নানা স্থান হইতে বহুলোক এই স্থানে সমাগত হইয়া সপ্তাহকাল উপবাস করিয়া জীবনান্ত করে।

নদীর মধ্যস্থলে একটি স্তম্ভ আছে। অপধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীরা সূর্য্যাস্তকালে এই স্তম্ভে আরোহণ করিয়া এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যের স্তুতি ও বন্দনা করিয়া থাকেন।

এই স্তম্ভ হইতে অদূরে নদীতটে দানবেদী নির্ম্মিত আছে। তথায় রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ দানকার্য্য সম্পাদন করেন। বর্ত্তমান সময়ে শিলাদিত্য পূর্ব্বপুরুষগণের অনুকরণে পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্ন বিতরণ করিতেছেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সুসজ্জিত করিয়া সেই মূর্ত্তিকে মহার্ঘ রত্নাদি প্রদান করেন ও পরে স্থানীয় আচার্য্যগণকে দান করেন। ইহার পর দূরাগত আচার্য্যগণের পর্য্যায় উপস্থিত হয়। তৎপরে ক্রমে বিখ্যাত কোবিদগণ ও স্থানীয় অপধর্ম্মাবলম্বীরা ধনরত্ন লাভ করেন। সর্ব্বশেষে দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে ধন বিতরণ করা হয়। এইরূপ দানে রাজভাণ্ডার শূন্য হইলে রাজা স্বীয় মুকুট ও অন্যান্য রত্নাভরণ দান করেন। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দানে শিলাদিত্য অবিচলিত থাকেন এবং দানশেষে সানন্দে ঘোষণা করেন—"সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে।

* অক্ষয় বট বৃক্ষ।

আমার যত ধন সম্পদ্ ছিল, সবই অপাপবিদ্ধ—অক্ষয় কোষে নীত হইয়াছে।” অতঃপর করদরাজগণ স্ব স্ব রত্ন ও পরিচ্ছদ শিলাদিত্যকে প্রদান করেন, এবং তাহাতে তদীয় রাজকোষ পুনরায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

গর্জ্জপতিপুর (গাজিপুর)।

গর্জ্জপতিপুর রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ২ হাজার লি। ইহার রাজধানী গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং ইহার পরিধি প্রায় ১০ লি। এই রাজ্যের অধিবাসীবর্গ ধনশালী। এই স্থানে নগর ও পল্লীসমূহ পরস্পর সংলগ্ন। এ রাজ্যের ভূমি উর্ব্বর ও তাহাতে যথারীতি কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। এ দেশের জলবায়ু প্রীতিকর, প্রকৃতিপুঞ্জ নির্ম্মলচরিত্র, ন্যায়ানুরাগী কিন্তু উগ্রস্বভাব। এ দেশে সত্যধর্ম্মাবলম্বী এবং অপধর্ম্মাবলম্বী উভয়বিধ লোকই দেখা যায়।

বহুকাল পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে তুরখা দেশে দুই কি তিন জন শ্রমণ বাস করিতেন। তাঁহারা জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু ভারতীয়গণ অপরিচিত বিদেশীয় বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয়দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। সেই জন্য ইঁহারা বহু কষ্ট ভোগ করেন। তাঁহারা অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে এবং রৌদ্র-বৃষ্টিতে শুষ্ককায় হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহারা গর্জ্জপতিপুর রাজ্যের রাজধানীর উপকণ্ঠে উপনীত হয়েন। এক দিন পরিভ্রমণকালে রাজা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়েন। এবং কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি ব্যথিত হয়েন এবং তাঁহাদিগের বাসের জন্য একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই সঙ্ঘারাম অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহার প্রাচীরগাত্রে নিম্নলিখিত অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—বুদ্ধের, ধর্ম্মের ও সঙ্ঘের অলৌকিক

কৃপায় আমি দেশাধিপতির পদ লাভ করিয়াছি এবং মনুষ্য মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে সম্মানিত হইয়াছি। আমি মনুষ্যজাতির শাসনাধিকার লাভ করিয়াছি, এই জন্য বুদ্ধদেব ধার্ম্মিক ব্যক্তিমাত্রেরই রক্ষণের ও সন্তোষ-বিধানের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। আমি বিদেশীয়দিগের আশ্রয়ের জন্য এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিলাম।

বৌদ্ধ তীর্থ।

পুরাকালে কপিলবস্তু, গয়া, বারাণসী, রাজগৃহ, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, বৈশালী, কুশীনগর বৌদ্ধগণের মহাতীর্থরূপে পরিগণিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই সকল তীর্থক্ষেত্র এবং তৎচতুর্ব্বর্ত্তী দেশের অবস্থা কীদৃশ ছিল, হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের গ্রন্থে তাহার চিত্রপট দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সে চিত্রপট প্রদর্শন করিতেছি।

শাক্যবংশ-অধিকৃত রাজ্যের প্রধান নগর কপিলবস্তু। এই জনপদে দশটি পরিত্যক্ত নগর বিদ্যমান আছে। তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট এবং জনশূন্য হইয়াছে। লোকবসতিপূর্ণ পল্লীর সংখ্যা অল্প এবং সে সমস্ত উচ্ছিন্নপ্রায়। শাক্য রাজ্যে কোন ছত্রপতি অধিপতি অধিষ্ঠিত নাই। এক এক নগরের শাসনকার্য্য এক এক জন নায়ক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। প্রকৃতিপুঞ্জের হস্তে নায়ক নির্ব্বাচনের ভার ন্যস্ত আছে। ভূমি উর্ব্বরা এবং ফলশস্যপূর্ণ। জলবায়ু সমভাবাপন্ন। লোকের আচার ব্যবহার নম্র ও প্রীতিকর। শাক্যরাজ্যে ন্যূনাধিক এক সহস্র ভগ্ন সঙ্ঘারাম পরিদৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে দুইটি দেবমন্দির বিদ্যমান আছে; এই স্থানে নানা সম্প্রদায়ভুক্ত বিধর্ম্মিগণ পূজা অর্চ্চনা করে।

কপিল বস্তু।

গয়া মগধরাজ্যের অন্তর্গত। গয়া নগরী প্রকৃতির দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত। গয়ার লোকসংখ্যা অল্প। এখানে কেবল এক সহস্রব্রাহ্মণ পরিবারের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ব্রাহ্মণ এক ঋষির সন্তান। মগধাধিপতি তাঁহাদিগকে করদ প্রজারূপে গণ্য করিতে বিরত আছেন, জনসাধারণও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

গয়া।

বারাণসী কাশী রাজ্যের রাজধানী এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বারাণসী জনপূর্ণ। অধিবাসীরা ধনী এবং তাঁহাদের গৃহসজ্জা মহার্ঘ। জনগণ মৃদুস্বভাব এবং দয়াশীল। তাঁহারা ঐকান্তিক যত্নে অধ্যয়নে নিরত। কাশী রাজ্যের অধিকাংশ লোকই বিধর্ম্মী। অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীও দেখিতে পাওয়া যায়। জলবায়ু প্রীতিপ্রদ; ফসল প্রচুর, ফলবৃক্ষ সকল সতেজ, লতাগুল্ম সর্ব্বত্র নিবিড়। এই জনপদের সঙ্ঘারামের সংখ্যা ত্রিংশতি; তৎসমুদয়ে তিন সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা হীনযান মতানুগত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কাশীরাজ্যে ন্যূনাধিক এক সহস্র দেবমন্দির বিদ্যমান। অপধর্ম্মাবলম্বীগণ প্রধানতঃ মহেশ্বরের উপাসক। সন্ন্যাসীদের অনেকে কেশাদি মুণ্ডন করিয়া ফেলেন, আবার অনেকে মস্তকের কেশ কুণ্ডলীকৃত করিয়া রাখেন এবং উলঙ্গভাবে অবস্থিতি করেন। তাঁহারা শরীরে ভস্ম লেপন করেন এবং জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ জন্য সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে নিযুক্ত আছেন।

বারাণসী

রাজধানী বারাণসী নগরীতে বিংশতি সংখ্যক দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। এই সকল দেবমন্দিরের চূড়া ও কক্ষসমূহ মর্ম্মরগ্রথিত, কারুকার্য্য-খচিত এবং ক্ষোদিত কাষ্ঠ-ফলক-শোভিত। তৎসমুদয়ের চতুর্দ্দিকে নির্ম্মলসলিলা পরিখা প্রবাহিতা, চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি নিবিড়

বৃক্ষশ্রেণীর পত্র গুল্মে ছায়াশীতল। মহেশ্বরের মূর্ত্তি তাম্রনির্ম্মিত এবং সমুচ্চ (১০০ ফিট)। সে মূর্ত্তি গম্ভীর ভাবাপন্ন এবং মহিমান্বিত। তদ্দর্শনে দর্শকগণের বোধ হয় যেন জীবন্ত মূর্ত্তি।

রাজগৃহ এক সময়ে মগধের রাজধানী ছিল। এই নগরে প্রাচীন মগধাধিপতিগণ বাস করিতেন। রাজগৃহ চতুর্দ্দিকে সমুচ্চ পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত, ইহা নগরের বহিঃপ্রাচীরের কার্য্য করিতেছে। রাজগৃহ পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। উত্তর দক্ষিণে সংকীর্ণ। সমস্ত রাজপথের পার্শ্বে কনক নামক পুষ্পতরু বিদ্যমান। এই নগর চক্রাকারে দেড় শত লি। নগরের অন্তঃপ্রাচীর চক্রাকারে প্রায় ৩০ লি। এই স্থানে সুগন্ধ কুশতৃণ জন্মে। এজন্য রাজগৃহের নাম কুশগড়পুর হইয়াছে।

পুরাতন রাজগৃহ।

মহারাজ বিম্বিসার কুশগড় পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে ৪ লি দূরে নূতন রাজধানী স্থাপিত করেন। এই নূতন নগরে বিম্বিসার এবং তদীয় পুত্র অজাতশত্রু বাস করিতেন। নূতন রাজগৃহের বহিঃ প্রাচীর বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অন্তঃপ্রাচীর অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু ভগ্নদশা উপনীত হইয়াছে। এই অন্তঃপ্রাচীর চক্রাকারে ৪ মাইল। মহারাজ অশোক এই নগর ব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করিয়া পাটলীপুত্রে গমন করেন। এজন্য এখানে কেবল মাত্র এক সহস্র ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য জাতীয় লোকের বাস নাই।

নূতন রাজগৃহ।

কোশাম্বী (১) একটি রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্য চক্রাকারে ৬০০০ লি। এই জনপদ উর্ব্বরা ভূমির জন্য খ্যাত। ধান্য এবং ইক্ষু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কোশাম্বী ও তৎচতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান বড় গরম; লোকের প্রকৃতি উদ্ধত

কোশাম্বী।

(১) কোশাম্বী যমুনাতীরে অবস্থিত ছিল। অদ্যাপি এলাহাবাদ হইতে ১৫

ও কঠোর। তাঁহারা অধ্যয়নশীল এবং ধর্ম্মচর্য্যা ও সদ্‌গুণ অনুশীলনে তৎপর। দশটি সঙ্ঘারাম এবং পঞ্চাশটি দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। সঙ্ঘারামসমূহের দশা ভগ্ন ও জনশূন্য। অপধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য।

শ্রাবস্তী।

শ্রাবস্তী কোশল রাজ্যের রাজধানী। শ্রাবস্তী নগরীর কেবল ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে; সমস্ত স্থান জনশূন্য ও পরিত্যক্ত। কোশলরাজ্যের জলবায়ু প্রীতিকর। জনসাধারণ বিশুদ্ধচরিত্র এবং সত্যসন্ধ। তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ এবং জ্ঞানানুরাগী। কোশল রাজ্যের সঙ্ঘারামের সংখ্যা বহুশত, কিন্তু প্রায় সমস্তগুলি ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। এই জনপদে একশত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে: তৎসমুদয়ে বহুসংখ্যক অপধর্ম্মাবলম্বী বাস করিতেছে।

বৈশালী।

বৈশালী লিচ্ছবিবংশ-অধিকৃত রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগরী বর্ত্তমান সময়ে ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। বৈশালী এবং তৎ-চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভূমি উর্ব্বরা; ফল ফুল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আম্রফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে; এই ফল লোকের অতিশয় প্রিয়। জলবায়ু প্রীতিকর এবং নাতিশীতোষ্ণ। জনসাধারণ বিশুদ্ধ চরিত্র এবং সত্যসন্ধ। তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ এবং জ্ঞানানুরাগী। এই স্থানে প্রকৃত বিশ্বাসী (বৌদ্ধ) এবং বিধর্ম্মী একসঙ্গে বাস করিতেছে। বহুশত সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তৎসমুদয়ের অধিকাংশই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। চারি পাঁচটি সঙ্ঘারাম বাসযোগ্য আছে। বহুসংখ্যক দেবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

ক্রোশ দূরে ইহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কৌশাম্বী অতি প্রাচীন নগরী. রামায়ণে ইহার উল্লেখ আছে। মেঘদূতে উল্লিখিত উদয়ন নরপতি এইস্থানে রাজত্ব করিতেন; রত্নাবলী নাটকের রঙ্গভূমিও কৌশাম্বী। মহাকবি ভাসের দুইখানি নাটকের নায়কও উদয়ন।

কুশীনগর কুশীরাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যের নগরসমূহ সম্পূর্ণ-রূপে জনশূন্য এবং বিনষ্ট হইয়াছে।

কুশীনগর।

হিউএন্থ্ সঙ্গ স্বগ্রন্থে প্রাগুক্ত তীর্থ সমূহের স্তূপ এবং বিহার ইত্যাদির বর্ণনা এবং তদনুষঙ্গিক বুদ্ধদেবের জীবনের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বুদ্ধদেবের জন্মের পর ঋষি অসিত রাজা শুদ্ধোদনের সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি উল্লাসিত দেবগণের নিকট পরিজ্ঞাত হইয়াছি যে, আপনার নবজাত কুমার কালক্রমে মহাপরিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এই কারণে আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। রাজা শুদ্ধোদনের সহিত ঋষি অসিতের মিলনস্থানে একটি স্তূপ বিদ্যমান আছে।

বুদ্ধদেবের জন্ম

ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। বুদ্ধদেব আজন্ম বিলাসে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রমোদ উদ্যানে গমনকালে জরাভিভূত বৃদ্ধ, পীড়াগ্রস্ত যুবক, শবদেহ এবং প্রশান্তচিত্ত ভিক্ষু দর্শনে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কপিলবস্তুর চতুর্দ্দিকে তোরণ, ইহার এক এক তোরণে বুদ্ধদেব এক এক দৃশ্য দেখিয়াছিলেন ও সেখানে তাঁহার স্মরণচিহ্ন রূপে তদনুরূপ মূর্ত্তি গঠিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির আশ্রয় জন্য বিহার স্থাপিত আছে।

সাধনা ও সিদ্ধি

বুদ্ধদেব ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানবজাতির জরামৃত্যু প্রভৃতি দুঃখভার দর্শনে ব্যথিতচিত্ত হইয়া তৎনিরাকরণ মানসে রাজসম্পদ এবং প্রীতি ও আনন্দের আলয় গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। ইহার নাম মহাভিনিষ্ক্রমণ। মহাভিনিষ্ক্রমণের স্থানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে

দ্রুতগতি শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে রাজকুমার, এইরূপ একটি মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। মহাভিনিক্রমণ অন্তে বুদ্ধদেব নানাস্থানে ছয় বৎসর পাঁচ জন শিষ্য সঙ্গে কঠোর তপশ্চর্য্যা করেন, কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রিয় বিজয়, পাপ চিন্তার মূলোৎপাটন এবং মনের স্থৈর্য্য সাধিত না হওয়াতে তিনি শারীরিক নিগ্রহ নিরর্থক বলিয়া বিবেচনা করেন, ও তজ্জন্য নিয়মিত ভাবে পানাহার এবং বস্ত্র পরিধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তদীয় শিষ্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহাকে ধর্ম্মপথবিচ্যুত বিবেচনা করিয়া অন্যত্র গমন করেন। তখন বুদ্ধদেব নিঃসঙ্গ অবস্থায় চিন্তা করিতে করিতে নৈরঞ্জনা নদীর কূলে উরুবিল্ব নামক স্থানে (১) অচেতন হইয়া পড়েন। চৈতন্য লাভ করিয়া সম্মুখে সুজাতা নাম্নী ধনীকন্যাকে পরমান্ন হস্তে উপস্থিত দেখিতে পান। (২) বুদ্ধদেব পরমান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক আহার করেন এবং তাহাতে বলিষ্ঠ হইয়া বৃক্ষতলে গমনপূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হন। এই সময় 'মার' রাজা আগমন করিয়া বুদ্ধদেবকে চক্রবর্ত্তী রাজপদ প্রদান করিবার প্রলোভন প্রদর্শন করে। কিন্তু সে প্রলোভনে তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত না হওয়াতে মার রাজা দুঃখিত অন্তঃকরণে প্রস্থান করিল। অতঃপর তাঁহার রূপসী কন্যাগণ আগমন পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের সম্মুখে চিত্তমোহকর প্রলোভনচ্ছটা বিস্তার করিল। এবারও বুদ্ধদেব জয়লাভ করেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক বলে রূপসীগণের তরুণ যৌবনের পরিবর্ত্তে জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বিমর্ষচিত্তে যষ্টিতে ভর করিয়া স্বস্থানে গমন করেন। এই

(১) এই স্থান বর্ত্তমান বুদ্ধগয়া হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

(২) সুজাতা পুত্র লাভ করিলে অন্নদানে দেব অর্চ্চনা করিবেন বলিয়া মানস করিয়াছিলেন। মনস্কামনা পূর্ণ হওয়াতে তিনি পরমান্ন সহ নদীতীরে উপনীত হন এবং সেখানে দিব্যদর্শন বুদ্ধদেবকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে উদ্দিষ্ট দেবতা বিবেচনায় আনন্দে তাঁহার সম্মুখে পরমান্নের পাত্র ধারণ করেন।

বিজয়ক্ষেত্রে দুইটি স্তূপ বিদ্যমান আছে। বুদ্ধদেব রিপুজয় করিয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হন এবং সেই ধ্যানে সত্যালোক দর্শন করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যে বৃক্ষতলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহা বোধিদ্রুম নামে খ্যাত। এই বৃক্ষ চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; প্রাচীর সুদৃঢ় ও উন্নত, ইহা চক্রাকারে ১২৫০ ফিট। দুষ্প্রাপ্য তরুশ্রেণী সুন্দর পুষ্পদলে শোভিত হইয়া বোধিদ্রুমের ছায়ার সঙ্গে ছায়া মিশাইয়া সমস্ত স্থানটি ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। ভূমিতল নানা কোমল তৃণে মণ্ডিত। বোধিদ্রুম পরিবেষ্টনকারী প্রাচীরের সর্ব্বপ্রধান দ্বার পূর্ব্বমুখ, সম্মুখে নৈরঞ্জনা নদী প্রবাহিতা; দক্ষিণ দ্বার পুষ্পোদ্যান সংলগ্ন; পশ্চিম দ্বার বদ্ধ এবং দুরতিক্রম্য; উত্তর দ্বার সঙ্ঘারাম সংযুক্ত। (১) ঐ প্রাচীরাভ্যন্তরে কোন স্থানে স্তূপ, কোন স্থানে বিহার,—সর্ব্বত্র পবিত্র ঘটনা সমূহের স্মরণচিহ্ন বিদ্যমান আছে। বৌদ্ধধর্ম্মবিশ্বাসী রাজা, রাজকুমার এবং পরম সৌগত প্রভৃতি মহোদয়গণ এই সমস্ত কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধ গয়া।

বোধিদ্রুমের পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ দূরে ১৬০ কি ১৭০ ফিট উচ্চ একটি বিহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের মণিমুক্তাখচিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের বর্ণিত এই অট্টালিকা নীলবর্ণ

*(১) এই সঙ্ঘারামের নাম মহাবোধি সঙ্ঘারাম। সিংহল দ্বীপের এক জন নরপতি ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহাবোধি সঙ্ঘারামের কক্ষের সংখ্যা ছয়; পর্য্যবেক্ষণ মন্দিরসকল ত্রিতল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে ইহার চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় সমুচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মহাবোধি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণে শিল্পনৈপুণ্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে; কারুকার্য্য অঙ্কন জন্য মহার্ঘ রং (লাল ও নীল) ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সঙ্ঘারামে যে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত এবং মণিমুক্তাখচিত।

ইষ্টক গ্রথিত এবং শ্বেতচূর্ণ আস্তৃত। সমস্ত অট্টালিকাটি একাধিক তল-বিশিষ্ট; প্রত্যেক তলের কুলুঙ্গি সকলে স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপিত। ইহার চতুষ্পার্শ বিচিত্র কারুকার্য্যে শোভিত, পূর্ব্ব মুখে নাটমন্দির বিদ্যমান, এই নাটমন্দিরও একাধিক তলবিশিষ্ট; ইহার উদ্গত ছাঁচ (eaves) একটির উপর আর একটি উত্থিত হইয়া তিনটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের ন্যায় উচ্চ হইয়াছে। উদ্গত ছাঁচ, স্তম্ভ, কড়িকাঠ, দ্বার, বাতায়ন, সমস্তই স্বর্ণ রৌপ্যের কারুকার্য্যখচিত, তৎসমুদয়ের সন্ধিস্থল পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে মণিমুক্তা সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক তলের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ এবং গুপ্ত কক্ষের দ্বার আছে। বহিঃতোরণের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থিত কুলুঙ্গি প্রকোষ্ঠের ন্যায় প্রশস্ত; দক্ষিণ পার্শ্বে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের এবং বাম পার্শ্বে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তিদ্বয় রৌপ্যনির্ম্মিত এবং দশ ফিট উচ্চ (১)

শশাঙ্ক রাজার উপাখ্যান।

শশাঙ্করাজা অপধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের কুৎসা ঘোষণা করেন এবং ঈর্ষ্যাকুল হইয়া বৌদ্ধমঠ এবং বোধিদ্রুম বিনষ্ট করিয়া ফেলেন; কিন্তু ভূগর্ভের শেষ সীমা পর্য্যন্ত খনন করিয়াও উহার মূল উৎপাটন করিতে অসমর্থ হন। অতঃপর তিনি অগ্নি সংযোগে মহাবৃক্ষ দগ্ধ করেন এবং ভস্মরাশির উপর ইক্ষুরস ছিটাইয়া দেন। এই ঘটনার কতিপয় মাস অন্তে মহারাজ অশোকের শেষ বংশধর পূর্ণবর্ম্ম এই সংবাদ অবগত হন, এবং তৎশ্রবণে দুঃখিত অন্তঃকরণে বলেন, 'জ্ঞানসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, এখন কেবল বোধিদ্রুম অবশিষ্ট ছিল, তাহাও

(১) কথিত আছে যে, মহাদেব মহেশ্বরের আদেশে একজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই মনোরম বিহার নির্ম্মিত হয়। ব্রাহ্মণ তপস্যা করিয়া মহাদেব মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে গমন করে। এই সময়ে বোধিক্ষেত্রে বিহার নির্ম্মাণ জন্য প্রত্যাদেশ হয়।

তাহারা ধ্বংস করিয়াছে। এখন আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস কোথায় রহিল।" এই ভাবে আক্ষেপ করিয়া দুঃখে ভূপতিত হন এবং তারপর চিত্ত সংযম করিয়া বৃক্ষমূলে এক সহস্র গাভীর দুগ্ধ সেচন করেন। ইহার ফলে এক রাত্রিতেই ঐ বৃক্ষের পুনরুদ্গম হয় এবং ১০ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। পুনরায় বোধিদ্রুম বিনষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া পূর্ণবর্ম্ম তাহার চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তর দ্বারা ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

রাজা শশাঙ্ক কেবল বোধিদ্রুম ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; তিনি বুদ্ধ মূর্ত্তিরও ধ্বংস সাধন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ মনোরম মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার চিত্তের শান্তি ও দৃঢ়তা বিলুপ্ত হয়। তিনি এজন্য সদলে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করেন পথিমধ্যে তিনি এক জন অমাত্যকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অপসারণ করিয়া সেখানে মহেশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আদেশ দেন। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অমাত্য বিবেচনা করিলেন, "রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিলে কল্পে কল্পে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, আর রাজাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিলে নৃশংসভাবে নিহত হইতে হইবে।" এ কারণ তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এক জন প্রকৃত বিশ্বাসীর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার সহায়তায় বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে প্রাচীর উত্তোলন করিয়া সেখানে মহেশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়েন, তাঁহার অঙ্গে ঘা হইয়া মাংস খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে এবং অবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন রাজামাত্য তাড়াতাড়ি ঐ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ফেলেন। বুদ্ধমূর্ত্তি এখনও অটুট রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে স্থাপিত আছে। সেখানে আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। এইজন্য প্রাতঃকালে সূর্য্যালোক সম্মুখবর্ত্তী দর্পণে প্রতিফলিত,

করিয়া তাহা দেখিতে হয়। ঐ সমস্ত দর্শনে লোকের আধ্যাত্মিকতা সবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মহারাজ অশোক বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের নামে তিন বার সমগ্র জম্বু দ্বীপ উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন। মহারাজ অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া অপধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বশতঃ এই বোধিদ্রুম বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করেন। কিন্তু ধূমরাশি বিলীন হইবা মাত্রই সমস্ত দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিয়াছিল যে, একটি বৃক্ষের স্থানে দুইটি বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অলৌকিক ঘটনায় অশোক রাজার পাপদিগ্ধ চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িল; তিনি স্বীয় অপকার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং সমস্ত বৃক্ষে সুগন্ধ দুগ্ধ সেচন করিয়া দেন। অতঃপর এক রাত্রি মধ্যে বোধিদ্রুম পুনর্ব্বার শাখা প্রশাখায় শোভিত হইয়া উঠে।

মহারাজ অশোক এবং বোধিদ্রুম।

ভারতীয় ভিক্ষুগণ বর্ষাকালে মহাবোধি সঙ্ঘারামে বিশ্রাম করেন। তাঁহাদের বিশ্রামকালের অবসান হইয়া আসিলে বহু দিগ্দেশ হইতে সহস্র সহস্র সৌগত বোধিক্ষেত্রে উপনীত হন। তাঁহারা ক্রমাগত সপ্ত অহোরাত্র বোধিক্ষেত্রের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন, এবং তৎকালে পুষ্প বর্ষণে, ধূপধূনাদি দানে এবং গীতবাদ্যাদিতে নিরত থাকেন। এই সময় তাঁহারা পূজা অর্চ্চনা ও দানাদি কার্য্যও সম্পন্ন করেন।

বার্ষিক বোধিক্ষেত্র উৎসব।

বুদ্ধদেব সত্যালোক দর্শন করিয়া সপ্ত অহোরাত্র বোধিতরুতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া যাপন করেন। তারপর এক সপ্তাহ কাল একটী তরুতলে ভ্রমণ করিয়া অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহার পদতলে অষ্টাদশ সংখ্যক অলৌকিক পুষ্পের উদ্ভব হয়। এই ভাবে দুই সপ্তাহ গত হইলে বুদ্ধদেব স্বধর্ম্ম

ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন

প্রচার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং প্রথমে উদ্র (রুদ্রক) ও আরাড়কে সে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে অভিলাষী হইলেন। * কিন্তু এই সময় তিনি দৈববলে জানিতে পারিলেন, যে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। অতএব প্রাগুক্ত সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি আপনার পূর্ব্বতন পঞ্চ শিষ্যকে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে মনন করেন এবং তদর্থ তাহাদের অনুসন্ধানে বারাণসী ক্ষেত্রে উপনীত হন।

তাঁহার পঞ্চ শিষ্য দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া পরামর্শ করিলেন, "যে ব্যক্তি ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে, তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা নীরব থাকিব, তাঁহার সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইবনা। বুদ্ধদেব নিকটে আসিলে তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি তাঁহাদিগকে বিচলিত করিল, তাঁহারা আপনাদের সংকল্প বিস্মৃত হইলেন; দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর বুদ্ধদেবের অমৃতময় উপদেশের মাহাত্ম্যে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক তাঁহার শিষ্যগণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার স্থানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপ বিদ্যমান আছে। ইহার ভিত্তিমূল খসিয়া পড়িতেছে। তাহা হইলেও এক শত ফিট পরিমাণ দণ্ডায়মান আছে। ইহার সম্মুখেই একটি সত্তর ফিট পরিমিত দীর্ঘ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তম্ভ গাঢ় হরিত বর্ণ, উজ্জ্বল আলোকের মত ঝকমক্ করিতেছে।

পঞ্চ শিষ্যের দীক্ষা অন্তে বুদ্ধদেব প্রবলোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তিন মাসে ষষ্টি জন হয়। তখন তাঁহাদিগকে বিভিন্ন দিকে গমন

* উদ্র সমাধি লাভ করিতেন, আরাড়ক অকিঞ্চন্যায়তন গরিষ্ঠছিলেন। এই জন্য বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষিত করিতে অভিলাষী হন। এইরূপ কথিত আছে যে, এই দুই মহাত্মা তাঁহার পূর্ব্ব গুরু ছিলেন।

পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং উরুবিল্বের বনাভিমুখে গমন করেন।]

বুদ্ধদেব বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যে স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা মৃগদাব নামে পরিচিত। (বর্ত্তমান নাম সারনাথ, ইহা বারাণসীর তিন মাইল উত্তরে।) এখানে একটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। সঙ্ঘারামের সুবৃহৎ অট্টালিকা আটটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত; সমগ্র চত্বর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া স্বতন্ত্র খণ্ডগুলি সংযুক্ত করা হইয়াছে। একাধিক তলবিশিষ্ট চূড়া তাহার উদ্গত ছাঁচ এবং বারান্দা অতি সুগঠিত। এই ধর্ম্মশালায় পঞ্চদশ শত আচার্য্য বাস করিতেছেন। তাঁহারা হীনযান শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত রহিয়াছেন। প্রাগুক্ত প্রাচীরাভ্যন্তরে দুইশত ফিট উচ্চ বিহার বিদ্য-মান আছে। ইহার ছাদের উপর একটি স্বর্ণ-আম্র স্থাপিত রহিয়াছে। আমাদের বর্ণিত অট্টালিকার ভিত্তি ও সোপান প্রস্তরনির্ম্মিত; কিন্তু চূড়া ও কুলুঙ্গী সকল ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক কুলুঙ্গীতে বুদ্ধদেবের স্বর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিহারের মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের তাম্রনির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই মূর্ত্তি পূর্ণাঙ্গ; বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতেছেন, এই অবস্থার মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব উরুবিল্বের বনে উপস্থিত হইয়া সেখানে কিয়দ্দিবস অব-স্থিতি করেন। তৎকালে তাঁহার প্রাণোন্মাদকর ধর্ম্মোপদেশে আকৃষ্ট হইয়া কাশ্যপ নামক একজন প্রভূত প্রতিপত্তিশালী দার্শনিক ও অগ্নির উপাসক পঞ্চশত শিষ্য সহ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই স্থানে একটি স্তূপ বিদ্যমান আছে। বুদ্ধদেব উরুবিল্ব পরিত্যাগ করিয়া সশিষ্যে রাজগৃহে উপনীত হইলেন। রাজা বিম্বিসার "বহু সম্মান পূর্ব্বক বুদ্ধদেবকে দর্শন ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পর দিন তাঁহাকে

ভিক্ষু মণ্ডলী সহ রাজধানীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধদেব যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন, এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে মহারাজা বেণুবন নামক এক সুরম্য। উদ্যান গুরুদক্ষিণা স্বরূপ বৌদ্ধ সমাজকে দান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।] বুদ্ধদেব এখানে অনেক বৎসর বর্ষাকাল যাপন করেন এবং তাঁহার অনেক উপদেশ এখান হইতে প্রদত্ত হয় বলিয়া এই স্থান বৌদ্ধদের মহাতীর্থ রূপে প্রসিদ্ধ।" (১)

বুদ্ধদেব ও রাজা বিম্বিসার

যে স্থানে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের প্রথম দর্শনলাভ করেন, তথায় একটী সুবৃহৎ স্তূপ বিদ্যমান আছে। তদ্ব্যতীত রাজধানী রাজগৃহে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বুদ্ধদেব এবং তদীয় বিশিষ্ট শিষ্যগণের কার্য্যাবলীর চিহ্নস্বরূপ কতিপয় স্তূপ এবং বিহার দেখিতে পাওয়া যায়। এতন্মধ্যে ইন্দ্রশৈলের কীর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রশৈল রাজগৃহ হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত। এই স্থানে বুদ্ধদেব সময় সময় বাস করিতেন; তাঁহার উপদেশ মত অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব পর্ব্বত গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইন্দ্রশৈলের পার্শ্ব ও উপত্যকা ভীষণ অন্ধকারময়; এখানে পুষ্পতরুর বিস্তৃত অরণ্য। উহার দুইটী শৃঙ্গ, শৃঙ্গ দুইটী ঋজুভাবে আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে। পশ্চিমস্থ শৃঙ্গের দক্ষিণভাগে দুইটি অতি প্রকাণ্ড বন্ধুর প্রস্তরখণ্ড মধ্যে একটি বৃহদায়তন কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কক্ষ প্রশস্ত, কিন্তু অনুচ্চ। পূর্ব্বস্থ শৃঙ্গে একটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইন্দ্রশৈল

ইন্দ্রশৈল ব্যতীত গৃধ্রকূটশৈল, কুক্কুটপাদগিরি এবং কপোতিক বিহার বৌদ্ধ জগতে পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। বুদ্ধদেব অনেক সময় গৃধ্রকূটশৈলে যাপন করিয়াছেন। তাঁহার বহু ধর্ম্মোপদেশ এই স্থান হইতে বিঘোষিত হইয়াছিল।

গৃধ্রকূট শৈল কুক্কুটপাদ গিরি, কপোতিকা বিহার

(১) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম।

রাজা বিম্বিসার শৈল শৃঙ্গে আরোহণ জন্য সুপ্রশস্ত সুগঠিত সোপানাবলী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে একটি সুদৃশ্য ইষ্টকনির্ম্মিত বিহার দেখিতে পাওয়া যায়; বুদ্ধদেব ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন, এইরূপ একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইন্দ্রশৈলের ১৫০ কি ১৬০ লি উত্তর পূর্ব্বে কপোতিকা বিহার বিদ্যমান। একদা বুদ্ধদেব অলৌকিক প্রভাবে একজন পক্ষী শিকারীকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী করিয়া তুলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থ একটি বিহার নির্ম্মিত হয় এবং তাহা কপোতিকা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কুক্কুট পাদগিরি বৌদ্ধতীর্থ; এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম; পর্ব্বত গাত্র সমুন্নত এবং বন্ধুর; পর্ব্বত পৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়া কলনাদিনী তরঙ্গিনী প্রবাহিতা; পার্শ্বে কুঞ্চিত শ্যামল শষ্পরাজি বর্দ্ধিত, নিম্নে ঘন অরণ্যে বিস্তৃত, উর্দ্ধে ত্রিসংখ্যক পর্ব্বতচূড়া মেঘলোকে উত্থিত। প্রকৃতির এই লীলা নিকেতন প্রথম বৌদ্ধাচার্য্য মহাকাশ্যপের তিরোধানস্মৃতি জড়িত এবং তজ্জন্য পবিত্র। এখানে একটি স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বুদ্ধদেবের পিতা শুদ্ধোদন পুত্রের বুদ্ধত্বলাভের সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং কিয়দ্দিনের জন্য তাঁহাকে আপন সমীপে আহ্বান করেন।

কপিলবস্তুতে বুদ্ধদেব।

পিতার নির্ব্বন্ধে বুদ্ধদেব রাজগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কপিলবস্তু অভিমুখে বহির্গত হন এবং যথাসময়ে ঐ স্থানে পৌঁছেন। নগরের বহির্ভাগে কিঞ্চিৎ দূরে ন্যগ্রোধ-নিকুঞ্জে পিতাপুত্রে মিলন হইয়াছিল। এই মিলন স্থলে অশোকনির্ম্মিত একটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পিতার সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পর বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ শুদ্ধোদন এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যথিতচিত্তে পুত্রের নিকট গমন করিয়া আকুল কণ্ঠে বলিলেন, তোমার ঈদৃশ দশা আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন. "ইহা আমার কুলধর্ম্ম।" শুদ্ধোদন কহিলেন, ক্ষত্রিয় বংশীয় রাজগণ কি কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন? বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, আমার বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধগণ আমার পূর্ব্বপুরুষ। অতঃপর শুদ্ধোধন তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। "তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য রাজপরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলে উপস্থিত হইল, কেবল যশোধরা নাই। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, যশোধরা কোথায়? তিনি আসিবেন না শুনিয়া বুদ্ধদেব রাজার সহিত স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, যশোধরা মলিন বেশে রুক্ষ আলুলায়িত কেশে দ্বারে বসিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার চিরসম্বরিত প্রেমাশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে রাজাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভাগিনী যশোধরা এতকাল পতিবিরহে দীনবেশে অনাহারে অনিদ্রায় কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন, রাজা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বুদ্ধের মন গলিয়া গেল; তখন তিনি যশোধরা পূর্ব্বজন্মে কিরূপ গুণবতী ছিলেন, তাহার এক জাতক গল্প বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।" (১)

ইহার কিছুদিন পরে মাতার শিক্ষা মত রাজকুমার রাহুল পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া পৈতৃক ধন যাচ্ঞা করিলেন। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধদেব কহিলেন, "বোধিদ্রুমতলে যে সত্যরত্ন লাভ করিয়াছি, আমি তোমাকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া যাইব।" তখন তিনি সাত বৎসরের সেই সরল বালককে বৌদ্ধসমাজভুক্ত করিয়া লইবার জন্য আদেশ

(১) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম।

দিলেন। সারিপুত্র নামক জনৈক শিষ্য তাঁহাকে সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত করিয়া বৌদ্ধসমাজভুক্ত করিলেন। অতঃপর বুদ্ধদেব বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দ, শ্যালক দেবদত্ত, নাপিত উপালী, আত্মীয় অনিরুদ্ধ প্রভৃতি অনেক স্বজনকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। ফলতঃ বুদ্ধদেব "বহু দিন এই স্থানে প্রবাস করিয়া শাক্যবংশীয়দিগের মনে নবধর্ম্মের নূতন সত্য দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া" (১) দিলেন, এবং তারপর পিতাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কপিলবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজগৃহে গমন করিলেন।]

ইহার পর বুদ্ধদেবের জীবনের সুদীর্ঘ অবশিষ্টকাল কখন রাজগৃহে কখন কৌশাম্বীতে, কখন বৈশালীতে, কখন শ্রাবস্তীতে কখনও বা অন্য কোন স্থানে ধর্ম্ম প্রচারে অতিবাহিত হইয়াছিল।

কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক ঘোসিরা বুদ্ধদেবের অনুরাগী ছিলেন। ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে তাঁহার আগমন হইলে তিনি ঘোসিরার উদ্যানবাটিকায় বাস করিতেন। তথায় বর্ত্তমান সময়ে একটি প্রাচীন সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে; এই সঙ্ঘারামের পার্শ্বে একটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোসিরার উদ্যানবাটিকার অনতিদূরেই তাঁহার বাসস্থান ছিল। এই স্থানেও বুদ্ধদেব সময় সময় অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। কালক্রমে তথায় একটি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। কৌশাম্বী নগরীতে ঈদৃশ অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বুদ্ধদেবের চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি। এই বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অলৌকিকতা জড়িত আছে। এরূপ কথিত আছে যে, একদা বুদ্ধদেব মাতা মায়াদেবীর নিকট নবধর্ম্মের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক তিন মাস অবস্থিতি করিয়া-

কৌশাম্বীতে বুদ্ধদেব।

(১) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত বুদ্ধচরিত।

ছিলেন। এই কারণ রাজা উদয়ন তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া প্রাগুক্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধদেব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগত হইয়া কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইলে, ঐ মূর্ত্তি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করে। তখন তিনি হাস্যবদনে বলেন, আমি আশা করি যে, তুমি অপধর্ম্মীদিগকে সত্যপথে পরিচালিত করিবার জন্য যত্নশীল হইবে।

শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেব।

বণিক সুদত্ত অনাথপিণ্ডদের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের তৃতীয় বর্ষে শ্রাবস্তী নগরীতে গমন করেন। তৎকালে প্রসেনজিৎ নামক গুণবান নরপতি শ্রাবস্তীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। দেশাধিপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রাণগত অনুরাগে শ্রাবস্তী নগরী বুদ্ধদেবের সাতিশয় প্রিয় স্থান হইয়া উঠে এবং তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় তথায় যাপন করেন। সুদত্ত অনাথপিণ্ডদ "বুদ্ধদেবের বাসার্থ জেতবন নামক উদ্যান ক্রয় করিয়া দেন। উদ্যানটি তখন শ্রাবস্তীর কোন রাজকুমারের সম্পত্তি ছিল। রাজকুমার বলিলেন, 'আমার উদ্যান আবরণ করিতে হইলে যত স্বর্ণমুদ্রার আবশ্যক, যদি তত স্বর্ণমুদ্রা দিতে পার তবে তোমায় আমি আমার বাগান ছাড়িয়া দিতে পারি। অনাথপিণ্ডদ তাহাই করিলেন। একটি একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা বিছাইয়া উদ্যানটি মুড়িয়া দিলেন। রাজকুমার মুদ্রাগুলি লইয়া উদ্যানটী ছাড়িয়া দিলেন।" (১)

সুদত্ত অনাথপিণ্ডদ একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন; ধনের অনুরূপ তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত এবং ধীশক্তি বহুদর্শিনী ছিল। তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে আপন ধনরাশি দরিদ্রের সেবার জন্য ব্যয় করিতেন। তিনি বন্ধুহীনের বন্ধু ছিলেন; নিঃসম্বলের সহায় ছিলেন; পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশু এবং জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তদীয় হৃদয়

(১) বিভা, প্রথম খণ্ড।

করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। এই সাধু পুরুষের নাম ছিল সুদত্ত অনাথপিণ্ড। সুদত্ত প্রকৃত নাম, অনাথপিণ্ডদ উপাধি, অনাথপিণ্ডদ শব্দের অর্থ পিতামাতাহীন অনাথের বন্ধু।

দুঃখের বিষয় এই যে, ঈদৃশ মহাত্মার কীর্ত্তিরাজি ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। জেতবনে বুদ্ধদেবের বাস জন্য বিহার ও ভিক্ষুগণের বাস জন্য সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। জেতবনের পূর্ব্ব তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটী সমুচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। বামপার্শ্বস্থ স্তম্ভের ভিত্তিমূলে একটী চক্র অঙ্কিত আছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটী বৃষমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ভিক্ষুগণের বাসভবনগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; কেবল ভিত্তিভূমিস্থ প্রস্তররাশি বিদ্যমান আছে। এই বিপুল ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; তদভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেবের বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জীবনের অনেক স্মৃতি উহার সহিত জড়িত রহিয়াছে। নব ধর্ম্মের ফলে মনুষ্যের দুঃখ নিষ্কাশনের সম্ভাবনা দেখিয়া ভারতবর্ষের অসংখ্য নরনারী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল। অন্যদিকে একদল লোক ঈর্ষা অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অপচয় হেতু তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা বুদ্ধদেবের অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিত, তাহা প্রদর্শন জন্য এখানে তিনটী ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

দেবদত্ত নামক দ্রোণদন রাজার পুত্র দ্বাদশ বৎসর কাল সমুচিত যত্নসহকারে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। আশীহাজার শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি বিদ্যাগর্ব্বে মত্ত হইয়া অলৌকিক ক্ষমতা লাভের প্রয়াসী হন। তিনি বলিতেন, বুদ্ধত্বের ত্রিংশৎ চিহ্ন আমার দেহে

বিদ্যমান, আমার অনুচরের সংখ্যাও বহু; বুদ্ধের সঙ্গে আমার কি প্রভেদ? তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘমধ্যে ভেদ জন্মাইয়া দিতে যত্নশীল হন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রণাম করিবার সময় বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার মানসে নখতলে বিষ লইয়া তাঁহার সমীপে গমন করেন; কিন্তু হঠাৎ ভূগর্ভে পতিত হইয়া জীবনান্ত হওয়াতে তাঁহার দুরভিসন্ধি সফল হইতে পারে নাই।

বৌদ্ধ উপাখ্যান।

অপধর্ম্মের অনুরাগিণী চিন্তা নাম্নী একজন রমণী বুদ্ধদেবের পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করে। একদা বুদ্ধদেব বহুসংখ্যক শিষ্যসহ উপবিষ্ট ছিলেন, এরূপ সময়ে ঐ রমণী কাষ্ঠ উপাধানে উদর স্ফীত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলে, "অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছি, আমার গর্ভে শাক্যবংশের সন্তান।" তাহার মুখ হইতে এই বাক্য বহির্গত হইবামাত্র একটি শ্বেত ইন্দুরে ঐ উপাধানের বন্ধন কাটিয়া ফেলিয়া দিল এবং সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল।

একজন দ্বিচারিণী রমণী বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য জেতবনের বিহারে গমন করিয়াছিল। কতিপয় অপধর্ম্মাবলম্বী তাহাকে প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে হত্যা করিয়া বুদ্ধদেবের বাস ভবনের পার্শ্বে লুকাইয়া রাখে। অতঃপর তাহাদের কৌশলে এই হত্যার বিষয় রাজার কর্ণগোচর হয় এবং অনুসন্ধানে মৃতদেহ প্রাগুক্ত স্থান হইতে বাহির হয়। তখন ষড়যন্ত্রকারীরা প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করে, যে বুদ্ধদেব কলঙ্কের ভয়ে নারীহত্যা করিয়াছেন। এই গুরুতর অভিযোগে জনসাধারণ আন্দোলিত হইয়া উঠিল, এইরূপ সঙ্কটকালে আকাশমার্গে দৈববাণী উত্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিল।

পাপমতি লোকেরা কিভাবে বুদ্ধদেবের অনিষ্ট সাধন জন্য চেষ্টা,

করিয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। বুদ্ধদেব পাপীর হৃদয়ে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে সৎপথে আনয়ন করিতেন; তাঁহার এই ক্ষমতা কতদূর অসাধারণ ছিল, এখন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রাবস্তীর অধিপতি প্রসেনজিৎ শাক্যবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া কন্যা প্রার্থনা করিয়া কপিলবস্তু নগরে দূত প্রেরণ করেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর তৎকালে মহান শাক্য কপিলবস্তুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এক সুলক্ষণা দাসীকন্যাকে স্বীয় কন্যা পরিচয়ে দূতের সঙ্গে প্রেরণ করেন। তাঁহার গর্ভজাত পুত্রের নাম ছিল বিরুঢক। বালক বিরুঢক একবার কপিলবস্তু নগরে মাতুলালয়ে গমন করেন। তৎকালে শাক্যবালকগণ তাঁহাকে দাসীপুত্র বলিয়া উপহাস করে। ইহাতে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং উত্তরকালে শ্রাবস্তীর রাজপদ অধিকার করিয়া ঐ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য শাক্যবংশের ধ্বংস সাধন উদ্দেশ্যে বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন। এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া বুদ্ধদেব পথিমধ্যে একটি শুষ্ক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। বিরুঢক দূর হইতে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং তারপর তাঁহার সকাশে উপনীত হইয়া সসম্মান অভিবাদন পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, "আপনি কিজন্য ছায়াশীতল বৃক্ষতল উপেক্ষা করিয়া রৌদ্রদগ্ধ স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "শাক্যবংশ বৃক্ষের শাখা ও পল্লব সদৃশ, তৎসমুদয় ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তির পক্ষে অনাতপ লাভ কি প্রকারে সম্ভবপর?" এই উত্তর শ্রবণে বিরুঢক লজ্জিত হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (১)

(১) হুএনথসঙ্গ অন্যস্থানে লিখিয়াছেন যে, বিরুঢকের আক্রমণে বহুসংখ্যক শাক্য বিনষ্ট হয় এবং পাঁচশত শাক্যকুমারী শত্রুহাতে বন্দিনী হইয়া উৎপীড়িতা হয়।

একদা কোশল রাজ্যে তস্কর ও দস্যুর অত্যন্ত উপদ্রব হইয়াছিল। পাঁচশত তস্কর ও দস্যু রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া ফিরিত এবং তাহাদের তাণ্ডবে লোকের ধন প্রাণ মান বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে। রাজা প্রসেনজিৎ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া তাহাদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলেন। এবং তারপর তাহাদিগকে ঘোর অরণ্যে নির্ব্বাসিত করেন। বুদ্ধদেব এই সংবাদ অবগত হইয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হন এবং ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি দান করেন। অতঃপর তাহারা বুদ্ধদেবের অনুরাগী হয়।

শ্রাবস্তী নগরীতে অঙ্গুলিমালয় নামক এক জাতির বাস ছিল। তাহাদের স্বভাব শোণিতলোলুপ ছিল। একদা একজন অঙ্গুলিমালয় স্বীয় মাতাকে হত্যা করিতে সংকল্প করে। এই সংবাদ অবগত হইয়া বুদ্ধদেব তাহার নিকট গমন করিলেন। ঐ নরশোণিতলোলুপ অঙ্গুলিমালয় বুদ্ধদেবকে দেখিতে পাইয়া ছুরিকা হস্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। বুদ্ধদেব তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ মাত্রও বিচলিত না হইয়া তাহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার মধুর উপদেশে পাপাত্মার হৃদয় গলিয়া গেল। (১)

লিচ্ছাবগণ বুদ্ধদেবের অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এই কারণে তাঁহার জীবনের অনেকাংশ তাঁহাদের রাজধানী বৈশালী নগরীতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বৈশালীতে আগমন করিয়া মহাবন নামক উদ্যানবাটিকায় বাস করিতেন।

মহা পরি নির্ব্বাণ

কিন্তু ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের চতুঃচত্বারিংশ বর্ষে। এই সময় তাঁহার বয়স ৭৯

এজন্য আমরা অনুমান করি যে, বিরুঢক প্রথমতঃ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পরে পুনরায় কপিলবস্তু রাজ্য আক্রমণ করেন।

(১) বুদ্ধদেব উত্তর কালে এই ব্যক্তির গুণাবলী দর্শন করিয়া প্রীত হন এবং তাহাকে অর্হৎ শ্রেণী ভুক্ত করেন।

বৎসর হইয়াছিল) বৈশালীতে উপনীত হইয়া অম্বপালী নামক একজন বারনারীর আম্রকাননে গমন করেন। [এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া অম্বপালী তদীয় সকাশে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। এই সুযোগে অম্বপালীকে সৎপথ প্রদর্শনের আশায় বুদ্ধদেব তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। অতঃপর লিচ্ছবিগণ মহা সমারোহে বুদ্ধদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু অম্বপালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা কল্পে তিনি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে লিচ্ছবিগণ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব সমস্ত উপেক্ষা করিয়া পর দিবস ঐ বারনারীর গৃহে আহার করিলেন।] বুদ্ধদেবের অমৃতময় উপদেশে অম্বপালী অনুতপ্ত হইয়া উঠিল এবং বহু বিনয় বচনে আম্রকানন বৌদ্ধসঙ্ঘের উপকারার্থে উৎসর্গ করিল। [অতঃপর বুদ্ধদেব বৈশালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেনুর নামক গ্রামে উপনীত হন। এই স্থানে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। অসীম ধৈর্য্য সহকারে কিয়দ্দিবস রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বুদ্ধদেব কিঞ্চিৎ সুস্থ হন এবং বৈশালীতে ফিরিয়া আইসেন।] এই সময় তিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দের নিকট স্বীয় মৃত্যু আসন্ন হইতেছে বলিয়া প্রকাশ করেন। [শিষ্যগণ এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট সমবেত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে প্রাণপ্রদ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিস্তেজ হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করিলেন। (১) অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালী নগরী পরিত্যাগ

(১) এই উপদেশ উপলক্ষে বুদ্ধদেব স্বধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে সে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

চত্বার স্মৃতি উপস্থান (ধ্যান),—শরীরের অপবিত্রতা স্মরণ, ইন্দ্রিয়বোধ জনিত দুঃখ স্মরণ, চিন্তার অনিত্যতা স্মরণ। পঞ্চ দুঃস্কন্ধ (জীবনের উপকরণের নাম স্কন্ধ) স্মরণ, যথা—রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, সংস্কার।

পূর্ব্বক কুশীনগরের অভিমুখে বহির্গত হইলেন। লিচ্ছবিগণ তাঁহার অদর্শনে ক্লিষ্ট হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রবল অনুরাগ বশতঃ বুদ্ধদেবের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বুদ্ধদেব হঠাৎ একটী

চত্বার সম্যক প্রধান,—পাপোৎপত্তি নিবারণ চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ দূরের চেষ্টা, নূতন সাধুভাব উপার্জ্জন চেষ্টা, উপার্জ্জিত সাধুভাবের বর্দ্ধন জন্য চেষ্টা।

চত্বার ঋদ্ধি পাদ (অলৌকিক ক্ষমতা লাভের উপায়),—গভীর ধ্যান এবং পাপের সহ সংগ্রাম সহকারে অর্হৎপদ পাইতে দৃঢ় ইচ্ছা, দৃঢ় চেষ্টা, তজ্জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করা ও বিচার করা।

পঞ্চবল (নৈতিক বল.),—বিশ্বাস বল, উৎসাহ বল, স্মৃতি বল, ধ্যান বল, জ্ঞান বল।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় (আধ্যাত্মিক),—বিশ্বাস, উৎসাহ, স্মৃতি, ধ্যান, জ্ঞান।

সপ্তবোধ্যাঙ্গ,—বীর্য্য, চেতনা, সমাধি, অনুসন্ধিৎসা, প্রীতি, প্রশান্তি, উপেক্ষা।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ,—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক সদ্ব্যবহার, সম্যক উপজীবিকা আহরণ, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। (সম্যক সংকল্প,—সংকল্প ঠিক রাখা। সম্যক বাক্,—সত্য সরল প্রিয় বাক্য বলা। সম্যক সদ্ব্যবহার,—সদাচরণ। সম্যক জীবিকা আহরণ,—সর্ব্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধু জীবিকা অবলম্বন। সম্যক ব্যায়াম,—আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ সাধন। সম্যক স্মৃতি,—ধারণা ঠিক রাখা। সম্যক সমাধি,—জীবনের সুগভীর তত্ত্ব সমূহের ধ্যান, মনন নিদিধ্যাসন।)

আমরা এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়, জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ জরামরণ দুঃখময়, যাহা ভাল লাগেনা, তাহার সহিত মিলনে দুঃখ, ভালবাসার পাত্রের বিয়োগে দুঃখ। বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ। এই বিষয় তৃষ্ণা উৎপাটন করাতেই দুঃখ নিবৃত্তি। বিষয় তৃষ্ণা কোন পথে উৎপাটিত করা যাইতে পারে, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে।

নদীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের গমনে বাধা দেন এবং তাঁহাদের ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে আপনার ভিক্ষাপাত্র অর্পণ করেন।

বৈশালী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে একাধিক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে একমাত্র শ্বেতপুরের সঙ্ঘারাম অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্ঘারামের সুবৃহৎ দ্বিতল মন্দির গগণ স্পর্শ করিয়াছে। অত্রত্য আচার্য্যগণ প্রশান্তচিত্ত এবং শ্রদ্ধান্বিত।

বৈশালী নগরীতে প্রতি পাদক্ষেপে মনোরম দৃশ্য এবং পুরাতন ভিত্তিভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কালমাহাত্ম্যে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। সমস্ত বন বিনষ্ট হইয়াছে; জলাশয় সমূহ শুষ্ক এবং দুর্গন্ধপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বৈশালীর বর্ণনা করিতে হইলে কেবল দুঃখ-জনক ভগ্নাবশেষের বর্ণনা করিতে হয়।

বুদ্ধদেবের সগম্বুজ উপদেশাগার ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। এই-স্থানে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক অনেক সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। অম্বপালী নাম্নী বারনারী বৌদ্ধসঙ্ঘের জন্য যে আম্রবন ও তৎসংলগ্ন বিহার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব যে স্থানে আনন্দকে আপন আসন্ন মৃত্যুর বিষয় জ্ঞাত করিয়াছিলেন, যে স্থানে বৈশালী নগরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে স্থানে লিচ্ছবিগণকে অনুসরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে স্তূপ বিদ্যমান আছে।

বুদ্ধদেব বৈশালী হইতে কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথি-মধ্যে পাবা গ্রামে চুন্দ নামক শিষ্যের গৃহে শুষ্ক শূকর-মাংস আহার করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়িত হইয়া পড়িলেন (১) এবং তদবস্থায়

(১) বুদ্ধদেব মাংসাহারে অনভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু চুন্দকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহা আহার করিয়াছিলেন।

কুশীনগরে উপনীত হইয়া তত্রত্য শালবনে প্রকাণ্ড শালতরুদ্বয় মধ্যে শয়ন করিলেন।

এই সময় সুভদ্র নামক একজন একশত বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া উপদেশপ্রার্থী হইলেন। বুদ্ধদেব তদবস্থাতেও তত্ত্বজিজ্ঞাসু বৃদ্ধের সমস্ত সংশয় নিরসন করিয়া দিলেন, এবং তারপর সুভদ্রের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে বৌদ্ধসঙ্ঘভুক্ত করিয়া লইলেন।

মল্লগণ (কুশীনগরের রাজবংশ) বুদ্ধদেবের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বুদ্ধদেব ধীর বচনে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তথাগত চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইতেছেন, এরূপ প্রকাশ করিও না। তাঁহার দেহের ধ্বংস হইতেছে, উপদেশাবলী চিরস্থায়ী, ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। আলস্য পরিত্যাগ কর ; মুক্তির জন্য উত্থিত হও।" এই উপদেশ সমাপ্ত হইলে চারিদিকে অপূর্ব্ব আলোকরাশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; ক্রমে বুদ্ধদেবের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি নির্ব্বাণ নগরীতে অধিষ্ঠান করিলেন।

তদীয় প্রিয় শিষ্যগণ শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক তাঁহার দেহের সংকার সাধন জন্য অভিনিবিষ্ট হইলেন। মল্লগণ তাঁহার দেহ সুবর্ণ-খট্টায়স্থাপন পূর্ব্বক সংকারকার্য্য শেষ করিলেন। অতঃপর [রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকপুরী, রাম গ্রাম, উথদ্বীপ, পাবা ও কুশীনগর হইতে] শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার ভস্মাবশেষ লইয়া গেল এবং সসম্মানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিল।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির স্থানে একটি সুবৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত বিহার বিদ্যমান আছে। তাহার অভ্যন্তরে মন্দিরমধ্যে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে ; প্রতিমার মস্তক উত্তর দিকে স্থাপিত,

বোধ হয় যেন বুদ্ধদেব নিদ্রামগ্ন আছেন। বিহারের সম্মুখে একটী স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। স্তূপটি দুইশত ফিট উচ্চ, কিন্তু ভগ্নদশায় পতিত। এই স্তূপের সান্নিধ্যে নির্ব্বাণস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। নির্ব্বাণ-স্তম্ভের গাত্রে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ নগরীতে অধিষ্ঠান সম্বন্ধীয় তথ্য সকল লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

মগধ সাম্রাজ্য।

হিউএনৃথ্ সঙ্গ-কৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের গৌরব ও বৈভব বিনষ্ট হইয়াছিল। অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের আমলে সমগ্র ভারতবর্ষে মগধ সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে মগধ-সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে কান্যকুব্জের প্রাধান্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। হিউএনৃথ্ সঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যের সুদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তদীয় ভ্রমণকাহিনী দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে দুইটি অধ্যায় কেবল মগধ সাম্রাজ্যের বিবরণেই পূর্ণ। বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র বলিয়া মগধ দেশ হিউএনৃথ্ সঙ্গের নিকট অতি প্রিয় ছিল। এই কারণে তিনি উহার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেক কথা সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাহার নিকট অপার আনন্দের বিষয় ছিল। এই জন্য তিনি মগধ সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছেন, বা শুনিয়াছেন, সে সমস্তই বিপুল আয়াস সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৌদ্ধতীর্থ, বৌদ্ধ মনীষী, বৌদ্ধ ইতিকথা প্রভৃতির মনোরম বৃত্তান্ত হিউএনৃথ্ সঙ্গের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সংক্ষেপে সে মনোরম বৃত্তান্তের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মগধ দেশ চক্রাকারে প্রায় ৫ সহস্র লি পরিমিত। এই দেশের প্রাচীরবেষ্টিত নগরসমূহে লোকের বসতি বিরল, কিন্তু পল্লী সকল জনপূর্ণ। ভূমি উর্ব্বরা, আবাদ যথেষ্ট। মগধ দেশে এক প্রকার তণ্ডুল দেখিতে পাওয়া যায়; উহা বৃহৎ, সুগন্ধ ও রসনার তৃপ্তিকর। ভূমি নিম্ন ও আর্দ্র, এ কারণে লোকবসতি সকল উচ্চভূমিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষাসমাগমে সমস্ত নিম্নভূমি জলে মগ্ন হইয়া থাকে;

তৎকালে নৌকাযানে যাতায়াত করিতে হয়। মগধবাসীরা সরলপ্রকৃতি ও সত্যসন্ধ। তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী, এবং জ্ঞানার্জ্জনে তৎপর। সঙ্ঘারামের সংখ্যা পঞ্চাশ, শ্রমণের সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র। দেবমন্দিরের সংখ্যা দশ। অপর-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অসংখ্য।

গঙ্গা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে চক্রাকার ৭০ লি পরিমিত একটি নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।' বহুকালাবধি এই নগর পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এখনও উহার ভিত্তি-প্রাচীর বিদ্যমান আছে। এই নগরের নাম পাটলিপুত্র। (১) মহারাজ অশোক মগধ-সাম্রাজ্যের রাজধানী রাজ-

পাটলি পুত্র

১। পাটলিপুত্রের পূর্ব্ব নাম কুসুমপুর ছিল। এই নাম পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ যে জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কৌতুকাবহ। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি, একদা এক জন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ আচার্য্যের কতিপয় শিষ্য কোনও কার্য্য উপলক্ষে বনে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক জন শিষ্য বিমর্ষ হইয়া পড়েন। তদীয় সহচরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি জন্য দুঃখিত হইয়াছ?" বিমর্ষ শিষ্য উত্তর করিলেন, "আমি বয়স্ক হইয়াছি, এখনও সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।" এই উত্তর শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিষ্যগণ কৌতুকচ্ছলে তাঁহাকে একটি পাটলীবৃক্ষের সপুষ্প পল্লবের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। রাত্রিকাল আগত হইলে শিষ্যগণ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ঐ শিষ্য সে রাত্রি বৃক্ষতলে যাপন করিবার সংকল্প করিয়া তথায় রহিলেন। গভীর রজনীতে চারি দিক্ অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এবং এক জন বৃদ্ধা নারী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে তরুণী কন্যা অর্পণ করিলেন। অতঃপর শিষ্য কন্যাকে বিবাহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পাটলী বৃক্ষতলে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এক বৎসর পরে একটি পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইলেন। এই শিশু পাটলিপুত্র নামে খ্যাত হয়, এবং তাহার নামানুসারে কুসুমপুর নগরের পাটলিপুত্রপুর অথবা সংক্ষেপে পাটলিপুত্র নাম প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে পাটলি গ্রাম নামে পল্লীর উল্লেখ দেখা যায়। মহারাজ অজাত-শত্রু ব্রিজি বা লিচ্ছবি বংশীয়দের রাজ্য অধিকার জন্য এই স্থান সুদৃঢ় করেন।

গৃহ হইতে পাটলিপুত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। (২) তাঁহার সময় হইতে বহু পুরুষ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভিত্তিপ্রাচীরমাত্র বিদ্যমান আছে। শত শত সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে! কেবল দুই তিনটি সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির এখনও সম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদের উত্তর দিকে ও গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র নগর দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরের গৃহ-সংখ্যা প্রায় এক সহস্র।

অশোকের নরক

অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া নৃশংস আচরণে ও লোকপীড়নে প্রবৃত্ত হন, এবং জীবিত নরনারীকে যন্ত্রণা দিবার উদ্দেশ্যে এক নরকের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই নরকের চতুর্দ্দিক্ সমুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়া পরলোকস্থ নরকের অনুকরণে সেখানে যন্ত্রণাদায়ক নানা প্রকার যন্ত্রাদি রাখিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের আদেশে প্রথমে অপরাধী ঐ নরকে প্রেরিত হইত। তার পর এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিশেষে যে কোনও ব্যক্তি ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া গমন করিত, তাহাকেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

একদা এক জন নবদীক্ষিত শ্রমণ অশোকের নরকের পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছিলেন। রাজ অনুচরেরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া নরকে লইয়া যায়। তিনি তথায় নীত হইয়া এক জন মনুষ্যের প্রাণ নাশ কালের ক্লেশ দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হন, এবং ইহসংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করেন। তৎকালে তাঁহার অর্হৎত্বলাভ ঘটে। অতঃপর মহারাজ অশোকের নরক দূত তাঁহাকে উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করে। কিন্তু অর্হৎত্ব লাভ হেতু তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়াছিলেন

(২) বায়ু পুরাণে অজাত শত্রুর পৌত্র (মহাবংশের মতে পুত্র) উদয়াশ্ব পাটলিপুত্র অথবা কুসুমপুরের প্রতিষ্ঠাতা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

বলিয়া কটাহ হইতে অক্ষতশরীরে বহির্গত হন। ইহাতে নরক-দূত ভীত হইয়া রাজ-সকাশে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা তথায় গমনপূর্ব্বক ঐ বিস্ময়াবহ দৃশ্য দর্শন করেন। নরক-দূত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, মহারাজ, আপনার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে; কারণ, যে কেহ এই স্থানে আগমন করিবে, তাহাকেই মৃত্যু দণ্ড সহিতে হইবে, এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা এই নিয়মের অতীত, আমি এইপ্রকার কোনও আদেশ প্রাপ্ত হই নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, তুমি আমার ঐ নিয়মের অধীন নহ, এরূপ কোনও আদেশ কি আমি দিয়াছি? তুমি দীর্ঘকাল লোকহত্যা করিয়াছ, আমি এখন তাহার অবসান করিব। অতঃপর তাহার আদেশে অনুচরেরা নরক-দূতকে ধৃত করিয়া উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাহার জীবনান্ত করিল, এবং সমগ্র নরকাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ইহার পর মহারাজ অশোক চিরখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য্য উপগুপ্তের (১) সঙ্গ লাভ করেন, এবং তাঁহার উপদেশে নবজীবন প্রাপ্ত হন।

অশোকের নবজীবন লাভ, ধর্ম্মোৎসাহ অবদান

মহারাজ অশোক নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া প্রবল উৎসাহে স্বধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া চুরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জম্বুদ্বীপের প্রধান আট স্থানে বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত দেহের ভস্মাবশেষের পূজা অর্চনাবিধানের উদ্দেশ্যে

(১) উপগুপ্ত শূদ্র বংশোদ্ভব ছিলেন, মথুরা তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। এরূপ কথিত আছে যে, একদা মার দেব তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া তদীয় মস্তকে পুষ্প মালা অর্পণ করেন। উপগুপ্ত ধ্যানান্তে স্বীয় মস্তকে পুষ্প মালা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন এবং মারদেবের গলদেশে মৃত দেহ বন্ধন করিয়া দেন। মারদেব এই বন্ধন উন্মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া উপগুপ্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর তাঁহার গলদেশের মৃতদেহ খসিয়া পড়ে।

তৎসমুদায় সংগ্রহ ও বিখ্যাত স্থান সকলে বিতরণপূর্ব্বক মহারাজ অশোক তত্তৎ স্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। পাটলিপুত্র নগরের মধ্য-স্থানে একটি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার গাত্রে যে অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে,—"মহারাজ অশোক স্বধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের হিতার্থ তিনবার সমগ্র জম্বুদ্বীপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং তিনবারই স্বীয় রত্ন ও ধনভাণ্ডার প্রদান করিয়া সে বন্ধন মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহার বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল।"

এক সময় মহারাজ অশোক পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়েন এবং স্বীয় সমস্ত ধনরত্ন দান করিয়া নিজ পুণ্য ব্রতের উৎকর্ষ সাধন জন্য অভিলাষী হন। কিন্তু তদীয় অমাত্যবর্গ তাঁহার এই আদেশ পালন করিতে বিরত থাকেন। এজন্য একদিন অশোক অৰ্দ্ধভুক্ত আমলকি ফল মন্ত্রীদিগকে প্রদর্শন করিয়া বলেন, আমি আর জম্বুদ্বীপের অধিপতি নাই। দান করিবার জন্য আমার কেবল এই আমলকিটি আছে। বায়ু মুখে দীপ রক্ষার ন্যায় এই পৃথিবীর ধন মান অক্ষুণ্ণ রাখাও দুরূহ। আমার সুবিস্তৃত অধিকার, আমার নাম, আমার বিপুল যশোরাশি জীবনের শেষ ভাগে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি একজন ক্ষমতাশালী এবং ক্রোধ-প্রবণ মন্ত্রীর হস্তগত হইয়াছি। এই বলিয়া মহারাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং তারপর বহু বিনয়বাক্য সহ আমলকিটি বৌদ্ধ-ধর্ম্মমণ্ডলীতে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মলাভ কামনা করিলেন। স্থবির আমলকি প্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিলেন, রাজা অশোক পূর্ব্ব কর্ম্মবলেই আরোগ্য লাভ করিবেন। অতঃপর মহারাজ অশোক আরোগ্য লাভ করিয়া ধর্ম্ম-মণ্ডলীকে বিপুল উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্র নামে মহারাজ অশোকের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।(১) তিনি নিষ্ঠুর স্বভাব যথেচ্ছাচারী ও অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন। প্রকৃতি-পুঞ্জ তদীয় উৎপীড়ন ও অত্যাচারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এজন্য মন্ত্রী এবং পুরাতন কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে রাজসকাশে অভিযোগ উপ-স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাজ অশোককে বলিয়াছিলেন, অপক্ষপাতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে প্রজাকুল সন্তুষ্ট থাকে; যদি প্রজাকুল সম্মতি প্রকাশ করে, তবে শাসনকর্ত্তা শান্তিলাভ করেন। আমরা পুরুষানুক্রমে এই রাজনিয়ম দেখিয়া আসিতেছি। আমরা প্রার্থনা করি যে, মহারাজা এই চিরন্তন নিয়ম রক্ষা করিবেন, এবং কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। মহারাজ অশোক এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া দণ্ড-বিধানের উদ্দেশ্যে মহেন্দ্রকে স্ব-সমীপে আনয়ন করেন। মহেন্দ্র এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করেন। মহারাজ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সপ্তাহ মধ্যে মহেন্দ্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি অনুশোচনা বলে অর্হৎত্ব লাভ করেন। অশোক তাঁহার তাদৃশ পরিবর্ত্তন দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন, এবং তাঁহার বাসের জন্য পর্ব্বতগুহায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

গুণমতির উপাখ্যান।

কোনও সময়ে দক্ষিণ-ভারত হইতে গুণমতি বোধিসত্ত্ব মাধব নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে মগধ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। গুণমতি মাধবের বাসগ্রামের সমীপস্থ হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। এজন্য গুণমতি নিরুপায় হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনে প্রবেশ করেন। রজনী সমাগত হইলে মাধবের

(১) মহেন্দ্র অশোকের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এক জন বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী প্রতিবেশী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তদীয় যত্ন ও উদ্যোগে গুণমতি মগধাধিপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করেন। অতঃপর মগধাধিপতি দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহার আবেদনানুসারে তর্ক-যুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দেন। পরদিন প্রত্যূষে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রাজা, রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট মহোদয়গণ সে মহাতর্ক শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হন। গুণমতি প্রথমে গাত্রোত্থান করিয়া স্বধর্ম্মের মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া, সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে মাধব গুণমতির প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। এই ভাবে ষষ্ঠ দিন আগত হয়। এই দিন মাধব হঠাৎ রক্ত বমন করেন, এবং তাহার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তুমি তীক্ষ্ণধীশালিনী, আমার অপমান-কথা বিস্মৃত হইও না। মাধবের তেজস্বিনী পত্নী স্বামার মৃত্যু সংবাদ গুপ্ত রাখিয়া বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া সভাস্থলে গমন করেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বলেন, আত্মাভিমানী মাধব গুণ-মতির প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং স্বীয় ক্রটী সংশোধন করিয়া লইবার জন্য পত্নীকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ ধীশালিনী রমণীকে দর্শন করিয়া গুণমতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলেন, পণ্ডিত মাধবের মৃত্যু হইয়াছে, এবং তদীয় পত্নী আমার সহিত তর্ক করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মরণাহতা রমণীর ন্যায় মলিন হইয়াছে, এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর বিদ্বেষে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; ইহাই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করিতেছে। গুণমতির প্রজ্ঞার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া রাজা বিস্মিত হন, এবং তাঁহার সাধুবাদ করেন। ব্রাহ্মণগণ গুণমতিকে জয়-লাভ করিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হন, এবং কতিপয় অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তাঁহার সহিত তর্ক করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করেন।

এই নির্ব্বাচিত পণ্ডিতগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ উদ্যমসহকারে আপনাদের ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া স্বদলভুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উল্লাসিত করিয়া তুলেন। কিন্তু গুণমতি তৎসমুদায়ের উত্তর প্রদান করিবার জন্য নিজের পরিচারককে নিযুক্ত করেন। এই অনুচর পণ্ডিত ধীরগতিতে নির্ম্মল সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ যুক্তির অবতারণা করিয়া সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া দেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী অতীব বিস্ময় প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণগণ পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া ভগ্নচিত্তে প্রস্থান করেন।

ধর্ম্মপাল ও শীলভদ্র।

পূর্ব্বকালে দক্ষিণ-ভারতের আর এক জন বিশ্রুতনামা পণ্ডিত দিগ্বিজয় উপলক্ষে মগধরাজ্যে আগমন করেন। তিনি স্বদেশে অবস্থানকালে মগধের অন্তর্গত ভারতীর লীলাস্থল নালন্দা বিহারের আচার্য্য ধর্ম্মপালের গুণগরিমার খ্যাতি অবগত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তিনি ঈর্ষ্যাকুলচিত্তে সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিবাহিত করিয়া মগধরাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দক্ষিণদেশবাসী পণ্ডিতবর মগধাধিপতির সভায় উপনীত হইয়া বলেন, আমি আচার্য্য ধর্ম্মপালের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া এখানে আসিয়াছি। আমি অজ্ঞ, তথাপি তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মগধরাজ আচার্য্য ধর্ম্মপালকে আহ্বান করিয়া পাঠান। তিনি রাজার আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া অগৌণে যাত্রার জন্য উদ্যোগী হন। এই সময় শীলভদ্র (১) ও অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন

(১) শীলভদ্র সমতট অর্থাৎ পূর্ব্ব বঙ্গের রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শীলভদ্র সাতিশয় জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। বহুদূর দেশেও তাঁহার যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শীলভদ্র মগধ রাজ্যে উপনীত

করিয়া দাঁড়ান। প্রধান শিষ্য শীলভদ্র তাঁহাকে বিনয়নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করেন, গুরুদেব, আপনি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছেন? তার পর গুরুদেবের উত্তর শ্রবণ করিয়া বলেন, আমি নানাপ্রকার শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করিয়াছি। এই বিধর্ম্মীকে পরাভূত করিবার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আচার্য্য ধর্ম্মপাল তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ সমস্ত পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সেই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু শীলভদ্রের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর ছিল। এই কারণে শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার প্রাজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া ক্ষুণ্ণ হন। আচার্য্য ধর্ম্মপাল তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলেন, কোনও ব্যক্তির ধীশক্তির পরিমাণ করিবার সময় তাঁহার কয়টি দন্ত উদ্গত হইয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করা অনাবশ্যক। আমি সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে শীলভদ্র এই বিধর্ম্মীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার যথেষ্ট মানসিক বল আছে।

যাহা হউক, বিচারের দিন সমাগত হইলে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সে তর্ক-যুদ্ধ দেখিবার জন্য নানা দূর দেশ হইতে লোক আসিয়াছিল। প্রথমতঃ দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত গম্ভীরস্বরে স্বীয় মত সকলের ব্যাখ্যা করেন। তারপর শীলভদ্র অপূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া দেন। তখন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জায় অধোবদন হন।

হইয়া নালন্দায় আচার্য্য ধর্ম্মপালের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং তাঁহার মুখে জটিল ধর্ম্মশাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেখানে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে তিনি দুরূহ সমস্যা-সমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। এই ভাবে শীলভদ্র স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। অতিদূরদেশেও তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মগধাধিপতি শীলভদ্রের জয়লাভে হৃষ্ট হইয়া তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ একখানি গ্রাম দান করেন। কিন্তু তিনি এই দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলেন, যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই। ইহাতে মগধরাজ উত্তর করেন, ধর্ম্ম-রাজের তিরোভাব হইয়াছে, জ্ঞান-তরণী তরঙ্গে পতিত হইয়াছে ; যদি এই সময় পণ্ডিত ও মূর্খে পার্থক্য না থাকে, তবে বিদ্যার্থীকে ধর্ম্মপথে গমনকালে উৎসাহ-প্রদান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অতএব প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই দান গ্রহণ করুন। অতঃপর শীলভদ্র নিরাপত্তিতে ঐ দান গ্রহণ করিয়া একটি সুবিশাল সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রাজদত্ত গ্রামের সমস্ত আয় ন্যস্ত করিয়া দেন।

বৌদ্ধ অবদান

মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া স্বীয় রাজধানীতে সর্ব্ব-প্রথমে কুক্কুটারাম নামক সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই সঙ্ঘারাম তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারদ্বারা পুণ্যসঞ্চয়াত্মক কর্ম্মের প্রথম ফল। তাঁহার আমন্ত্রণে এই স্থানে এক সহস্র শ্রমণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কুক্কুটারাম সঙ্ঘারাম ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। কেবল ভিত্তি প্রাচীর বিদ্যমান থাকিয়া পূর্ব্ব কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কুক্কুটারাম সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণের পরবর্ত্তী কালে ক্রমে ক্রমে এক এত সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল মঠাধিকারী শ্রমণগণ গম্ভীর প্রকৃতি, বিদ্বান ও নির্ম্মল স্বভাব ছিলেন। তাঁহাদের নিকট অপধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ নীরব ও নির্ব্বাক থাকিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই সকল শ্রমণের তুলনায় নিস্তেজ শ্রমণমণ্ডলীর আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্যদিকে অপধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত-গণ উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অতঃপর তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে তর্কে পরাজিত করেন এবং রাজাদেশে শ্রমণদের ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা বৌদ্ধ

উপাসক মণ্ডলীকে সমবেত করিবার ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। এইভাবে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে দক্ষিণাপথবাসী মহামহোপাধ্যায় বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুনের শিষ্য দেব বলপূর্ব্বক ঘণ্টাধ্বনি করেন, তারপর অপধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া বিনষ্ট ক্ষমতার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হন।

ভারত ললামভূতা গয়া নগরীর কিঞ্চিৎ দূরে স্রোতস্বিনী অভিষিঞ্চিত কঠোর দর্শন তুঙ্গ শৈল বিদ্যমান। ভারতবর্ষে এই শৈল সাধারণতঃ ধর্ম্মশীলা নামে খ্যাত। পুরাকাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, মগধাধিপ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রজাবর্গের প্রীতিসম্পাদন ও পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা অধিক খ্যাতি লাভের অভিপ্রায়ে ঐ শৈল-শিরে আরোহণ করিয়া নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান অন্তে স্বীয় রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা ঘোষণা করেন।

ধর্ম্মশীলা।

কুশগড়পুর মগধসাম্রাজ্যের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত। পুরাকালে মগধাধিপতিগণ এই স্থানে বাস করিতেন। (১) কুশগড়পুরে এক প্রকার সুগন্ধ তৃণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তজ্জন্যই এই নগরের নাম হইয়াছিল। কুশগড়পুর নগর চারিদিকে উচ্চ শৈলমালায় বেষ্টিত। এই নগরের সমস্ত রাজপথের পার্শ্বে কনক বৃক্ষ সমূহ বিদ্যমান আছে। কনক বৃক্ষের পুষ্প স্বর্ণবর্ণ ও সুগন্ধ।

কুশগড়পুর।

বিম্বিসার রাজার রাজত্বকালে কুশগড়পুর অতি জনপূর্ণ নগর ছিল। ইহার গৃহ সকল পরস্পর-সংলগ্ন ছিল, এই জন্য অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইলে সমস্ত গৃহই দগ্ধ হইয়া যাইত। এই হেতু প্রজাকুলের নিরতিশয়

---

(১) কুশগড়পুর রাজগৃহ বা গিরিব্রজ নামে সমধিক পরিচিত।

কষ্ট হইত। তাহারা শান্তিতে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিল। রাজা অমাত্যবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার পাপে প্রজাকুলের কষ্ট হইতেছে। ইহাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য আমার কি কর্ত্তব্য?" অমাত্যবৃন্দ উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনার ধর্ম্মসঙ্গত শাসনে শান্তি ও ঐক্য বিস্তার লাভ করিতেছে, আপনার ন্যায়মূলক শাসনে প্রজাকুল উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে, দেশমধ্যে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। লোকের দোষেই অগ্নিতে গৃহদাহ হইয়া থাকে। অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দোষী ব্যক্তিকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেই লোকে সাবধান হইবে, এবং অগ্নিভয় নিবারিত হইবে।" বিম্বিসার রাজা তাঁহাদের প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং সেই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করিয়া দেন। অতঃপর দৈববশতঃ প্রথমেই রাজপ্রাসাদে অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয়। এই কারণে সমদর্শী বিম্বিসার নিজের নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী শীতলবন নামক স্থানে গমন করেন। বৈশালীর অধিপতি বিম্বিসারকে রাজধানীর বহির্ভাগে হীনরক্ষক অবস্থায় বাস করিতে দেখিয়া দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্যসহ অভিযান করিলেন। মগধ সাম্রাজ্যের সীমান্ত-রক্ষকগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া বিম্বিসার রাজার রক্ষার জন্য তথায় নূতন নগর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ও প্রজাকুল সেই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। (১)

বিম্বিসার, নূতন রাজগৃহের প্রতিষ্ঠা।

(১) বিম্বিসার রাজার পরবর্ত্তী বাসস্থান নূতন রাজগৃহ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এরূপও কথিত আছে যে, অজাতশত্রু নূতন রাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে ত্রিশ লি দূরে সুপ্রসিদ্ধ নালন্দা বিহার অবস্থিত। এই বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তৃত আম্রকানন মধ্যে দীর্ঘিকা। পাঁচ শত বণিক দশ কোটী স্বর্ণমুদ্রায় ঐ আম্রকানন ক্রয় করিয়া বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন।

নালন্দা বিহার

বুদ্ধদেব এই স্থানে তিন মাস কাল যাপন করেন, এবং তদীয় অমৃতময় উপদেশে বণিকগণ এবং অন্যান্য লোক পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর শক্রাদিত্য নামক মগধাধিপতি এই স্থানে একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বুদ্ধগুপ্ত রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও পিতৃ পদবীর অনুসরণ করিয়া ঐ স্থানে একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর তথাগত গুপ্তরাজা আর একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে নালন্দা বিহার সম্প্রসারিত ও উন্নত হয়। তার পর বালাদিত্য মগধ সাম্রাজ্যাধিকারী হইয়া সেখানে একটি নূতন সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অভিনব সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাকালে খ্যাতনামা ও সাধারণ নির্ব্বিশেষে সৌগতগণের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ভারতবর্ষের বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতেও সৌগতগণ সমাগত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য আরব্ধ হইলে দুই জন সৌগত আগত হন। সমস্ত সৌগতমণ্ডলী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা এত বিলম্বে কোন দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন? তাঁহারা উত্তর করেন, আমরা চীনদেশবাসী। আমাদের অধ্যাপক পীড়িত হইয়াছিলেন; তাঁহার সেবাশুশ্রূষার পর আমরা রাজার নিমন্ত্রণরক্ষাকল্পে যাত্রা করিয়াছিলাম; এই জন্য আমাদের আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। এই উত্তর শ্রবণ করিয়া সমাগত সৌগত-মণ্ডলী বিস্মিত হন, এবং রাজাকে তাঁহাদের আগমন সংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্বয়ং সভাস্থলে উপনীত হন।

কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় রাজার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তিনি রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনাশ্রম গ্রহণ করেন। অতঃপর তদীয় পুত্র বজ্র পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে নালন্দা বিহারের পার্শ্বে আর একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মধ্য-ভারতবর্ষের একজন নৃপতি নালন্দা বিহারের পার্শ্বে একটি সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার ব্যয়ে সমগ্র বিহার ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে সমুচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ বহুকাল ধরিয়া নৃপতিগণ ক্রমান্বয়ে নালন্দা বিহারের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন।

এই বিচিত্র বৌদ্ধ বিদ্যালয়ে বহু আচার্য্য বাস করিতেছেন। তাঁহারা সুতীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের যশঃপ্রভা সমুজ্জ্বল, শত শত আচার্য্যের যশোরাশি অতি দূরবর্ত্তী দেশেও বিকীর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ। তাঁহারা সরলভাবে নৈতিক বিধানাবলী প্রতিপালন করিতেছেন। নালন্দা বিহারের নিয়মাবলী কঠোর। কিন্তু তদন্তর্গত আচার্য্যমাত্রেই তৎসমুদয় প্রতিপালন করিতে বাধ্য। তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শ স্থল। সর্ব্বত্র তাঁহাদের সম্মান। আচার্য্যগণ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রের আলোচনা ও মীমাংসায় নিমগ্ন থাকেন। সে সময়ে বৃদ্ধ ও যুবা পরস্পরের সহায়তা করেন। শাস্ত্রের আলোচনা ও মীমাংসা দ্বারা প্রতিপত্তি লাভের অভিলাষী হইয়া বহু পণ্ডিত শিক্ষার্থীর বেশে নানাস্থান হইতে নালন্দায় সমাগত হন। এই বৌদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই তাঁহাদের জ্ঞানস্রোত চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এ জন্য অনেক যশাভিলাষী ব্যক্তি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনা-

দিগকে নালন্দার শিষ্য রূপে পরিচিত করেন এবং তজ্জন্য লোক সমাজে সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন। পুরাতন ও নূতন উভয়বিধ শাস্ত্রে যাহার কিয়ৎপরিমাণও পারদর্শিতা নাই এরূপ ব্যক্তির শিক্ষার্থিরূপে নালন্দা-বিহারে প্রবেশ নিষিদ্ধ। (১) যে সকল শাস্ত্রদর্শী সুগভীর বিদ্যাবত্তা, প্রগাঢ় বিজ্ঞতা এবং প্রদীপ্ত মনস্বিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নালন্দা বিহার হইতে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের যশোরাশি পূর্ব্ব-গামী ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভমিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞান-চন্দ্র, শীলভদ্র প্রভৃতি বিশ্রুত-নামা আচার্য্যদের কীর্ত্তির সহিত গ্রথিত হইয়া থাকে। ইঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে হীনপ্রভ করিয়াছেন, প্রাচীনদের জ্ঞানের সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়াছেন।

দুইটি রাজ্য।

হিরণ্য-পর্ব্বত রাজ্য

অঙ্গরাজ্য

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব্ববিহারে দুইটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটির নাম হিরণ্য পর্ব্বত, অপরটির নাম অঙ্গ। কানিংহ্যাম সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মুঙ্গেরই প্রাচীন হিরণ্য পর্ব্বত রাজ্যের রাজধানী ছিল। অঙ্গ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল চম্পা নগরী। চম্পানগরী বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত ছিল।

পরিব্রাজক হিউএনৎ সঙ্গের পর্য্যটনকালে হিরণ্যপর্ব্বত রাজ্যের

(১) স্বয়ং হিউএনৎসঙ্গ পাঁচ বৎসর কাল নালন্দা বিহারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্র নালন্দা বিহারের প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেন।

পরিমাণ ফল ৩ সহস্র লি এবং অঙ্গরাজ্যের পরিমাণ ফল ৪ সহস্র লি ছিল। রাজধানী চম্পানগরী সুবৃহৎ বলিয়া হিউএন্থ্ সঙ্গের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। চম্পানগরীর প্রাচীর ইষ্টক নির্ম্মিত ও সমুচ্চ ছিল। এই প্রাচীর উচ্চ জাঙ্গালের উপর নির্ম্মিত এবং তজ্জন্য শত্রুগণের পক্ষে অভেদ্য ছিল। পরস্পর সংলগ্ন হিরণ্য পর্ব্বত এবং অঙ্গরাজ্যের যে বর্ণনা হিউএন্থসঙ্গের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আমরা এখানে তাহার মর্ম্মপ্রদান করিতেছি। হিরণ্য পর্ব্বত এবং অঙ্গরাজ্যদ্বয়ের ভূমি সমতল এবং উর্ব্বরা। জল বায়ু মৃদু ও উষ্ণ, লোকের প্রীতিকর। প্রকৃতিপুঞ্জের স্বভাব সরল ও নির্ম্মল। হিরণ্য পর্ব্বত রাজ্যে দ্বাদশটি দেবমন্দির বিদ্যমান আছে; এই সকল মন্দিরে নানা শ্রেণীর লোক বাস করিতেছে। সঙ্ঘারামের সংখ্যা দশ এবং শ্রমণের সংখ্যা চারি সহস্র। কিন্তু অঙ্গরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা এতদপেক্ষা হীনপ্রভ। তথায় বহুসংখ্যক সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অধিকাংশই ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল সঙ্ঘারামে কেবল দুইশত শ্রমণ বাস করিতেছেন। দেবালয়ের সংখ্যা বিংশতি।

দেশের বিবরণ

হিরণ্যপর্ব্বত (১) হইতে আমাদের বর্ণিত রাজ্যদ্বয়ের অন্যতর রাজ্য হিরণ্যপর্ব্বত রাজ্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই হিরণ্য পর্ব্বত সম্বন্ধে হিউএন্থ্সঙ্গ লিখিয়া গিয়াছেন, "হিরণ্যপর্ব্বত রাজ্যের রাজধানীর পার্শ্বেই হিরণ্যপর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে পর্ব্বত হইতে অনবরত ধূম বাষ্প গগন মণ্ডলে উত্থিত হইয়া সূর্য্যের কিরণ ও চন্দ্রের জ্যোতি আচ্ছন্ন করিতেছে। প্রাচীনকাল হইতে ঋষি ও ধার্ম্মিকবৃন্দ

হিরণ্যপর্ব্বত উষ্ণ প্রস্রবন

(১) হিরণ্যপর্ব্বতের অন্য নাম মুদ্গলগিরি। এক সময় এই পর্ব্বত কষ্টহরণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

আত্মার শান্তি লাভার্থ এই স্থানে আগমন করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে একটি দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। তত্রত্য অধিবাসীরা সনাতন নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতেছে।"

অঙ্গরাজ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে হিউএনথ্‌সঙ্গ যে কৌতুকাবহ বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, উপসংহারে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে। "কল্পের প্রারম্ভে পদার্থ সমূহের সৃষ্টি আরব্ধ হইলে মানবগণ গুহা ও গর্ত্তে বাস করিত। তাহারা গৃহনির্ম্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। অতঃপর একজন দেবী শাপগ্রস্তা হইয়া তাহাদের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। একদা তিনি গঙ্গাগর্ভে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তৎকালে তিনি দৈবশক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া অন্তর্ব্বত্নী হন। তাঁহার গর্ভে চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জম্বুদ্বীপ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের প্রত্যেকে এক এক অংশ গ্রহণ করিয়া রাজধানী, নগর প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চম্পানগরী তাঁহাদের এক জনের অধিকৃত অংশের রাজধানী ছিল। জম্বুদ্বীপের নগরমালা মধ্যে চম্পা নগরীই সর্ব্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১)

পৌরাণিক কথা, অঙ্গরাজ্যের উৎপত্তির বিবরণ

(১) হিউএনথসঙ্গের এই বিবরণ হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী। পুরাণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইক্ষ্বাকু বংশের দানবীর হরিশ্চন্দ্রের প্রপৌত্র চম্প চম্পানগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ।

—ঃ০ঃ—

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৬২৯—৪৫ খৃঃ) চিরখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউএনৎসঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎকালে

পঞ্চ বিভাগ

বঙ্গ নামে কোনও দেশ বা রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে প্রদেশ বঙ্গদেশ নামে পরিচিত, তাহা সে সময়ে পাঁচটি স্বতন্ত্র দেশ বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

১। পৌণ্ড্র বর্দ্ধন;—বর্ত্তমান মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা এই রাজ্যভুক্ত ছিল।

২। কামরূপ রাজ্য;—এই রাজ্য করতোয়া নদীর তীর হইতে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, পশ্চিম আসাম ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায় যে, কামরূপ রাজ্যের রাজধানীর নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ ছিল।

৩। সমতট;—সমতট শব্দের অর্থ তীরবর্ত্তী, বা সমতল দেশ। পূর্ব্ববঙ্গ। বরাহমিহিরের গ্রন্থে সমতটের নাম উল্লেখ দেখা যায়।

৪। তাম্রলিপ্তি;—বর্ত্তমান মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া এই রাজ্য গঠিত ছিল।

৫। কর্ণসুবর্ণ;—পশ্চিম বঙ্গ। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটী কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

হিউএনৎসঙ্গ এই সকল রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া

গিয়াছেন। সে বিবরণ কৌতূকাবহ, এবং তৎকালের অবস্থার সুন্দর চিত্রপট। আমরা উক্ত বিবরণের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধন।

পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন রাজ্য চক্রাকারে ৮ শত মাইল (৪০০০ লি); রাজধানী চক্রাকারে ৬ মাইল (৩০ লি)। এইস্থান জনাকীর্ণ। জলাশয়, রাজকার্য্যালয় ও পুষ্পোদ্যান সকল ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত। পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন রাজ্যের ভূমি সমতল, চিক্কণ ও উৰ্ব্বরা; এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সৰ্ব্ববিধ শস্য উৎপন্ন হয়। পনস ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়; এবং এই ফল অতিশয় লোকপ্রিয়। দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। জনমণ্ডলী বিদ্যানুরাগী। পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন রাজ্যে প্রায় বিংশতি সংখ্যক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে ন্যূনাধিক তিন সহস্র শ্রমণ বাস করেন। এখানে শতাধিক দেবমন্দির দেখা যায়; এই সকল দেব-মন্দিরে নানাসম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমূহ মিলিত হয়। অসংখ্য উলঙ্গ নিগ্রন্থ এই রাজ্যে বাস করেন।

রাজধানী হইতে পশ্চিমদিকে ৪ মাইল দূরে বাশিভা সঙ্ঘারাম অবস্থিত। সমস্ত ভবন আলোকপূর্ণ ও প্রশস্ত; চূড়া ও মণ্ডপ সমূহ অত্যুচ্চ। এই মঠের আচার্য্যের সংখ্যা সাত শত। পূৰ্ব্ব-ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার্য্য এই থানে বাস করেন।

বৌদ্ধকীৰ্ত্তি

এই বিদ্যালয়ের অনতিদূরে অশোক-রাজনির্ম্মিত স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে তথাগত (বুদ্ধদেব) পুরাকালে তিন মাস ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সময় সময় উপবাস দিনে ইহার চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হয়।

ঐ স্থানের পার্শ্বেই আর একটি স্থান। এই স্থানে প্রাচীন বুদ্ধ-

চতুষ্টয় পরিভ্রমণ ও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই সকল চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

ইহার অল্পদূরে একটি বিহারে বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। তাঁহার দৈবজ্ঞতার নিকট কিছুই অজ্ঞাত নহে; তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রমিতি ভ্রমশূন্য, দূর ও নিকট, নানাস্থানের লোক সকল আসিয়া তাঁহার প্রত্যাদেশ লাভের জন্য হত্যা দিয়া থাকে।

হিউএনৃথ্‌সঙ্গ পৌণ্ড্‌বর্দ্ধন হইতে কামরূপে গমন করেন। পৌণ্ড্‌বর্দ্ধন হইতে (৯০০ লি) পশ্চিমে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত ছিল। হুয়েনসাঙ পথিমধ্যে একটী সুবৃহৎ নদী (সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্র নদ) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কামরূপ।

কামরূপ রাজ্য চক্রাকারে ২ হাজার মাইল (১০ হাজার লি)। রাজধানীর পরিমাণ চক্রাকারে ৬ মাইল। কামরূপের ভূমি নিম্ন, উর্ব্বরা ও রীতিমত কর্ষিত। কামরূপে পনস ও নারিকেল ফল জন্মে। এই সকল বৃক্ষের সংখ্যা বহু, তথাপি উহার মূল্য অনেক। নগর সমূহের পার্শ্বে নদী বা কৃত্রিম জলাশয় বহমান। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও প্রীতিকর। কামরূপবাসিগণের আচার ব্যবহার সরল ও সাধুতা-সম্পন্ন। তাহারা ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণাভ পীতবর্ণ। তাহাদের স্বভাব উগ্র ও রুক্ষ। তাহাদের স্মৃতি-শক্তি তীক্ষ্ণ; তাহারা বিদ্যার্জ্জনে যত্নশীল।

কামরূপবাসীরা দেবদেবীর উপাসক। তাহারা উপাস্য দেবতার প্রীত্যর্থ বলি প্রদান করে। বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাদের আস্থা নাই।

কামরূপের ধর্ম্মমত

একারণ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে আজ পর্য্যন্ত আচার্য্যগণের মিলন জন্য কোনও সঙ্ঘারাম এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাঁহারা পবিত্র ধর্ম্মে বিশ্বাসী, তাঁহারা

গোপনে প্রার্থনা করে। এক শত দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। নানাসম্প্রদায়ভুক্ত সহস্র সহস্র লোক বাস করে। কামরূপের বর্ত্তমান অধিপতি ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত। এই বংশের আদি পুরুষের নাম নারায়ণ দেব। বর্ত্তমান রাজার নাম ভাস্কর বর্ম্মণ। তাঁহার উপাধি কুমার। অদ্য পর্য্যন্ত নারায়ণি বংশের এক সহস্র (?) পুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। কাম-রূপের অধিপতি জ্ঞানানুরাগী; তাঁহার আদর্শে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যেও জ্ঞানানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে। দূরবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে তীক্ষ্নদর্শী বিচক্ষণ লোক সকল রাজকার্য্য অন্বেষণে অপরিচিতের ন্যায় রাজ-ধানীতে উপনীত হন। যদিও রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহেন, তথাপি বিদ্বান শ্রমণগণকে তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন।

কামরূপের রাজবংশ

সুদূর চীন হইতে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য এক জন পরিব্রাজক (হিউএনৃথ্‌ সঙ্গ) নালন্দের সঙ্ঘারামে আগমন করিয়াছেন, কামরূপের অধিপতি এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দূত প্রেরণ করেন। কামরূপ রাজ্যে গমন জন্য তিনি রাজদূত কর্ত্তৃক তিনবার অনুরুদ্ধ হয়েন; কিন্তু তথাপি নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। তখন শীলভদ্র তাহাকে বলেন, "আপনি বুদ্ধদেবকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে অভিলাষী, অতএব সত্যধর্ম্ম প্রচার করাই আপনার কর্ত্তব্য। পথ সুদীর্ঘ বলিয়া আপনি ভীত হইবেন না। কুমাররাজপরিবার অপধর্ম্মে (হিন্দুধর্ম্ম) বিশ্বাসী, এখন তাঁহারা একজন শ্রমণকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, ইহা সুলক্ষণ। আমাদের অনুমিত হইতেছে যে, কামরূপের অধিপতি মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এবং জনসাধারণের হিতার্থ নিজে পুণ্য সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আপনার মহদন্তঃকরণ ছিল; আপনি জীবন তুচ্ছ করিয়া পৃথিবীর মঙ্গলকল্পে শাস্ত্র অন্বেষণের

কামরূপে হিউএনৃথ্‌ সঙ্গ

জন্য নানা দেশ ভ্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। স্বদেশ ভুলিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবেন ; প্রশংসা বা নিন্দা কিছুতেই বিচলিত না হইয়া পবিত্র ধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) বিস্তৃতির জন্য পথ পরিষ্কার, মিথ্যা শিক্ষায় ভ্রান্ত জনমণ্ডলীকে সুপথে পরিচালন ও পরহিতে আত্মহিত বিসর্জ্জন করিবার জন্য পরিশ্রম করা আপনার কর্ত্তব্য। যশের চিন্তা বিস্মৃত হইয়া কেবল ধর্ম্মবিষয়ে নিরত থাকিবেন।" ইহা শুনিয়া ঐ শ্রমণ আর কোনও আপত্তি না করিয়া রাজদূত সহ রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কুমার-রাজ বলিলেন, "আমি নিজে বিদ্যাবুদ্ধিহীন, তথাপি খ্যাতনামা বিদ্বজ্জনের অনুরাগী ; এই কারণ আপনার যশঃ ও প্রতিষ্ঠার বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনাকে আগমনের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছি।" শ্রমণ উত্তর করিলেন, "আমার বিদ্যাবুদ্ধি পরিমিত, আমার এই সামান্য খ্যাতির বিষয় মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে, ইহাতে আমি লজ্জিত হইলাম।" কুমাররাজ বলিলেন, "এখন শিলাদিত্য (ইনি দ্বিতীয় শিলাদিত্য ; শিলাদিত্য উপাধি মাত্র ; প্রকৃত নাম হর্ষবর্দ্ধন। প্রথম শিলাদিত্যের রাজত্ব কাল হিউএন্থ্‌সঙ্গের আগমনের ষাট বৎসর পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল। ইঁহারা উভয়েই কান্যকুব্জ দেশের অধিপতি ছিলেন।) কাজুঘির (কজিনঘর) দেশে বাস করিতেছেন। তিনি সত্য, জ্ঞান ও পুণ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিপুল অর্থ দান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন ; সমস্ত দেশের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ অবশ্যই এক সঙ্গে মিলিত হইবেন। শিলাদিত্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি প্রার্থনা করি, আপনি আমার সমভিব্যাহারে গমন করিবেন।" অতঃপর উভয়ে এক সঙ্গে যাত্রা করেন।

কামরূপ রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় পর্ব্বতমালা অবস্থিত। সীমান্তে চীন-দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রদেশবাসী অসভ্য জাতির বাস। এই সকল

অসভ্যের আচার ব্যবহার মান জাতির তুল্য। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এইস্থান হইতে দুই মাসে (চীনের) সুহপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, পঁহুছিতে পারি। কিন্তু পর্ব্বত ও নদী এই পথের বিঘ্ন; এবং দূষিত বায়ু, বিষাক্ত বাষ্প, ভয়ঙ্কর সর্প ও বিনাশ জনক গাছ গাছড়া প্রভৃতি মৃত্যুর কারণ সমূহ বর্ত্তমান। এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে দলে দলে হস্তী পাওয়া যায়। এইজন্য হস্তী বিশেষভাবে যুদ্ধকালে নিয়োজিত হয়।

কামরূপ রাজ্যের পূর্ব্ব সীমার বিবরণ

১২০০ কি ১৩০০ লি দক্ষিণে সমতটরাজ্য অবস্থিত।

সমতট।

সমতটরাজ্য চক্রাকারে ৬০০ মাইল (৩০০০ লি) এবং সমুদ্রের তীরবর্ত্তী। ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। রাজধানী চক্রাকারে ৪ মাইল। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মে। সর্ব্বত্র ফল ও ফুল পাওয়া যায়। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার ব্যবহার প্রীতিপ্রদ। সমতটবাসীরা স্বভাবতঃ কষ্টসহিষ্ণু, ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী, সকলে যত্নসহকারে বিদ্যা উপার্জ্জন করে। সমতটরাজ্যে সত্যধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) ও অপধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম) উভয় ধর্ম্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় দুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি করেন। ইঁহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমতটরাজ্যে ন্যূনাধিক একশত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেবমন্দিরেই নানাসম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমূহ উপাসনা করে। নিগ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

নগর হইতে অনতিদূরে অশোক নির্ম্মিত স্তূপ। এইস্থানে পুরাকালে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান।

বৌদ্ধকীর্ত্তি

ঐ স্তূপের অনতিদূরে একটি সঙ্ঘারামে হরিত-প্রস্তর-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তি আট ফিট উচ্চ।

সমতট হইতে ৯০০ লি পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ।

তাম্রলিপ্তি।

তাম্রলিপ্তি চক্রাকারে ৩০০ মাইল (১৪০০ বা ১৫০০ লি); ইহার রাজধানীর পরিমাণ মাত্র দুই বর্গ মাইল। ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং নানাবিধ ফলফুল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। তাম্রলিপ্তি গ্রীষ্মপ্রধান। লোক সকল ক্ষিপ্রকারী ও চঞ্চল। তাহারা পরিশ্রমী ও সাহসী। এখানে সত্যধর্ম্ম ও অপধর্ম্ম, উভয়বিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই বাস। সমতটরাজ্যে প্রায় দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল সঙ্ঘারামে ন্যূনাধিক এক সহস্র আচার্য্য বাস করেন। দেবমন্দিরের সংখ্যা ৫০; দেবমন্দিরগুলিতে নানাসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ উপাসনা করিতেছেন। তাম্রলিপ্তি রাজ্যের তটভূমি সমুদ্রের সহিত মিলিত; বস্তুতঃ তাম্রলিপ্তি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে মণিমুক্তা সংগৃহীত হয়; এবং এই কারণে তাম্রলিপ্তিবাসীরা সাধারণতঃ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী।

তাম্রলিপ্তির রাজধানীর পার্শ্বে অশোক-রাজ নির্ম্মিত স্তূপ। ইহার পার্শ্বে চারিজন প্রাচীন বুদ্ধের অবস্থান ও ভ্রমণের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধকীর্ত্তি

তাম্রলিপ্তির সাত শত লি উত্তর-পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ।

কর্ণ স্থবর্ণ।

কর্ণস্থবর্ণ রাজ্য চক্রাকারে ৩ শত মাইল (১৪০০ বা ১৫০০ লি); রাজধানী চক্রাকারে ৪ মাইল। কর্ণস্থবর্ণ জনাকীর্ণ দেশ। অধিবাসীরা ধনশালী ও সুখী। ভূমি নিম্ন ও চিক্কণ। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফুল ও নানাজাতীয় মূল্যবান পদার্থ জন্মে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ; লোকের আচার ব্যবহার মনোরম ও সাধুতাসম্পন্ন। তাহারা অতিশয় জ্ঞানানুরাগী, এবং অভিনিবেশ সহকারে জ্ঞানার্জ্জনে নিরত। এই দেশে অপধর্ম্মাবলম্বী ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, উভয় শ্রেণীর লোকই দেখা যায়। এখানে ন্যূনাধিক দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। প্রায় দুই হাজার আচার্য্য এই দশটি সংঙ্ঘারামে অবস্থিতি করেন। এখানে পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। কর্ণস্থবর্ণ দেশে অপধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অসংখ্য।

রাজধানীর পার্শ্বে রক্তবিতি নামক সঙ্ঘারাম। এই সঙ্ঘারামের কক্ষ সকল আলোকপূর্ণ ও প্রশস্ত ; তলবিশিষ্ট চূড়া সমুচ্চ। এই স্থানে রাজ্যের সমস্ত খ্যাতনামা বিদ্বান ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত হয়েন। তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পরস্পরের উন্নতি সাধন ও চরিত্রের পূর্ণতা-বিধানে যত্ন করেন। প্রথমতঃ কর্ণসুবর্ণবাসীরা সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তৎকালে দক্ষিণ ভারতের একজন অপধর্ম্মাবলম্বী উদরের উপর তাম্র পাত্র ও মস্তকে প্রজ্জলিত মশাল ধারণ করিতেন। এই ব্যক্তি দণ্ডহস্তে সগর্ব্বে কর্ণস্থবর্ণ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিপক্ষের সহিত তর্ক করিবেন বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন। এক জন লোক তাঁহাকে বলিল, "আপনার শরীর ও মস্তক এরূপ অদ্ভুত ভাবে সজ্জিত কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার জ্ঞান

বৌদ্ধ উপাখ্যান, কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার বিবরণ।

অপরিমিত ; তাহার ভারে আমার উদর বিদীর্ণ হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করি ; তন্নিমিত্তই উদরের উপর তাম্রপাত্র স্থাপন করিয়াছি। আমি অজ্ঞান ব্যক্তি সকলের দুঃখে বিচলিত হইয়াছি, ইহারা অন্ধকারে রহিয়াছে, এইজন্য আমি মস্তকে আলোক ধারণ করিয়াছি।”

দশ দিনের মধ্যেও কেহ তাঁহার সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হইল না। সমস্ত জ্ঞানী ও বিদ্বৎকুলে এরূপ ব্যক্তি একজনও ছিলেন না, যিনি তাঁহার সহিত তর্ক করেন : ইহাতে রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, “হায় ! আমার রাজ্যে অজ্ঞানান্ধকার এত দূর পরিব্যাপ্ত যে, একজন লোকও এই আগন্তুকের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। ইহা আমার রাজ্যের পক্ষে বড়ই অযশের বিষয়। কোনও উপযুক্ত লোকের সন্ধান পাওয়া যায় কি না, তাহা আমরা অতি নগণ্য স্থানেও সন্ধান করিয়া দেখিব।”

তখন একজন লোক বলিল, “মহারাজ ! নিকটবর্ত্তী বনে একজন শ্রমণ বাস করেন। তিনি অধ্যয়নে অতিশয় যত্নপর। তিনি এখন নির্জ্জনে গোপনে বাস করিতেছেন। তিনি আপন উৎকর্ষ বলে ইহার ন্যায় অধার্ম্মিকের সহিত তর্ক করিবার উপযুক্ত।” রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রমণকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য নিজে গমন করিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শ্রমণ উত্তর করিলেন ; “দক্ষিণ-ভারতে আমার নিবাস ; আমি দেশভ্রমণোপলক্ষে এখানে আগমন করিয়া কিছুদিনের জন্য অপরিচিতের ন্যায় বাস করিতেছি। আমার ক্ষমতা সামান্য ও সাধারণ। আমার বিশ্বাস যে, মহাশয় ইহা অবগত নহেন। যাহা হউক, যদিও কোন্ বিষয়ে তর্ক করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু অবগত নহি, তথাপি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে গমন করিব। যদি আমি তর্কে অপরাজিত থাকি তবে মহারাজকে একটি সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য প্রচারকগণকে আহ্বান

করিতে অনুরোধ করিব।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। আমি আপনার গুণবত্তা বিস্মৃত হইতে অসমর্থ।”

অতঃপর শ্রমণ রাজ নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। অপধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত স্বীয়শাস্ত্র হইতে ত্রিশ হাজার শব্দ আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার যুক্তি প্রগাঢ় ও প্রমাণ প্রচুর, বস্তুতঃ সমস্ত বিচার পদ্ধতি মনোহর হইয়াছিল।

শ্রমণ সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিলেন; কোনও তর্ক বা শব্দ তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারিল না। তিনি কয়েক শত শব্দের সাহায্যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন; এবং তারপর পণ্ডিতকে তদীয় ধর্ম্মের মূল সূত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতের বাক্য স্ফূর্ত্তি রুদ্ধ হয়, এবং তর্ক সমূহ অসার হইয়া পড়ে। তিনি উত্তর দিতে অসমর্থ হন। এইরূপে তাঁহার যশঃ প্রভা মলিন হইয়া যায়; এবং তিনি পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন।

অতঃপর রাজা শ্রমণকে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়া এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি এই রাজ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে।

ঐ সঙ্ঘারামের পার্শ্বে অনতিদূরে অশোক রাজার নির্ম্মিত স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তথাগত এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, তখন তিনি উক্ত স্থানে উপদেশ প্রদান করিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও জীবনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন।

বৌদ্ধ কীর্ত্তি

এই সঙ্ঘারামের পার্শ্বেই একটী বৌদ্ধবিহার। এই খানে চারি জন বৌদ্ধের ভ্রমণ ও অবস্থানের চিহ্ন দেখা যায়। নানা স্থানে আরও অনেকগুলি স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল স্থানে বুদ্ধদেব প্রকৃষ্ট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সমস্ত স্তূপও অশোক রাজার নির্ম্মিত।

কর্ণসুবর্ণ দেশের ৭০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড্র (উড়িষ্যা) রাজ্য।

উড়িষ্যা ও গঞ্জাম।

হিউএনৎথ সঙ্গ কর্ণ সুবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া ওড্র (উড়িষ্যা বা উৎকল) রাজ্যে গমন করেন। তৎকালে ওড্ররাজ্যের চতুঃসীমা সুবিস্তৃত ছিল। হিউএনৎথ সঙ্গ ওড্ররাজ্যের পরিমাণ সাত সহস্র লি বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ওড্রদেশের নাম উল্লেখে পুরী বা শ্রীক্ষেত্রের বিষয় আসিয়া পড়ে। কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই তীর্থ ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, অথবা প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিলেও তাদৃশ খ্যাতি লাভ ঘটে নাই। তৎকালে ওড্রদেশের অন্য একটি তীর্থ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ভারত ভূমির সর্ব্বত্র বিঘোষিত ছিল! ওড্রদেশের এই পুণ্যভূমি সম্বন্ধে হিউএনৎথ সঙ্গ লিখিয়া গিয়াছেন, "ওড্র রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে সমুচ্চ শৈলোপরি পুষ্পগিরি নামক একটী সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। (১) পুষ্পগিরি সঙ্ঘারামস্থ প্রস্তর স্তূপ হইতে অপূর্ব্ব আলোক বহির্গত এবং নানা প্রকার অলৌকিক দৃশ্য প্রকটিত হইয়া থাকে। এই স্থানে নানা দিগ্দেশ হইতে বৌদ্ধগণ আগমন করেন এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ছত্র সকল উপহার দেন। এই সমুদয় ছত্র গম্বুজের মস্তকে স্থাপিত হয়।" পুষ্পগিরি বৌদ্ধতীর্থের জন্য ওড্রদেশ বৌদ্ধগণের প্রিয় স্থান ছিল। তৎকালে ওড্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী

ওড্রদেশ।

পুষ্পগিরি তীর্থ।

---

(১) বর্ত্তমান উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরি।

ছিল। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ লিখিয়াছেন, "ওড্রবাসীরা অসভ্য, লম্বাকৃতি এবং ঈষৎ পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যার্জ্জনে সাতিশয় পরিশ্রমী। অধিকাংশ ওড্রবাসী বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী। এই দেশে প্রায় এক শত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে, এই সকল সঙ্ঘারামের শ্রমণ সংখ্যা ৫০। বৌদ্ধ স্তূপের সংখ্যা ১০; তৎসমুদয় অশোক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।"

ওড্রবাসীদের ধর্ম্মমত।

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের গ্রন্থে ওড্র রাজ্যের ধর্ম্ম বৈভবের বিবরণের সঙ্গে পার্থিব বৈভবের বিবরণও বিবৃত হইয়াছে। আমরা সে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মে; ফলের উৎপন্ন পরিমাণ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক। ওড্র রাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমান্তে সমুদ্রকূলে চরিত্রনগর (১) অবস্থিত। এই নগর চক্রাকারে বিংশতি লি। এই স্থান হইতে বণিকগণ দূর দেশাভিমুখে গমন করেন। নানাদেশের অপরিচিত যাত্রীবর্গ গমনাগমন কালে এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই নগরের প্রাচীর উচ্চ এবং সুদৃঢ়। চরিত্রনগরে সর্ব্বপ্রকার দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান বস্তু পাওয়া যায়। চরিত্রনগরের বহির্ভাগে পঞ্চ সংখ্যক ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল ধর্ম্মশালার একাধিক তলবিশিষ্ট চূড়া সমূহ সমুচ্চ এবং তপস্বিগণের সুগঠিত মূর্ত্তি দ্বারা পরিশোভিত। (২)

ওড্ররাজ্যের ধনধান্য

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ ওড্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আর একটি দেশে উপনীত হন। তদীয় গ্রন্থে এই দেশ কঙ্গ-উ-টু নামে বর্ণিত হইয়াছে।

---

(১) বর্ত্তমান পুরী।

(২) সম্ভবতঃ এই সকল ধর্ম্মশালা বর্ত্তমান সময়ে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

এই দেশের বর্ত্তমান নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমাজে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। ফাগুরসান্ সাহেব নির্দ্দেশকরিয়াছেন যে, কঙ্গ-উ-টু রাজ্য বর্ত্তমান মেদিনীপুর হইতে ১৭০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমদিকে ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ছিল এবং খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুহা দর্শন জন্যই হিউএন্থ্ সঙ্গের এই রাজ্যে আগমন হইয়াছিল। কিন্তু কানিংহ্যাম সাহেবের মতে চিল্কা হ্রদের তীরে কঙ্গ-উ-টু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্ত্তমান গঞ্জাম নগর ইহার রাজধানী ছিল। হিউএন্থ্ সঙ্গ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই রাজ্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত এবং শৈল সীমান্তবর্ত্তী সমুদ্র সংলগ্ন বহু সংখ্যক নগর দ্বারা পরিশোভিত ছিল। এই নির্দ্দেশই কানিংহাম সাহেবের ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ। আমরা তাঁহার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিলাম। চিল্কাহ্রদের তীরবর্ত্তী এই রাজ্য চক্রাকারে এক সহস্র লি মাত্র ছিল। কিন্তু আমরা হিউএনথ্ সঙ্গের গ্রন্থ হইতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রভূত ক্ষমতা ও সম্পদের বিবরণ জানিতে পারি। সে বিবরণের অনুবাদ এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাচীন গঞ্জাম

কঙ্গ-উ-টু রাজ্যবাসীরা দীর্ঘাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এবং অপরিষ্কার। তাহারা ভদ্র ব্যবহারে কিয়ৎ পরিমাণে অভ্যস্ত এবং আদান প্রদান সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে সাধুতা সম্পন্ন। তাহারা সত্য ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, অপশাস্ত্রে তাহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যের নগর সমূহ সুদৃঢ় ও সমুচ্চ। সৈনিকগণ সাহসী এবং নির্ভয়। তাহারা বাহুবলে পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহ শাসন করিতেছে; কেহই তাহাদের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। এই রাজ্য সমুদ্র তীরবর্ত্তী বলিয়া এখানে নানাপ্রকার দুর্ল্লভ এবং মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়। তাহারা ক্রয় বিক্রয় কালে কড়ি ও মুক্তা ব্যবহার করে।

প্রাচীন গঞ্জামের ধর্ম্মবিশ্বাস, শৌর্য্য বীর্য্য, সম্পদ।

কঙ্গ-উ-টু রাজ্য নীলাভ সবুজবর্ণ হস্তীর জন্মস্থান। অবিশ্বাসীরা এই সকল হস্তী যান বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। এবং বহুদূর গমনাগমন করে। (১)

দক্ষিণ ভারত।

খৃষ্টের জন্মের অন্যূন এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য-ভারতে ভারতীয় আর্য্যজাতির উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে দুইটী রাজ্য সংস্থাপিত হয় ; একটির নাম কলিঙ্গ, অপর-টীর নাম গঙ্গারাঢ়ী। বঙ্গদেশের একাংশ অতীত-কালে গঙ্গারাঢ়ী নামে পরিচিত ছিল। গ্রীক-লিখিত বিবরণ-পাঠে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে গঙ্গা নদীর সাগর-সঙ্গম-স্থল হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সমগ্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্য নামে খ্যাত ছিল। কালক্রমে কলিঙ্গ রাজ্য হইতে তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ), ওড্র (উড়িষ্যা) প্রভৃতি কতিপয় রাজ্যের উদ্ভব হয়, এবং কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা চিল্কাহ্রদ হইতে গোদা-বরী নদী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বশাখাভুক্ত চালুক্যগণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন।

রাজবংশ এবং রাজ্যসমূহ।

---

(১) হিউএনৎ সঙ্গের পর্য্যটন কালে ললিতেন্দ্র কেশরী নামক নরপতি বিপুল বিক্রমে দেশ শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার পর অচিরেই তাহার ভাগ্যচক্র নিম্নগামী হইয়াছিল। ললিতেন্দ্রকেশরী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সম্ভবতঃ এই কারণ তিনি কান্যকুব্জাধিপতির বিরাগভাজন ছিলেন। কান্যকুব্জের নরপতি তাহাকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় আর্য্যগণ প্রাচ্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ভারতে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় অন্ধ্রবংশীয়গণ দক্ষিণ প্রদেশের একাংশে অধিকার স্থাপন করেন, এবং অচিরে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। অন্ধ্রগণ পশ্চিমাভিমুখে আর্য্যপ্রভাব বিস্তার করেন। এই প্রদেশে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, প্রভৃতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্ধ্রগণ কালক্রমে (২৬ খৃঃ পূঃ অব্দ) মগধদেশ করতলগত করেন, এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

আর্য্যগণ অন্ধ্রবংশ-সংশ্লিষ্ট দেশ পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, তাঁহাদের সঙ্গে দ্রাবিড়জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে দক্ষিণ প্রদেশের একাংশের অধিবাসী ছিলেন। দ্রাবিড়ে সভ্যতা অসম্পূর্ণ ছিল। আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে দ্রাবিড়গণ আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অন্যতম নগরী কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুর আর্য্যশাস্ত্রালোচনার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

দক্ষিণ-ভারতের শেষাংশে তিনটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যে চোল, চের ও পাণ্ড্যবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। বহুমানাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় খৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্য তিনটির প্রতিষ্ঠাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশোকের ক্ষোদিত লিপিতে চোল ও পাণ্ড্যরাজ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যসমূহের অবস্থা কিরূপ ছিল, হিউ-এন্‌থ্‌সঙ্গের ভ্রমণকাহিনী হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। আমরা সেই বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

কলিঙ্গ। (১)

কলিঙ্গরাজ্য চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। কলিঙ্গরাজ্যে ফল ফুল পর্য্যাপ্ত। এই দেশে বহু শত লি পর্য্যন্ত বন জঙ্গল বিস্তৃত রহিয়াছে। সেখানে বন্যহস্তী পাওয়া যায়। জলবায়ু সাতিশয় উত্তপ্ত। কলিঙ্গবাসীদের স্বভাব চরিত্র উগ্র। অধিকাংশ অধিবাসী রূঢ়স্বভাব ও অসভ্য হইলেও, তাহারা প্রতিশ্রুতি-পালনে অবহিত, এবং বিশ্বাস-যোগ্য। সত্যধর্ম্ম-বিশ্বাসীর সংখ্যা অল্প। কলিঙ্গরাজ্যে সঙ্ঘারামের সংখ্যা দশ, এবং শ্রমণের সংখ্যা পাঁচ শত। এই দেশে প্রায় এক শত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। পুরাকালে কলিঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যা অত্যধিক ছিল। তৎকালে পঞ্চবিজ্ঞানজ্ঞ এক জন ঋষি পর্ব্বতোপরি বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহার দৈববল খর্ব্ব হইয়া আসিলে, কলিঙ্গবাসীরা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার অভিশাপে বালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে জনপুঞ্জ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, এবং সমগ্র দেশ জনশূন্য হইয়া যায়। তাহার পর বহুকাল অন্তে অন্য দেশ হইতে লোক সকল আসিয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি লোকবসতি বিরল। কলিঙ্গদেশে বহুসংখ্যক জৈন ধর্ম্মাবলম্বীর বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

কোশল। (২)

এই রাজ্য চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকারে প্রায় চল্লিশ লি। (রাজধানীর নাম সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা

(১) কানিংহাম লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে কলিঙ্গ রাজ্য গোদাবরী নদী অবধি বিস্তৃত ছিল। ইন্দ্রাবতী নদীর গায়লিয় শাখা কলিঙ্গ রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমা ছিল। সম্ভবতঃ রাজমহেন্দ্রী কলিঙ্গরাজ্যের প্রধান নগরী ছিল। এই স্থানে পূর্ব্ব-শাখা-ভুক্ত চালুক্য বংশীয়গণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

(২) এই কোশল রাজ্য উত্তর ভারতবর্ষের কোশল দেশ হইতে বিভিন্ন। এই

করিয়াছেন। কানিংহামের মতে, রাজধানীর নাম ছিল চাণ্ড। এই স্থান বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী হইতে ২৯০ মাইল। মতান্তরে, বর্ত্তমান নাগপুর, অমরাবতী, বা ইলিচপুরে কোশল রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল)। কোশলরাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। নগর ও পল্লীসমূহ পরস্পর-সংলগ্ন; তৎসমুদয় অতিশয় জনপূর্ণ। লোক সকল দীর্ঘাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ। জনপুঞ্জের চরিত্র কঠোর ও ক্রোধপ্রবণ। তাহারা সাহসী ও উগ্র। কোশলরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও অপধর্ম্মাবলম্বী, উভয়-ধর্ম্মাবলম্বী লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা শিক্ষানুরাগী ও বুদ্ধিমান। কোশলরাজ্যের অধিপতি ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা আছে; তদীয় সদ্‌গুণ ও প্রেম প্রসিদ্ধ। কোশল-রাজ্যে দেবমন্দিরের সংখ্যা ৭০। সঙ্ঘারামের সংখ্যা প্রায় এক শত।

নাগার্জ্জুন বোধি সত্ত্ব

এই সকল সঙ্ঘারামে ন্যূনাধিক দশ সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছেন। পুরাকালে এই রাজ্যে সদ্বাহ নামে এক জন রাজা ছিলেন। তাঁহার সমসময়ে নাগার্জ্জুন নামধেয় বোধিসত্ত্ব বাস করিতেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিশালী ছিলেন। তাহার অপরিমেয় জ্ঞানের কথা সর্ব্বত্র খ্যাত ছিল। নাগার্জ্জুন এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। সে ঔষধ সেবন করিয়া লোকে শত শত বৎসর ব্যাপী দীর্ঘায়ু ও চিরযৌবন লাভ করিত। সদ্বাহ রাজা এই ঔষধ সেবন করিয়াছিলেন। একদা তাঁহার পুত্র তদীয় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার রাজত্ব-লাভের আর কত বিলম্ব আছে? মহারাণী উত্তর করিলেন, তোমার রাজত্ব

রাজ্য উড়িষ্যার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল; মহানদী ও গোদাবরীর শাখা প্রশাখা এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। কানিংহামের মতে, প্রাচীন কোশল বর্ত্তমান মধ্য-ভারতের গিন্দওয়ার প্রদেশ, এবং উহার রাজধানী বর্ত্তমান গোদাবরী নদীর তীরে চাণ্ড নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। তোমার পিতা বহু শত বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনেক পুত্র পৌত্র বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। নাগার্জ্জুনের ধর্ম্মচর্য্যা ও ঔষধের প্রভাবে এইরূপ হইয়াছে। নাগার্জ্জুন যে দিন দেহত্যাগ করিবেন, তোমার পিতারও সেইদিন মৃত্যু হইবে। নাগার্জ্জুনের প্রজ্ঞা প্রকৃষ্ট ও বহ্বায়তন; তাঁহার মানব-প্রেম ও জনহিতৈষণা সুগভীর। তিনি লোকহিতার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। যদি তুমি রাজপদ গ্রহণ করিতে অভিলাষ কর, তবে তাঁহার শরণাপন্ন হও। এই কথোপকথনের পর রাজকুমার আচার্য্য নাগার্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, পুরাকালে যে সকল মহাত্মা লোকহিতার্থ জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুণ্যকথা আমার মাতার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। রাজা চন্দ্রপ্রভ ব্রাহ্মণকে মস্তক প্রদান করিয়াছিলেন, মৈত্রীবল তৃষ্ণার্ত্ত যক্ষকে স্বীয় রক্ত পান করাইয়াছিলেন। যুগে যুগে মহাত্মাগণ লোক-হিতার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। প্রত্যেক যুগেই তাদৃশ মহদৃষ্টান্ত ঘটিয়াছে। মহাত্মন্ আপনিও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাগণ সদৃশ মহামনা; আমার হিতসাধন জন্য মস্তক অর্পণ করিবেন, আমি এইরূপ এক জন মহদ্ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতেছি। রাজকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া আচার্য্য নাগার্জ্জুন শুষ্কপত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা সদ্বাহ এই দুর্ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

রাজধানীর তিন শত লি দূরে ব্রহ্মগিরি নামক পর্ব্বত বিদ্যমান ছিল। এই পর্ব্বতমালার সর্ব্বোন্নত শৃঙ্গে রাজা সদ্বাহ আচার্য্য নাগা-র্জ্জুনের সন্তোষসাধন জন্য একটি অতি মনোরম সঙ্ঘারাম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম পঞ্চতল ছিল; প্রত্যেক তলে চতুঃসংখ্যক বৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত, এবং

ব্রহ্মগিরি সঙ্ঘারাম

প্রত্যেক গৃহ বিহারে পরিণত হইয়াছিল; প্রত্যেক বিহারে সুগঠিত ও সুসজ্জিত স্বর্ণনির্ম্মিত পূর্ণাবয়ব বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রহ্মগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরের ন্যায় সঙ্ঘারামের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত তল অভিষিক্ত করিয়া বহির্ভাগে গমন করিয়াছিল। আচার্য্য নাগার্জ্জুন এই সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী ও সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। সর্ব্বোচ্চ তলে বুদ্ধমূর্ত্তি, বুদ্ধের উপদেশাবলী ও বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত হইয়াছিল। পঞ্চম অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন তলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ তলে শ্রমণগণ শিষ্যবৃন্দের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্য্যায় কাল অতিবাহিত করিতেন। একদা শ্রমণগণ আত্মকলহে নিরত হইয়াছিলেন, এবং বিবাদাস্পদ বিষয়ের মীমাংসার জন্য রাজসমীপে গমন করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে ব্রাহ্মণগণ সঙ্ঘারাম বিনষ্ট করিয়া শ্রমণগণের পুনরাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

অন্ধ্‌ দেশ।

অন্ধ্‌ দেশ চক্রাকারে প্রায় তিন সহস্র লি। অন্ধ্‌ দেশের রাজধানী চক্রাকারে বিংশতি লি। ভূমি উর্ব্বরা ও ফল-শস্য-পূর্ণ। অন্ধ্‌ দেশ গ্রীষ্মপ্রধান; লোক সকল উগ্রস্বভাব ও ভাব-প্রবণ। ভাষা ও রচনা-প্রণালী মধ্য-ভারতবর্ষীয় ভাষা ও রচনাপ্রণালী হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু বর্ণমালার আকৃতি প্রায় একরূপ। এই দেশে বিংশতিসংখ্যক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। তৎসমুদয়ে তিন সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছেন। দেবালয়ের সংখ্যা ত্রিশ। (১)

(১) অন্ধ্‌ জাতির অধ্যুষিত বলিয়া এই দেশ অন্ধ্‌ দেশ নামে পরিচিত ছিল। প্লিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অন্ধ পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া গণ্য ছিল। এক লক্ষ

ধনককট।

এই দেশ চক্রাকারে প্রায় ৬ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ৪০ লি। (১) ভূমি উর্ব্বরা ও শস্য-শালিনী। এই দেশের বহুল অংশ মরুভূমি। নগরের লোকসংখ্যা অল্প; ধনককট দেশ গ্রীষ্ম-প্রধান; অধিবাসীরা ঈষৎ-পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা ভাবপ্রবণ এবং ক্রোধশীল। তাহারা জ্ঞানানুরাগী। ধনককট দেশে সঙ্ঘারামের সংখ্যা বহু। কিন্তু তৎসমুদয়ের অধিকাংশই ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। এই সকল ভগ্ন সঙ্ঘারামে ন্যূনাধিক এক সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছেন। দেবমন্দিরের সংখ্যা এক শত

রাজধানীর পূর্ব্ব দিকে পর্ব্বতপার্শ্বে পূর্ব্বশিলা নামক সঙ্ঘারাম, এবং পশ্চিম দিকে পর্ব্বতগাত্রে অভরশিলা নামক সঙ্ঘারাম ভগ্ন পরিত্যক্ত দশায় বিদ্যমান আছে। এক জন পূর্ব্ববর্ত্তী অধিপতি বুদ্ধদেবের উদ্দেশে এই দুইটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পুরাকালে ভববিবেক নামক এক জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি কপিলের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি নাগার্জ্জুনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ভববিবেকের সমসময়ে মগধের

পদাতিক সৈন্য, দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও এক হাজার রণহস্তী অন্ধ্রজাতির রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল। অন্ধ্রদেশের অবস্থান সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। উইলসন নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এই আলোচ্য দেশ গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। হিউ-এন্থ্-সঙ্গের গ্রন্থপাঠে এই উক্তি ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ, তিনি দক্ষিণ-ভারতের প্রদেশসমূহে অন্ধ্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। কানিংহাম বহু অনুসন্ধান এবং বিবেচনা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ওয়ারেঙ্গল নামক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অন্ধ্রদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(১) কানিংহামের মতে, ধনককট রাজ্যের রাজধানী বর্ত্তমান সময়ে অমরাবতী (বেরার প্রদেশের প্রধান নগরী) নামে পরিচিত।

ধর্ম্মপাল প্রবলোৎসাহে ধর্ম্ম-প্রচারে নিরত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্যে ভববিবেক পাটলীপুত্র নগরে গমন করেন। কিন্তু তৎকালে ধর্ম্মপাল বোধিদ্রুমতলে বাস করিতেছিলেন।

ভববিবেকের উপাখ্যান।

এই কারণে ভববিবেক পাটলীপুত্র নগরে উপনীত হইয়া ধর্ম্মপালকে আনয়ন করিবার জন্য এক জন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মপাল তাঁহার প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মানব-জীবন ছায়া-সদৃশ, মানবশরীর জলবিম্বমাত্র। আমি সমস্ত দিন কাজ করি, আমার তর্ক বিতর্কের সময় নাই। তুমি ফিরিয়া যাও; তাঁহার সঙ্গে আমার সম্মিলনের উপায় নাই। অতঃপর ভববিবেক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এক দিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, বুদ্ধরূপে মৈত্রেয়ের দর্শন লাভ না করিলে কে আমার সংশয়ের অপনোদন করিয়া দিবে? তাহার পর তিনি পানাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির সম্মুখে হৃদয়ধারিণী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর অন্তে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব দিব্যমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার উদ্দেশ্য কি? ভববিবেক উত্তর করিলেন, মৈত্রেয়ের আগমন পর্য্যন্ত আমি জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব আদেশ করিলেন, যদি তুমি স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা কর, তবে ধনককট দেশে গমন করিয়া পবিত্রচিত্তে বজ্রপাণিধারিণী মন্ত্র সাধনা কর। ধনককট দেশের নগরের দক্ষিণভাগে বজ্রপাণি দিব্যাত্মার কল্যাণে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এই আদেশক্রমে ভববিবেক ধনককট দেশে আগমন করিয়াছিলেন, এবং বৎসরব্যাপিনী সাধনার ফলে তাঁহার সম্মুখে মৈত্রেয় প্রকট হইয়াছিলেন।

চোল।

চোলদেশ (বর্ত্তমান তাঞ্জোর জেলায় প্রাচীন চোলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু এই প্রাচীন রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমা কাবেরীনদী-তটবর্ত্তী সালেম নামক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।) চক্রাকারে প্রায় ২৫০০ লি; ইহার রাজধানীর পরিমাণ প্রায় ১০ লি। চোল দেশ পরিত্যক্ত এবং বন্য। সমগ্রদেশ জলাভূমি ও জঙ্গলে পূর্ণ। জনসংখ্যা অতি সামান্য। এই দেশে দস্যুরা প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন করে। অধিবাসিগণ অনাচারী ও নিষ্ঠুরচরিত্র; ক্রোধই তাহাদের প্রকৃতির বিশেষত্ব। চোল গ্রীষ্মপ্রধান। এই দেশের সঙ্ঘারামসমূহ ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে; তৎসমুদয় নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন। বহুসংখ্যক দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশে বহুসংখ্যক জৈনধর্ম্মাবলম্বী বাস করিতেছে।

দ্রবিড়। (১)

দ্রবিড় রাজ্য চক্রাকারে প্রায় দুই হাজার লি; এই রাজ্যের রাজধানীর নাম কাঞ্চীপুর, এবং উহার পরিমাণফল প্রায় ৩০ লি। দ্রবিড় রাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা ও হল-কৃষ্ট; প্রচুরপরিমাণে শস্য জন্মে; ফল ফুলও পর্য্যাপ্ত; ক্ষেত্রে মহার্ঘ রত্ন ও অন্যান্য দ্রব্যও উৎপন্ন হয়। দ্রাবিড় রাজ্য গ্রীষ্মপ্রধান। অধিবাসীরা সাহসী; সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তা তাহাদের চরিত্রের ভূষণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী। এই দেশে ন্যূনাধিক এক শত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। শ্রমণের সংখ্যা ১০ সহস্র। দেবমন্দিরের সংখ্যা অশীতি। কাঞ্চীপুর

ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব

(১) দ্রবিড় রাজ্য অতি প্রাচীন। কানিংহামের মতে, এই রাজ্য উত্তর দিকে পশ্চিম-উপকূলবর্ত্তী কুন্দপুর হইতে পুলিকট হ্রদ পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণ দিকে কালিকট হইতে কাবেরী নদীর মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নগর ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান। ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব এক জন প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রীর পুত্র ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি আরো বিকাশলাভ করে। রাজা ও রাণী তাঁহাকে যৌবনের প্রারম্ভে একবার বিবাহোৎসবে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার হৃদয় দুঃখে পীড়িত হইয়া উঠে, এবং তিনি অতিশয় কষ্ট অনুভব করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন। তদীয় ব্যাকুল প্রার্থনায় চঞ্চল হইয়া দিব্যাত্মা তাঁহাকে দূরে লইয়া যান, তিনি সেই স্থানে লুকায়িত থাকেন। বহু লি পথ অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব একটি পার্ব্বত্য সঙ্ঘারামে উপনীত হন, এবং বুদ্ধদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। এক জন শ্রমণ এই মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান, এবং তস্কর বলিয়া সন্দেহ করেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব কথোপকথনকালে আপনার মনোভাব তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। বৌদ্ধাচার্য্য এই আশ্চর্য্য ঘটনায় অতীব বিস্মিত হন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। রাজা বহু অনুসন্ধানের পর ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্বের বিষয় জানিতে পারেন। ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব বৌদ্ধ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য উৎকট সাধনা আরম্ভ করেন।

মালকূট।

এই দেশ (বর্ত্তমান মাদুরা জেলা) চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ৪০ লি। মালকূট রাজ্যের ভূমি অত্যন্ত লবণাক্ত ও অনুর্ব্বরা। পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপসমূহ হইতে নানাবিধ মূল্যবান পণ্য আনীত হইয়া থাকে। অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা দৃঢ়চিত্ত ও উগ্রস্বভাব। অনেকে সত্যধর্ম্মাবলম্বী। অন্য ধর্ম্মের লোকের

সংখ্যাও অনেক। অধিবাসীরা জ্ঞানানুরাগী নহে; বাণিজ্যের লাভ-ক্ষতি-গণনাতেই তাহাদের সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই দেশে বহুসংখ্যক পুরাতন সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তৎসমুদয়ের প্রাচীরমাত্র দণ্ডায়মান আছে। বহু শত দেব-মন্দির পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল মন্দিরের অধিকাংশ উপাসকই জৈনধর্ম্মাবলম্বী। মালকূট দেশ গ্রীষ্মপ্রধান।

মালকূট সঙ্ঘারাম মহেন্দ্র।

মালকূট রাজ্যের রাজধানীর অদূরে পূর্ব্বদিকে একটি পুরাতন সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। এই সঙ্ঘারাম অশোক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই সঙ্ঘারামের ভিত্তি-প্রাচীরমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সিংহদ্বার ও প্রাঙ্গণ ভূমি জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে।

চন্দন বৃক্ষ।

এই দেশের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রকূলে মলয়পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়; এই পর্ব্বতমালা সমুচ্চশিখর ও প্রপাত, গভীর উপত্যকা ও স্রোতস্বিনীর জন্য বিখ্যাত। মলয়-পর্ব্বতে শ্বেতবর্ণ চন্দনবৃক্ষ জন্মে। চন্দন বৃক্ষ অতি শীতল; এই কারণ সর্প সকল উহার চারি দিকে জড়াইয়া থাকে; শীতসমাগমে এই সকল সর্প বৃক্ষ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়; তখন চন্দন বৃক্ষ কাটিয়া আনা হয়।

পোতলক পর্ব্বত

মলয়পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে পোতলক পর্ব্বত অবস্থিত; এই পর্ব্বতের শিখরদেশে একটি হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই হ্রদের জল দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল। ইহার তীরে দেবগণের মন্দির দণ্ডায়মান আছে। সে মন্দিরে সময় সময় অবলোকিতেশ্বরের আবির্ভাব হয়। এই কারণ বোধিসত্ত্বের দর্শনকামী ব্যক্তিগণ জীবন তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতশিখরাভিমুখে যাত্রা করেন।

পোতলক পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতীরে একটি নগর (সম্ভবতঃ আমাদের চীন পরিব্রাজক নাগপত্তনম্ নগরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন) দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে মাল্কূটবাসীরা দক্ষিণ সমুদ্রে সিংহল দ্বীপে গমন করেন।

কঙ্কণ।

এই দেশ চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। কঙ্কণ দেশ উর্ব্বর ও কর্ষিত। অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ, কঠোরস্বভাব ও কর্ম্মানুরাগী। তাহারা জ্ঞানানুরাগী। কঙ্কণ দেশে প্রায় এক শত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা দশ সহস্রের অধিক নহে।

মহারাষ্ট্র।

মহারাষ্ট্র দেশ চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানী (এই রাজধানীর নাম সম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। সেণ্ট মার্টিন দেবগিরি বা দৌলতাবাদকে প্রাচীন মহারাষ্ট্রের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দৌলতাবাদ নদীতীরে অবস্থিত নহে। কানিংহাম সাহেবের মতে কৈলাস-নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কল্যাণ বা কল্যাণী প্রাচীন মহারাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। ফার্গুসন টোকা কুলথম্ব অথবা পৈতানকে রাজধানী রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।) একটি বৃহৎ নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগর চক্রাকারে ত্রিশ লি। মহারাষ্ট্র দেশের ভূমি উর্ব্বরা ও কর্ষিত। অধিবাসীরা ন্যায়বাদী; কিন্তু তাহারা কঠোরস্বভাব ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহারা উপকারীর নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকে; কিন্তু শত্রুর বিনাশ সাধনে দয়ামায়াশূন্য। তাহারা অপমানের প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত

নহে। দুঃস্থ ব্যক্তির সহায়তাকালে আন্তরিকতাবশতঃ তাহাদের আত্ম-বিস্মৃতি জন্মে। প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহারা শত্রুকে প্রথমতঃ সতর্ক করিয়া দেয়। তারপর পরস্পর সশস্ত্র হইয়া বরশা দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করে। যদি কোনও সেনাপতি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েন, তবে তাহারা কোনও প্রকার দণ্ডবিধান না করিয়া তাঁহাকে পরিধান করিবার জন্য রমণীর পরিচ্ছদ প্রদান করে; এইরূপ ব্যবহারের ফলে পরাজিত সেনাপতি বাধ্য হইয়া মৃত্যুর শরণাপন্ন হয়েন।

মহারাজ পুলকেশী।

মহারাষ্ট্র দেশের সৈন্যবৃন্দ সাতিশয় শৌর্য্যবীর্য্যশালী। এমন কি, এক জন সৈন্য দশ সহস্রের সম্মুখীন হইতেও পরাঙ্মুখ হয় না। এ কারণ দেশাধিপতি প্রতিবেশীদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্র দেশের অধিপতি ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত। তাঁহার নাম পুলকেশী। তাঁহার সৎকার্য্যের প্রভাব সুদূর পর্য্যন্ত অনুভূত হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ অধিপতির নিতান্ত অনুগত, এবং তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর। বর্ত্তমান সময়ে মহারাজ শীলাদিত্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত মনুষ্য সকলকে পরাভূত করিয়াছেন, এবং সুদূর দেশেও তাঁহার বিজয়-নিশান উড্ডীন হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র মহারাষ্ট্রবাসীরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। তিনি এই জাতিকে বশীভূত ও দণ্ডিত করিবার পূর্ব্বে পঞ্চভারত হইতে সৈন্য-সংগ্রহ ও সমগ্র দেশ হইতে উৎকৃষ্ট নায়কবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়াছিল।

ধর্ম্মবিশ্বাস।

মহারাষ্ট্রবাসীরা জ্ঞানানুরাগী এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু, উভয় শাস্ত্রের অধ্যয়নেই তৎপর। মহারাষ্ট্র দেশে এক শত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। এই সকল সঙ্ঘারামে পাঁচ হাজার শ্রমণ বাস করিতেছে। দেবমন্দিরের সংখ্যাও ন্যূনাধিক

এক শত। দেবমন্দিরসমূহে নানামতাবলম্বী অপধর্ম্মী দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্ব-প্রান্তে একটি উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। এই পর্ব্বতের অন্ধকার উপত্যকাভূমিতে একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘারামের সমুচ্চ কক্ষ ও সুগভীর পার্শ্বমন্দিরসমূহ পর্ব্বতগাত্রে ভেদ করিয়া গিয়াছে। এক তলের উপর আর একটি তল উত্থিত হইয়া বন্ধুর শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়াছে, এবং উপত্যকামুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (১) এই সঙ্ঘারাম অর্হৎ আচার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আচার অর্হৎ পশ্চিম ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে তিনি পরজন্মে কীদৃশ আকার ধারণ করিয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য, অর্হৎ আচারের ঔৎসুক্য জন্মে। তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার মাতা স্ত্রীলোকের আকার ধারণ করিয়া মহারাষ্ট্রদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মাতাকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রদেশে আগমন করেন, এবং এক দিন ভিক্ষা করিতে করিতে তাঁহার মাতার বাসভবনে উপনীত হন। একটি ক্ষুদ্র বালিকা ভিক্ষুক দেখিয়া ভিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তণ্ডুলহস্তে বহির্ভাগে আগমন করেন: এমন সময় তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে দুগ্ধধারা বহির্গত হয়। অর্হৎ আচার এইরূপে মাতার পরিচয় প্রাপ্ত হন; তাঁহার মাতা সত্য ধর্ম্ম লাভ করেন। অনন্তর অর্হৎ আচার কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আমাদের বর্ণিত সঙ্ঘারামের অন্তর্ভুক্ত বিহার এক শত ফিট উচ্চ। তদভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের সত্তর ফিট উচ্চ প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্ত্তির

অজন্তা গুহা।

(১) এই সঙ্ঘারাম অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া বৌদ্ধযুগের শিল্পোন্নতির পরিচয় দিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা অজন্তা গুহা নামে পরিচিত।

মস্তকোপরি ক্রমান্বয়ে সপ্তসংখ্যক চন্দ্রাতপ রহিয়াছে। এই সকল চন্দ্রাতপ দৃশ্যতঃ নিরবলম্ব এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বিহারের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরপ্রাচীরে বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনার চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রাবলী সাতিশয় সুকৌশলে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ক্ষোদিত হইয়াছে। (১)

ভরু-কচ্ছ।

এই রাজ্য চক্রাকারে ২৪০০ অথবা ২৫০০ লি। ইহার রাজধানী চক্রাকারে বিংশতি লি। ভরু-কচ্ছ দেশের মৃত্তিকা লবণাক্ত এবং তরু লতা গুল্মের সংখ্যা অত্যল্প। ভরু-কচ্ছ-বাসীরা সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করে। কেবল সমুদ্র হইতেই তাহাদের ধনাগম হইয়া থাকে। ভরু-কচ্ছ দেশ গ্রীষ্মপ্রধান; এই স্থানে সর্ব্বদা প্রবল বাতাস বহিতেছে। অধিবাসীরা ক্রূর স্বভাব ও বিপথগামী। তাহারা ভদ্রব্যবহারে অভ্যস্ত নহে। অধ্যয়নে তাহাদের স্পৃহা নাই। এই দেশে অপধর্ম্মের ও সত্যধর্ম্মের সমান প্রচার। ভরু-কচ্ছ দেশে ন্যূনাধিক দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে; শ্রমণের সংখ্যা তিন শত। দেবমন্দিরের সংখ্যা ন্যূনাধিক দশটি।

(১) অজন্তা গুহাগাত্রে উহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যাহা উৎকীর্ণ আছে, আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি।—"সন্ন্যাসী স্থবির অচল তদীয় শিক্ষকের জন্য এই শৈল-গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন: তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন, এবং কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন।' আমাদের চৈনিক পরিব্রাজক এই গুহা-নির্ম্মাণের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অলৌকিক: কিন্তু নির্ম্মাতা কোন কারণে কৃতজ্ঞ হইয়া এবং সেই ঘটনার স্মরণ জন্য অজন্তা গুহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরলিপি হইতেও অনুমিত হইতে পারে।

মালব দেশ।

মালব দেশ চক্রাকারে প্রায় ৬ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ৩০ লি। রাজধানীর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক দিয়া মাহী নদী প্রবাহিতা। (কানিংহাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ধার নগর নামক স্থানে মালব রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল: সেণ্ট মার্টিনেরও এই মত) মালব দেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে। সমগ্র দেশ সতেজ বৃক্ষ লতা গুল্মে পূর্ণ; ফুলফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এক প্রকার পিষ্টকই মালববাসীদের প্রধান আহার্য্য। তাহারা অতিশয় বুদ্ধিমান, ধর্ম্মানুরাগী ও অনুগত স্বভাব। তাহাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও মার্জ্জিত, তাহাদের শিক্ষা সুবিস্তৃত ও সুগভীর।

প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের দুইটি দেশ সুপ্রসিদ্ধ। একটির নাম মগধ, অপরটির নাম মালব। মালবীয়গণ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ও অতিশয় অধ্যয়নশীল। কিন্তু তথাপি তাহাদের দেশে অপধর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মের তুল্য প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মালব দেশে সঙ্ঘারামের সংখ্যা প্রায় এক শত। এই সকল সঙ্ঘারামে ন্যূনাধিক দুই সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছেন। মালবদেশের দেবমন্দিরের সংখ্যা ন্যূনাধিক একশত। এই সকল দেবমন্দিরে নানামতাবলম্বী উপাসকগণ পূজা অর্চ্চনা করিতেছেন; তন্মধ্যে পাশুপতমতাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক।

মালববাসীর জ্ঞানানুরাগ

এই দেশে ষাট বৎসর পূর্ব্বে মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত মহারাজ শীলাদিত্য রাজত্ব করিতেন। সাহিত্য-শাস্ত্রে তাঁহার অপরিসীম অধিকার ছিল। মহারাজ শীলাদিত্য বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে নিরতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি কখনও ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হয় নাই।

মহারাজ শীলাদিত্য

তাঁহার হস্ত কখনও কোন জীবিত প্রাণীর অনিষ্টসাধন করে নাই। কোনও জীবিত প্রাণীর অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কায়, তাঁহার হস্তী ও অশ্বসমূহের পানীয় জল ছাকিয়া দিবার নিয়ম ছিল। শীলাদিত্যের রাজত্বকাল পঞ্চাশৎ বা ততোধিক বর্ষব্যাপী হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে মনুষ্যের সহিত পশুর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। মনুষ্যগণ পশুর হত্যা বা অনিষ্টসাধনে বিরত ছিল। মহারাজ শীলাদিত্য স্বীয় প্রাসাদের পার্শ্বে একটি বিহার নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই বিহারের শোভাবর্দ্ধনের জন্য শিল্পিগণ স্ব স্ব শিল্প-নৈপুণ্যের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজভাণ্ডারের সর্ব্বপ্রকার রত্নালঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই বিহারের অভ্যন্তরে সপ্তবুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজার আমন্ত্রণে প্রতিবৎসর মোক্ষ পরিষদের অধিবেশন হইত; তদুপলক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে আচার্য্যগণ আগমন করিতেন। তিনি সমাগত আচার্য্যগণকে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে চতুর্ব্বস্তু দান করিতেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মানুষ্ঠানকালে ব্যবহারের উপযুক্ত তিন প্রকার পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইত; তৎকালে আচার্য্যগণ আশ্চর্য্য সপ্ত মূল্যবান বস্তু ও মণিমুক্তা লাভ করিতেন। অদ্যাপি সে প্রথা অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে।

মালব রাজ্যের রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম দিকে দুই শত লি দূরে ব্রাহ্মণ জাতির নগর অবস্থিত। পুরাকালে এই স্থানে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে বিশারদ ছিলেন। তিনি তৎকালের সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ছিলেন। সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্র তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তাঁহার আচার ব্যবহার সুনির্ম্মল ছিল। তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। এই অসাধারণ ব্রাহ্মণ রাজা প্রজা সকলেরই তুল্য শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার

পণ্ডিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

আত্মম্ভরিতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি আপনাকে মহেশ্বর দেব, নারায়ণ দেব, বাসুদেব, ও বুদ্ধ লোকনাথ দেব প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ অপেক্ষা গরিষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেন। তিনি ঐ সকল মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তৎসমুদয় স্বীয় আসনের পদ-রূপে ব্যবহৃত করিয়াছিলেন। তৎকালে ভদ্ররুচি নামে এক জন ভিক্ষু বাস করিতেন। সমগ্র হেতুবিদ্যা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার চরিত্রপ্রভা সর্ব্বত্র বিকীর্ণ ছিল। নিরাকাঙ্ক্ষা ও নির্লিপ্ততা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। ভদ্ররুচি প্রাগুক্ত গর্ব্বিত ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হন, এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিবার সঙ্কল্প করেন। অতঃপর তিনি তদ্দেশীয় নরপতির সকাশে উপনীত হন, এবং তাঁহার নিকট স্বীয় সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। তদীয় মলিন বেশ দেখিয়া নরপতির অশ্রদ্ধা জন্মে। তথাপি তিনি তাঁহার মহান্ সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, এবং তদীয় উদ্দিষ্ট বিচারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ স্বীয় আসনে এবং ভদ্ররুচি তৃণাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ সত্য শাস্ত্রের নিন্দা ও অপশাস্ত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভদ্ররুচি অচিরে তাঁহার সমস্ত যুক্তিতর্কের খণ্ডন করিয়া দেন, এবং ব্রাহ্মণ পরাজয়-স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অতঃপর তদ্দেশীয় নরপতি ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বিচারে পরাজিত হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" ব্রাহ্মণ রাজবাক্যে ভীত হইয়া কাতরকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভদ্ররুচি তাঁহার ভয়-ব্যাকুল ভাব দেখিয়া দয়াপরবশ হন, এবং তাঁহার মুক্তির জন্য নরপতিকে অনুরোধ করেন। তদীয় অনুরোধে রাজা ব্রাহ্মণকে মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করাইতে আদেশ দেন। গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ স্বীয় পরাজয়ে মুহ্যমান হইয়া

রক্ত বমন করিতে আরম্ভ করেন। ভদ্ররুচি এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তদীয় বাক্যে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া মহাযান শাস্ত্র এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পবিত্র মহাপুরুষ-গণের নিন্দা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বাক্য পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল।

বল্লভী রাজ্য।

বল্লভী রাজ্য চক্রাকারে ন্যূনাধিক ৬ হাজার লি। রাজধানী প্রায় ৩০ লি। বল্লভী রাজ্য অতিশয় জনপূর্ণ। এই রাজ্যে অন্ততঃ এক শত কোটীপতি ধনী ব ; করিতেছেন। দূরদেশ হইতে দুর্ল্লভ বহুমূল্য দ্রব্য সমুদয় বল্লভী রাজ্যে সঞ্চিত হয়। সঙ্ঘারামের সংখ্যা শতাধিক; শ্রমণের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। বল্লভী রাজ্যের রাজবংশ ক্ষত্রিয়। বর্ত্তমান রাজার নাম ধ্রুবপদ। তিনি মালবরাজ শীলাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং কান্য-কুব্জরাজ শীলাদিত্যের জামাতা। এই রাজার স্বভাবে হঠকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা ও ধীশক্তিও গভীর নহে। সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বৎসরান্তে বৌদ্ধ-সভা আহ্বান করেন। তদুপলক্ষে যে সকল শ্রমণ সমাগত হন, তাঁহাদিগকে তিনি নানাবিধ মহার্ঘ বস্তু প্রদান করেন। তার পর সেই সমুদয় উপঢৌকন সামগ্রী দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া রাখেন। তিনি গুণানুরাগী ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ধ্রুবপদ রাজা।

সৌরাষ্ট্র।

সৌরাষ্ট্র দেশ চক্রাকারে ন্যূনাধিক ৪ হাজার লি। রাজধানী ৩০ লি। এই দেশ বল্লভীরাজ্যের অধীন। ভূমি লবণাক্ত। পুষ্প ও

ফল দুষ্প্রাপ্য। অধিবাসীরা লঘুচরিত্র। তাহারা জ্ঞানানুরাগীও নহে। এই দেশে সত্য ধর্ম্ম ও অপধর্ম্মের তুল্য প্রভাব। সঙ্ঘারামের সংখ্যা ৫০; শ্রমণের সংখ্যা তিন হাজার। দেবমন্দিরের সংখ্যা ন্যূনাধিক এক শত। সৌরাষ্ট্র দেশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া অধিবাসীরা সমুদ্র হইতে জীবিকা অর্জ্জন করে, এবং পণ্য-ক্রয়-বিক্রয়ে নিরত থাকে।

সৌরাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানীর অনতিদূরে উজ্জন্ত (রৈবতক) পর্ব্বত-শিখরে একটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। এই সঙ্ঘারামের কক্ষসমূহ পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। উজ্জন্ত পর্ব্বত বনাবৃত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে নদী প্রবাহিতা। এই স্থানে মহাত্মা ও মহাপুরুষগণ ভ্রমণ ও বিশ্রাম করেন। দৈব-বলসম্পন্ন ঋষিবৃন্দ সম্মিলিত হন, এবং অবস্থান করেন।

গুর্জ্জর দেশ।

এই দেশ চক্রাকারে ন্যূনাধিক ৫ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকরে ৩০ লি। গুর্জ্জরবাসীদের আচার ব্যবহার সৌরাষ্ট্রবাসীদের অনুরূপ। গুর্জ্জর দেশ জনপূর্ণ; অধিবাসিবৃন্দ ধনশালী; সত্যধর্ম্মবিশ্বাসীর সংখ্যা অত্যল্প। দেবালয়ের সংখ্যা বহু। গুর্জ্জরাধিপতি ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত। বর্ত্তমান নরপতি মাত্র বিংশতি বর্ষ বয়স্ক, কিন্তু সাহসিকতা এবং ধীশক্তির জন্য বিখ্যাত। রাজা বৌদ্ধধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী।

উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনী (অবন্তী) রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৬ হাজার লি; রাজধানী (উজ্জয়িনী) চক্রাকারে ৩০ লি। এই দেশে বহু সংখ্যক সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার অধিকাংশই ভগ্ন দশায় পতিত হইয়াছে; কেবল তিনটি কি পাঁচটি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বিদ্যমান

আছে; শ্রমণের সংখ্যা তিন শত। দেব মন্দিরের সংখ্যা বহু। উজ্জয়িনীর অধিপতি ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত। তিনি অশেষ সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ; কিন্তু সত্যশাস্ত্রে তাঁহার আস্থা নাই।

সিন্ধুদেশ।

আর্য্য ও অনার্য্য মিশ্রণ।

অতি প্রাচীন কালেই সিন্ধুদেশে আর্য্যগণের নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সূত্র শাস্ত্র আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ঐদেশবাসীরা তাদৃশ সম্মান ভাজন ছিলেন না। সূত্রকার বৌধ্যায়ন তত্রত্য অধিবাসীদিগকে মিশ্রজাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সিন্ধু-দেশের আদিম বাসীদের সঙ্গে উপবিষ্ট আর্য্যগণের সম্মিলন বা শোণিত সম্বন্ধের ফলে তাঁহাদের আচার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত হীন হইয়া পড়ে। হিউ-এন্থ সঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সিন্ধুবাসীদের যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও হীন আচার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ অভিপ্রায়ে সে বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

সিন্ধুদেশ।

সিন্ধুদেশ চক্রাকারে প্রায় ৭ হাজার লি; রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ৩০ লি। এই দেশের ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সিন্ধুদেশ ষাঁড়, মেষ, উষ্ট্র, অশ্বতর এবং অন্যান্য পশুর প্রতিপালন পক্ষে অনুকূল। লালবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার লবণ এই দেশে পাওয়া যায়। এই সমুদয় লবণ

নানাস্থানে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। সিন্ধুবাসীদের স্বভাব কঠোর এবং ভাব প্রবণ; কিন্তু তাহারা ন্যায় পরায়ণ এবং সচ্চরিত্র। তাহারা বিবাদপ্রিয় এবং বাদানুবাদে নিরত। তাহারা বিদ্যা অর্জ্জন করে, কিন্তু উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই। সিন্ধুবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশ্বাসী। এই দেশে বহুশত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। এই সকল সঙ্ঘারামের শ্রমণের সংখ্যা ন্যূনাধিক দশ সহস্র। অধিকাংশ শ্রমণই অলস এবং দুর্নীতি পরায়ণ। যে সকল শ্রমণ পূর্ব্ববর্ত্তী পরমসৌগতগণের অনুসরণ করিয়া প্রকৃতই ধর্ম্মপথে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত বা বনে বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে তাঁহারা ধর্ম্মফল লাভ করিবার জন্য অহোরাত্র সাধনা করেন। সিন্ধু দেশের দেবমন্দিরের সংখ্যা ত্রিংশতি।

লোক চরিত্র।

সিন্ধুদেশের রাজা শূদ্রবংশ সম্ভূত। তিনি স্বভাবতঃ সচ্চরিত্র এবং সরল প্রকৃতি; বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার শ্রদ্ধা আছে।

সিন্ধু রাজ।

সিন্ধুনদের তীরে সহস্র লি ব্যাপী জলাভূমির পার্শ্বে বহুসংখ্যক লোক বাস করিতেছে। ইহাদের প্রকৃতি দয়া মায়া শূন্য; হঠকারিতা তাহাদের স্বভাবের বিশেষত্ব; রক্তপাতই তাহাদের কার্য্য। গো পালন তাহাদের একমাত্র ব্যবসায়, এই ব্যবসায় দ্বারাই তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। এই জাতি কোন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীন নহে; কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কাহারও অর্থ সংস্থান নাই, তবে কেহ নিতান্ত দরিদ্রও নহে। তাহারা মস্তক মুণ্ডন এবং কষায়বস্ত্র পরিধান করে। তাহাদের বাহ্যিক পরিচ্ছদ দেখিলে তাহাদিগকে ভিক্ষু বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তাহারা কাজ কর্ম্মে আচার ব্যবহারে গৃহস্থ মাত্র।

সিন্ধু দেশের একটি জাতির বিবরণ।

এরূপ কথিত আছে যে, পুরাকালে প্রাগুক্ত জাতীয় লোক সকল নিতান্ত অসহিষ্ণু ছিল এবং কেবল নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অত্যাচার করিত। তৎকালে একজন অর্হৎ দয়া পরবশ হইয়া সন্নীতি প্রচার পূর্ব্বক তাহাদিগকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই স্থানে উপনীত হন। তিনি আগমন পূর্ব্বক অলৌকিক ক্ষমতা ও আশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন করেন। তাদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা ও আশ্চর্য্য শক্তি দর্শনে তাহারা বশীভূত হয়। অতঃপর অর্হৎ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাহাদের নিকট সত্য ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ করেন, এবং ঐ সকল লোক সে ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই সময় হইতে তাহারা ভিক্ষুর পরিচ্ছদ পরিধান এবং সত্যধর্ম্মানুমোদিত পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। তার পর বহুকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এবং কাল ক্রমে পুনর্ব্বার শিথিলতা দেখা দিয়াছে। ঐ সকল লোক পুনর্ব্বার অসৎ পথে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এখনও ধার্ম্মিকের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছে।

ভারতীয় সভ্যতা।

(হিউএন্থ্ সঙ্গ কর্ত্তৃক অঙ্কিত)

ভারতবর্ষের জাতি সকল নানা বর্ণে বিভক্ত। এতন্মধ্যে আভিজাত্য এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতায় ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বর্ণের কীর্ত্তি-কাহিনী চিরকাল দেশ দেশান্তরে বিদিত বলিয়া ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণভূমি নামে কথিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ভূমি

ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ভূখণ্ড সাধারণতঃ পঞ্চভারত নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এই দেশের পরিধি ৯০০০০ লি; ইহার তিন পার্শ্বে সুবিশাল সাগর বিস্তৃত, উত্তর দিকে তুষারমণ্ডিত শৈলমালা দণ্ডায়মান। ভারতবর্ষের উত্তরাংশ সুপ্রশস্ত, দক্ষিণাংশ সঙ্কীর্ণ। সমগ্র ভারতবর্ষ সত্তর বা ততোধিক প্রদেশে বিভক্ত। ঋতু সকল গ্রীষ্মপ্রধান, ভূমি সুজলা এবং আর্দ্র, ভারতবর্ষের উত্তরাংশ শৈলাচ্ছন্ন, ভূমি শুষ্ক এবং লবণাক্ত; পূর্ব্বভাগ উপত্যকা এবং সমতল ভূমি পূর্ণ। এই অংশ নদীমাতৃক ও কর্ষিত বলিয়া উর্ব্বর এবং ফলশস্যপূর্ণ; দক্ষিণাংশ বনরাজি-শোভিত; পশ্চিম প্রদেশ কঙ্করময় এবং অনুর্ব্বর।

চতুঃসীমা, আয়তন ইত্যাদি।

গ্রহসম্পর্কে চন্দ্রের অবস্থিতি অনুসারে দ্বাদশ মাসের নাম কল্পিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সময়ের নাম ক্ষণ। ১২০ ক্ষণে এক তক্ষণ, ৬০ তক্ষণে এক লব, ৩০ লবে এক মুহূর্ত্ত; ৫ মুহূর্ত্তে এক কাল (প্রহর), ৬ কালে এক অহোরাত্র; কিন্তু সাধারণতঃ দিবা রাত্রি আট প্রহরে বিভক্ত। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ, পূর্ণচন্দ্র হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ। চৌদ্দ অথবা পনর দিনে কৃষ্ণপক্ষ হয়, কারণ মাস কখন ছোট কখন বড় হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষ এবং তৎপরবর্ত্তী শুক্লপক্ষ লইয়া এক মাস। ছয় মাসে এক অয়ন। দুই অয়নে এক বৎসর। এক বৎসর ছয় ঋতুতে বিভক্ত। চীনদেশের প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে তৃতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের প্রারম্ভ কাল, তৃতীয় মাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের পূর্ণকাল, পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস বর্ষাকাল, সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শস্যোদ্গম কাল, নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে একাদশ মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শীতের প্রারম্ভ কাল, একাদশ মাসের ষোড়শ

সময় গণনা ঋতু ইত্যাদি।

দিবস হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শীতের পূর্ণকাল। পবিত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে বৎসর তিন ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল; পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষাকাল, নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শীতকাল। মতান্তরে বৎসর ঋতুচতুষ্টয়ে বিভক্ত—বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ এবং শীত। চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাস লইয়া বসন্তকাল; এই সময়ের সঙ্গে প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে চতুর্থ মাসের পঞ্চ-দশ দিবস পর্য্যন্ত সময়ের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালের মাসের নাম আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, এই সময়ের সঙ্গে চতুর্থ মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত সময়ের ঐক্য আছে। শরৎকালীয় তিন মাসের নাম আশ্বয়ুজ, কার্ত্তিক এবং মার্গশীর্ষ; আশ্বয়ুজ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মার্গশীর্ষ মাস পর্য্যন্ত যে সময়, তাহা সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে দশম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত সময়ের সঙ্গে অভিন্ন। পুষ্য, মাঘ, ফাল্গুন, এই তিন মাস শীতকাল এবং দশম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবসে শেষ।

নগর এবং পল্লী

নগর ও পল্লীসমূহের অভ্যন্তর প্রাচীরপরিবেষ্টিত; এই সকল প্রাচীর সমুচ্চ এবং প্রশস্ত। পথ ও উপপথ সকল বক্র। সাধারণ পথ সকল অপরিষ্কার; এই সমস্ত পথের উভয় পার্শ্বে বিপণিমালা সজ্জিত এবং যথাযোগ্যভাবে চিহ্নিত। মাংসবিক্রেতা, ধীবর, নর্ত্তক নর্ত্তকী, জল্লাদ এবং সম্মার্জক প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীর বাসের জন্য নগর সমূহের বহির্ভাগে স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সাধারণ পথে গমনাগমনের সময় ইহাদিগকে বামপার্শ্ব দিয়া চলিতে হয়। এই সমস্ত জাতির বাসভবন অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত;

তাহাদের বাসস্থান উপনগর বা উপপল্লী নামে পরিচিত। মৃত্তিকা নরম এবং কর্দ্দমময় বলিয়া প্রাচীর ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত। প্রাচীরের উপর কাষ্ঠ বা বংশদণ্ড নির্ম্মিত চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবাসীদের বাসভবন বারেন্দা এবং আমোদগৃহ দ্বারা পরিশোভিত। এই সকল বারেন্দা ও আমোদগৃহের প্রাচীর কাষ্ঠনির্ম্মিত, তদুপরি চূণের আস্তরণ; ছাদ ইষ্টকের। ছাদের জন্য তৃণ, শুষ্ক শাখা, ইষ্টক, অথবা কাষ্ঠফলক ব্যবহৃত হয়।

সঙ্ঘারাম।

ভারতবর্ষের সঙ্ঘারামসমূহের নির্ম্মাণ কৌশল অতি সুন্দর। চতুষ্কোণের চারিদিকে এক একটি ত্রিতল মন্দির বিদ্যমান। ইহার কড়িকাষ্ঠ এবং কার্ণিস সবিশেষ কৌশলে বিবিধ আকারে গঠিত হইয়াছে। প্রবেশ দ্বার, বাতায়ন এবং অনুচ্চ প্রাচীরের আদ্যন্ত সুচিত্রিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসগৃহের অভ্যন্তর কারুকার্য্যখচিত, কিন্তু বহির্ভাগ অনলঙ্কৃত। হর্ম্ম্যের মধ্যস্থলে সাধারণ গৃহ, এই গৃহ সমুচ্চ এবং প্রশস্ত, একপার্শ্বে নানা তল বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠসমূহ; সমগ্র সঙ্ঘারাম নানা প্রকার চূড়ায় পরিশোভিত। প্রবেশদ্বার সকল পূর্ব্বমুখ; রাজাসনও পূর্ব্বমুখে স্থাপিত।

আসন।

ভারতবাসীরা বিশ্রাম অথবা শয়নের জন্য মাদুর ব্যবহার করে। রাজপরিবার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজপুরুষবর্গের ব্যবহারের জন্য নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত মাদুর পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার মাদুরের আকার এক। রাজাসন উচ্চ, সুবৃহৎ এবং মহার্ঘ মণিমুক্তায় সজ্জিত। রাজাসনের নাম সিংহাসন। রাজাসন অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রে মণ্ডিত, পাদপীঠ মণিমুক্তায় ভূষিত। অভিজাতগণ স্বস্ব রুচি অনুসারে সুচিত্রিত এবং সুসজ্জিত আসন ব্যবহার করেন।

ভারতীয়গণের ব্যবহৃত পোষাকের কোন প্রকার ছাট কাট নাই।

শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদই তাহাদের সর্ব্বাধিক প্রিয়। রঙ্গিল অথবা কারুকার্য্য-খচিত পরিচ্ছদ তাহাদের মনঃপুত নহে। পুরুষেরা মধ্যদেশে উত্তরীয় জড়াইয়া লইয়া বাহুমূলে বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ঝুলাইয়া রাখে। স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদে পা পর্য্যন্ত আবৃত হয়; তাহাদের স্কন্ধদেশও বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত থাকে। তাহারা মস্তকোপরি কেশের কিয়দংশ দ্বারা কবরী বন্ধন করে; তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট কেশরাশি বিস্তীর্ণ থাকে। অনেক পুরুষ দাড়ি গোঁফ মুণ্ডন করে। তাহারা মস্তকে পুষ্পমালা ও রত্নহারসংযুক্ত উষ্ণীষ ধারণ করে। তাহাদের পরিচ্ছদ কৌষেয় এবং কার্পাস নির্ম্মিত, ক্ষৌমবস্ত্রের পরিচ্ছদও দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট ছাগলোম দ্বারা কম্বল প্রস্তুত হয়; এই কম্বল দ্বারাও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার প্রথা আছে। করাল দ্বারাও পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়, করাল এক প্রকার বন্য জন্তুর সুচিক্কণ লোম; এই লোম দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা, অতি দুরূহ বলিয়া উহা মূল্যবান এবং উৎকৃষ্ট পরিধেয়রূপে পরিগণিত।

বসন ভূষণ।

উত্তর ভারতে বায়ু শীতল বলিয়া তত্রত্য লোকে খাট ও আঁটা পোষাক ব্যবহার করে। অপধর্ম্মাবলম্বিগণের পরিচ্ছদ বহুবিধ এবং মিশ্রিত। অনেকে শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে; অনেকের গলদেশে নরাস্থিমালা শোভা পায়; অনেকে উলঙ্গ ভাবে অবস্থিতি করে; অনেকের পরিধেয় বৃক্ষপত্র অথবা বল্কল; অনেকে মস্তকের কেশ ছিন্ন এবং দাড়ি গোঁফ কর্ত্তন করিয়া ফেলে; আবার অনেকের নিবিড় শ্মশ্রুরাজিও দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ব্যক্তির চুল মাথার উপর গ্রন্থিবদ্ধ থাকে। বস্তুতঃ অপধর্ম্মাবলম্বিগণের পরিচ্ছদ-প্রণালী একরূপ নহে; তাহাদের পরিচ্ছদের রং,—শাদাই হউক, বা লালই হউক, অস্থায়ী।

শ্রমণগণের ব্যবহারের নিমিত্ত তিন প্রকার পরিচ্ছদ প্রচলিত

আছে। এই সকল পরিচ্ছদ এক প্রণালীতে প্রস্তুত নহে; তাঁহাদের পরিচ্ছদ সাম্প্রদায়িক নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কোন পোষাকের পঞ্জাব সরু বা চওড়া; আবার কোন কোন পোষাক অল্প বা বেশী ঝুলিয়া পড়ে। "সাঙ্গ কিওকি" নামক পরিচ্ছদে কেবল বামস্কন্ধ আবৃত হয়, কিন্তু উভয় বাহুমূলই আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। এই পোষাক দক্ষিণ পার্শ্বে আঁটা, কিন্তু বাম পার্শ্বে খোলা। "সাঙ্গ কিওকি" পরিধান করিলে মধ্যদেশের নীচ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। "নিফোসনা" নামক পরিচ্ছদের কটিবন্ধ অথবা ঝুল কিছুই নাই। এই পোষাক পরিধান করিবার সময় উহার নিম্নাংশ থাকে থাকে ভাঁজ করিয়া কোমরে বন্ধন করিয়া রাখা হয়। এক এক সম্প্রদায়ের জন্য এক এক বর্ণের পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট আছে। পীত এবং রক্ত,—এই দুই বর্ণের পরিচ্ছদই ব্যবহৃত হয়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই সাদাসিদে এবং মিতব্যয়সাধ্য। দেশাধিপতি রাজা এবং বিশিষ্ট অমাত্যবৃন্দ স্বতন্ত্র প্রকার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার ব্যবহার করেন। তাঁহারা রত্নখচিত মুকুট ধারণ করেন, তৎসঙ্গে ফুলদল সংযুক্ত হইয়া মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করে। তাঁহারা বলয় এবং হার দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের অনেক ধনবান বণিক কেবল স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায়েই নিরত রহিয়াছেন। তাহাদের অধিকাংশেরই পদ নগ্ন, কদাচিৎ কাহারও পদে পাদুকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের দন্তপংক্তি কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। তাঁহারা মাথার কেশ গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং কর্ণবিদ্ধ করেন। তাঁহাদের চক্ষু আয়ত; নাসিকা অলঙ্কারশোভিত। *

* "তাঁহাদের নাসিকা সুন্দর," এই প্রকার অনুবাদও হইতে পারে।

ভারতীয়গণ শারীরিক পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত; তাহারা এই বিষয়ে কখনও শৈথিল্য প্রকাশ করে না। তাহারা সকলেই আহারের পূর্ব্বে স্নান করিয়া থাকে, তাহারা কখনও ভোজনাবশিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট আহার করে না; তাহাদের একজনের ভোজন পাত্র অন্যে ব্যবহার করে না। কাষ্ঠ বা প্রস্তর পাত্র একবার ব্যবহার অন্তেই নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। তাহারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা লৌহ পাত্র একবার ব্যবহার করিয়াই মার্জ্জিত এবং ধৌত করিয়া থাকে। তাহারা আহার অন্তে খড়িকা দ্বারা দন্ত পরিষ্কার এবং হস্তপদ প্রক্ষালন করে।

পরিচ্ছন্নতা।

ভারতীয়গণ এই প্রক্ষালনের পূর্ব্বে পরস্পরকে স্পর্শ করিতে বিরত থাকে। তাহারা শৌচস্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রতিবারেই শরীর ধৌত এবং হরিদ্রা বা চন্দনের সুগন্ধ গ্রহণ করে।

যে সময় রাজা স্নান করেন, তখন ঢক্কানিনাদ এবং বাদ্যযোগে বন্দনা সঙ্গীত করা হয়। ভারতবাসীরা পূজা অর্চ্চনা এবং প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে স্নান করিয়া পবিত্র হয়।

ভারতবাসীর বর্ণমালা ব্রহ্মদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল; এই বর্ণমালা আদিকাল হইতে অদ্যাবধি পরম্পরাগত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতীয় বর্ণমালার অন্তর্গত অক্ষরের সংখ্যা ৪৭ এবং উদ্দেশ্য, স্থান ও সময়ের অবস্থা অনুসারে শব্দ রচনার উপযোগী ভাবে সংযুক্ত। এতদ্ব্যতীত ধাতু প্রত্যয়াদি অন্যপ্রকার রূপও আছে। ভারতীয় বর্ণমালা বহুদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই কারণ শব্দের উচ্চারণকালে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মূলগত কোন প্রভেদ নাই। মধ্য-ভারতে ভাষার আদি রূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই স্থানের উচ্চারণ কোমল, শ্রুতিসুখকর এবং দেব-

লেখা, ভাষা, পুস্তক, বেদ, অধ্যয়ন

ভাষার অনুরূপ। শব্দের উচ্চারণ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের আদর্শযোগ্য। ভারতবর্ষের সীমান্তবাসীদের উচ্চারণপ্রণালী ভ্রমপূর্ণ ; কারণ জনমণ্ডলীর অসচ্চরিত্রতা বশতঃ ভাষার প্রকৃতিও দূষিত হইয়া উঠে।

সাময়িক ঘটনা সমূহের বিবরণ স্থায়িভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণীর নাম নীল পিত। এতৎ সমুদয়ে ভাল মন্দ শুভ অশুভ সর্ব্ববিধ ঘটনাই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে।

বালকবৃন্দকে শিক্ষা এবং উৎসাহ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট সিদ্ধবস্তু নামক গ্রন্থের অধ্যাপনা হয়। বালকগণ সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে পঞ্চবিদ্যা বিষয়ক মহাশাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম, শব্দবিদ্যা, এই শাস্ত্রে শব্দের অন্বয় এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। দ্বিতীয়, শিল্পস্থান বিদ্যা, এই শাস্ত্রে শিল্প এবং শিল্পকরবিষয়ক তত্ত্ব সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ; তদ্ব্যতীত পঞ্জিকা সম্বন্ধেও অনেক তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ; তৃতীয়, চিকিৎসা বিদ্যা, এই শাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ নাশক দ্রব্যের ফলাফল, সূক্ষ্ম সূচীবেধন দ্বারা রক্ত মোক্ষণ এবং চিকিৎসাবিষয়ক অন্যান্য তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। চতুর্থ, হেতুবিদ্যা, এই শাস্ত্রগত তত্ত্ব সকলের প্রকৃতি অনুসারে ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সত্যমিথ্যার নির্ণয় এবং ন্যায় অন্যায়ের পরিভাষার অবধারণ জন্যই হেতুবিদ্যার সৃষ্টি। পঞ্চম বিদ্যার নাম অধ্যাত্ম বিদ্যা। এই শাস্ত্রে পঞ্চ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নানা তত্ত্ব সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। প্রথম বেদের নাম আয়ুর্ব্বেদ ; এই বেদে জীবন এবং প্রাকৃতিক ভাব সংরক্ষণ সম্পর্কীয় বিধান সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। দ্বিতীয় বেদের নাম যজুর্ব্বেদ, এই বেদে দেবস্তুতি

এবং পশুবলি বিষয়ক নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তৃতীয় বেদের নাম সাম বেদ, এই বেদে শিষ্ট ব্যবহার, রণনীতি, সৈনিক বিধান এবং স্ফুর্ত্তিখেলা সম্পর্কীয় আলোচনা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। চতুর্থ বেদের নাম অথর্ব্ববেদ, এই বেদে বিজ্ঞানের নানা শাখা ও ঔষধ প্রকরণ আলোচিত হইয়াছে।

এই চতুর্ব্বেদে যে সকল গভীর এবং গুপ্ত তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট* আছে, অধ্যাপকগণ তৎসমুদয় উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ তাহারা ঐ সকল তত্ত্বের ভাবটি ব্যাখ্যা করেন, তার পর দুরূহ শব্দ সমূহের অর্থ পরিষ্কার করিয়া দেন। তাঁহারা ছাত্র-বৃন্দকে প্রোৎসাহিত এবং সুকৌশলে পরিচালিত করেন। অধ্যাপকগণ ছাত্রবৃন্দের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলেন, হতাশ শিষ্যকে উপদেশ দান করিয়া প্রবুদ্ধ করেন। যদি কোন ছাত্র স্বজ্ঞানার্জ্জনে তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক বিদ্যালয় হইতে প্রস্থান করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে উৎসুক হয়, তবে তাঁহারা সে প্রবৃত্তি দমন করেন। ছাত্রবৃন্দের শিক্ষা সমাপ্ত এবং বয়স ত্রিশ বৎসর হইলে তাহাদের চরিত্র গঠিত এবং জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর তাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হয় এবং কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে গুরুদেবকে ধন্যবাদ প্রদান করে। অনেক পণ্ডিত পুরাতত্ত্বে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আজীবন সৎবিদ্যার অধ্যয়নে যাপন করেন। তাঁহারা সংসার হইতে দূরে বাস করেন এবং জীবনের সাদাসিদে ভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। পার্থিব বিষয় তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ; নিন্দা বা প্রশংসায় তাঁহাদের চিত্তের কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হয় না। তাঁহাদের সুযশ চারিদিকে বিস্তীর্ণ বলিয়া রাজন্যবৃন্দ তাঁহাদের সাতিশয় গুণগ্রাহী; কিন্তু তাঁহারা কখনও রাজ-সভায় প্রবেশ করেন না। দেশাধিপতি তাঁহাদের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন, জনমণ্ডলী তাঁহাদের যশো-

রাশি বার্দ্ধিত করিয়া তুলে এবং অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহাদের নিকট অবনত হয়। এই কারণেই ভারতীয়গণ অক্লান্তচিত্তে দৃঢ়তা ও উৎসাহ সহকারে আজীবন বিদ্যালোচনায় যাপন করিতে পারেন। তাঁহারা কেবল আত্মবলে নির্ভর করিয়া জ্ঞানান্বেষণে নিরত থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহারা বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াও জীবিকার জন্য নানাস্থানে গমন করেন। ভারতবর্ষে এরূপ এক শ্রেণীর লোকও দেখা যায়, যাহারা বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও কেবল সুখলালসায় স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া নির্লজ্জভাবে কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা প্রদর্শন এবং সঞ্চিত ধনরাশি অপচয় করে। বহুমূল্য ভোজ্য এবং পরিচ্ছদে তাহাদের সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। নৈতিক বল এবং অধ্যয়নস্পৃহার অভাবে তাহারা কলঙ্কগ্রস্ত হয়, এবং তাহাদের দুর্নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের সকলেই স্বশ্রেণীর মতানুযায়ী তথাগতের ধর্ম্মমত পরিজ্ঞাত; কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পর সুদীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত বর্ত্তমান সময়ে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তত্ত্বান্বেষিগণের জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যানুসারে উহার সত্য বা মিথ্যা স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতপার্থক্য প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের তর্কবিতর্ক বিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় উত্থিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র আচার্য্য নিযুক্ত রহিয়াছেন; বৌদ্ধসম্প্রদায় সকলের মতামত বিভিন্নমুখী হইলেও তাহাদের লক্ষ্যমূল এক। বৌদ্ধগণ অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত; সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রাধান্য প্রকাশ করিতে তৎপর। মহাযান এবং হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ পৃথকভাবে বাস করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। অনেক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নীরব ধ্যানেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন

বৌদ্ধমত বৌদ্ধশাস্ত্র ইত্যাদি

এবং কি ভ্রমণে, কি উপবেশনে সর্ব্বদাই তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ জন্য মহা সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন ; অন্য দিকে আর একদল বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী স্ব স্ব মত পরিপোষণার্থ বাগ্‌বিতণ্ডায় চারিদিক শব্দায়মান রাখিয়াছেন। বৌদ্ধগণ আপন আপন সাম্প্রদায়িক নিয়মানুসারে পরিচালিত হন।

বিনয় পিটক (সঙ্ঘ নিয়মাবলী) সুত্ত পিটক (বুদ্ধের উপদেশ) এবং অভিধর্ম্ম পিটক (দর্শন) শাস্ত্রগ্রন্থরূপে সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই সমভাবে স্বীকৃত। যিনি এই সকল গ্রন্থের এক অংশের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনি কর্ম্মদানের শাসন হইতে মুক্তি লাভ করেন। যদি তিনি দুই অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে তাঁহার উচ্চ কক্ষের অধিকার লাভ হয়। যদি তিনি তিন অংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে তাঁহার সেবা ও আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য একাধিক ভৃত্য নিযুক্ত থাকে। যদি তিনি চারি অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য উপাসকদিগকে নিয়োজিত রাখা হয়। যদি তিনি পাঁচ অংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে হস্তিযান প্রদত্ত হয়। যদি তিনি ছয় অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে তাঁহার কোন স্থানে যাত্রা কালে শরীররক্ষীরা গমন করে। কোন বৌদ্ধ খ্যাতির উচ্চ সীমায় উপনীত হইলে তিনি আপন ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনার জন্য সময় সময় বৌদ্ধ সঙ্ঘ আহ্বান করেন। এই সকল সভায় যাঁহারা উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাদের গুণাগুণের বিচার করেন, তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা বা অসারতা প্রদর্শন করিয়া দেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রশংসায় ও ভ্রান্ত ব্যক্তির দোষ উদ্‌ঘাটনে নিরত হন। যদি কেহ সুমার্জ্জিত ভাষা, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাদৃশ সভায় খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হন, তবে বহু সংখ্যক সহচর তাঁহাকে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সমারোহ

পূর্ব্বক সঙ্ঘারামের দ্বারদেশে আনয়ন করে। পক্ষান্তরে যদি কেহ তর্ক কালে সুযুক্তি প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হন, অথবা অসাধু ভাষার প্রয়োগ করেন, কিম্বা যদি তিনি কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তদনুসারে বাক্য প্রয়োগ করেন, তবে সকলে মিলিত হইয়া লাল ও কাল রঙে তাহার মুখ রঞ্জন এবং গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে কোন নির্জ্জন স্থান অথবা পরিখায় রাখিয়া আইসে। তাঁহারা এই ভাবে গুণী ব্যক্তিকে পুরস্কৃত এবং গুণহীন ব্যক্তিকে অপদস্থ করিয়া থাকে। ভোগ বিলাস সাংসারিক জীবনের লক্ষণ; জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ। যদি কেহ ধর্ম্মচর্য্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষয়িক কার্য্য আরম্ভ করে, তবে সে ব্যক্তি সমাজে নিন্দাভাজন হয়। যদি কেহ সংযম ব্যবস্থার অন্যথা করে, তবে তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে তিরস্কার করা হয়। অপরাধ সামান্য হইলে তাহাকে তিরস্কার অথবা কিয়দ্দিবসের জন্য নির্ব্বাসিত করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু অপরাধ গুরুতর হইলে তাহাকে চিরকালের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। তখন ঐ ব্যক্তি আশ্রয়ের অন্বেষণে স্থানে স্থানে গমন করে এবং কোন স্থানে আশ্রয় লাভে অসমর্থ হইলে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন কখন ঐরূপ ব্যক্তি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে।

হিন্দুজাতি চরিবর্ণে বিভক্ত। প্রথম ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধচরিত্র, ধর্ম্মই তাঁহাদের রক্ষক, তাঁহারা সদাচার-সম্পন্ন এবং সুনীতি পরায়ণ। দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়গণ রাজজাতীয়। বহুকাল হইতে তাঁহারা দেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ এবং দয়াশীল। তৃতীয় বৈশ্য; বৈশ্যগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী; ইহাঁরা দেশেবিদেশে বাণিজ্যে নিযুক্ত আছেন। চতুর্থ, শূদ্র; শূদ্রগণ কৃষি-ব্যবসায়ী। এই চতুর্ব্বর্ণে জাতীয় বিশুদ্ধতা বা

জাতি, বিবাহ

অবিশুদ্ধতা অনুসারেই পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বিবাহ কালে নূতন কুটুম্বের পদমর্য্যাদা অনুসারে তাহাদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিবাহের প্রথা নাই। স্ত্রীলোকের একবার বিবাহ হইলে তাহার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল জাতীয়েরা স্ব স্ব ব্যবসানুসারে অসবর্ণ বিবাহ করিয়া থাকে।

রাজ পরিবার, সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র।

ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত। ক্ষত্রিয়গণ সময় সময় রক্তপাত এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। জনমণ্ডলী মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, কেবল তাহারাই বিশিষ্ট সৈনিকের পদে নিয়োজিত হয়। পুত্র পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করে বলিয়া তাহারা অবিলম্বে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠে। এই সকল সৈন্য রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ শিবিরে বাস করে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী হয়। ভারতীয় সৈন্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ এবং হস্তী। হস্তী সকল সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত; তাহাদের দন্ত সুতীক্ষ্ণ লৌহে দৃঢ়ীকৃত। সারথি আদেশ প্রদান করেন, তাঁহার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বস্থিত পরিচারকগণ রথ পরিচালনা করে। রথ পরিচালনের জন্য অশ্বচতুষ্টয় নিযুক্ত হয়। সেনাপতি উপবিষ্ট থাকেন, রক্ষী সৈন্য তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রথচক্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া গমন করে। অশ্বারোহী সৈন্য শত্রুর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যূহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় এবং পরাজিত হইলে আদেশ লইয়া ইতস্ততঃ গমন করে। পদাতিক সৈন্য দ্রুত গতিতে যুদ্ধের সাহায্য করে। শারীরিক বল ও সাহসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সৈন্য নির্ব্বাচিত হয়। দীর্ঘ বর্ষা এবং প্রশস্ত ঢাল তাহাদের যুদ্ধের উপকরণ; কখন কখন তাহারা তরবারিহস্তেও যুদ্ধ করে এবং ক্ষিপ্রবেগে সম্মুখে উপস্থিত

হয়। তাহাদের সমস্ত অস্ত্রই তীক্ষ্ণধার এবং সূক্ষ্মাগ্র। বর্ষা, ঢাল, ধনু, বাণ, তরবারি, খড়্গ, কুঠার, খঞ্জর, ফিঙ্গাযন্ত্র এই সকল ভারতবাসীর যুদ্ধাস্ত্রের নাম। তাহারা প্রাচীনকাল হইতে এই সকল অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

আচার ব্যবহার। বিচার প্রণালী ইত্যাদি

সাধারণ ভারতবাসী স্বভাবতঃ লঘুচিত্ত; কিন্তু সকলেই ন্যায়পরায়ণ এবং অপকার্য্যবিমুখ। অর্থ বিষয়ে ভারতবাসী ধূর্ত্ত নহেন। বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা ধীরচিত্তে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখেন। তাঁহারা পার্থিব বিষয়ে অনেক সময় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। পরকালের শাস্তির ভয়ে বিচলিত হয়। তাঁহাদের ব্যবহার প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা শূন্য; তাঁহারা প্রতিশ্রুতিপালনে যত্নশীল। ভারতবর্ষের রাজ্যশাসনসম্পর্কীয় ব্যবস্থাসমূহ সরল ও ঋজু। ভারতবাসীর আচার ব্যবহার নম্র ও মধুর। রাজদ্রোহী এবং দুরাচার ব্যক্তির সংখ্যা অল্প; কেবল সময় সময় তাহাদের উৎপাত দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ রাজব্যবস্থা লঙ্ঘন অথবা রাজশক্তির অবমাননা করে, তবে সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দোষী ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ভারতবর্ষে সশ্রম দণ্ডবিধানের নিয়ম নাই। শীলতা বা ন্যায়ের বিধান লঙ্ঘন, দাম্পত্য সম্বন্ধ ভগ্ন এবং পিতৃমাতৃসেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে অপরাধীর নাসাকর্ণচ্ছেদন অথবা হস্ত পদ কর্ত্তন করিয়া দিবার নিয়ম আছে; কোন কোন স্থানে অপরাধীকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত অথবা নির্জ্জন বনে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। কোন প্রকার দুষ্কার্য্যের অনুসন্ধানকালে সাক্ষীকে বেত্র বা লগুড় দ্বারা পীড়িত করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ নিষিদ্ধ। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিলে যদি সে সরলভাবে উত্তর প্রদান করে, তবে শাস্তির

পরিমাণ সেই অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ দোষ অস্বীকার করে, অথবা দোষ সত্ত্বেও আপনার নির্দ্দোষিতা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে দণ্ড বিধান করিবার সময় আমূল সত্য উদ্ধারকল্পে চারিপ্রকার পরীক্ষা করিবার নিয়ম আছে। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থলেতে ভরিয়া প্রস্তরপাত্রসহ গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জলে নিমগ্ন হয় এবং প্রস্তর পাত্র ভাসিয়া উঠে, তবে ঐ ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়। (২) কর্ত্তৃপক্ষ লৌহপাত্র উত্তপ্ত করিয়া তদুপরি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপবিষ্ট করেন, তারপর তাহাকে পুনর্ব্বার ঐ গরম লৌহপাত্রে হস্তপদ স্থাপন করিতে হয়, তদ্ব্যতীত জিহ্বা দ্বারাও উহা স্পর্শ করিবার নিয়ম আছে; যদি তাহার অঙ্গে ফোস্কা পড়ে, তবে সে অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ভীরু এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির জন্য ঈদৃশ পরীক্ষার পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি পুষ্প কলিকা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যদি এই পুষ্পকলিকা দগ্ধ হইয়া যায়, তবে নিক্ষেপকারী অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়। (৩) তৃতীয় পরীক্ষায় তৌলের একদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং অন্যদিকে তাহার সমপরিমাণ পাথর দিবার নিয়ম আছে। যদি তৌলক্রিয়াকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঊর্দ্ধাভিমুখে উঠিয়া পড়ে, তবে তাহাকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয় (৪) একটি মেষের দক্ষিণ উরুতে ঘা করিয়া তন্মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির আহার্য্য দ্রব্যের কিয়দংশ নানারূপ বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। এই বিষ প্রয়োগে মেষটির মৃত্যু হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয়। এই চারি উপায়ে দুষ্কার্য্যের পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে।

(১) মিষ্টসম্ভাষণ করিয়া (২) মস্তক অবনত করিয়া (৩) হস্ত উত্তোলন এবং মস্তক অবনত করিয়া (৪) হাত যোড় এবং মস্তক অবনত.

করিয়া (৫) হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া (৬) ভূমিতে প্রণত হইয়া (৭) হাঁটু এবং হাতের উপর প্রণত হইয়া (৮) পঞ্চ চক্রে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া (৯) পঞ্চ অঙ্গে প্রণত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিবার নিয়ম আছে। এতন্মধ্যে প্রথমতঃ ভূমিতে প্রণত হইয়া তার পর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সম্বোধিত ব্যক্তির গুণগ্রাম কীর্ত্তন করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানজনক। দূর হইতে কেবল অবনত হওয়াই নিয়ম, আর নিকটবর্ত্তী হইলে পদচুম্বন এবং পদের পশ্চাদ্ভাগ মার্জ্জন করিতে হয়। কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির আদেশ গ্রহণ করিবার সময় পোষাকের ধার উত্তোলন করিয়া ভূমিতে প্রণত হইতে হয়। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিও স্নেহ প্রদর্শন জন্য তাহার মস্তক স্পর্শ অথবা পৃষ্ঠে হস্ত অর্পণ করিয়া মিষ্ট বাক্যে সদুপদেশ প্রদান করেন।

শিষ্টাচার

শ্রমণ অথবা ধর্ম্মচর্য্যার্থ উৎসৃষ্টপ্রাণ অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রাগুক্তরূপ সম্মান সহকারে অভিবাদন করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে কেবল শুভ কামনা করিয়া থাকেন।

যদি কেহ পীড়াগ্রস্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি এক সপ্তাহকাল উপবাস করে। এই সময় মধ্যে অনেকে আরোগ্যলাভ করে। এক সপ্তাহে রোগের উপশম না হইলে ঔষধ সেবন করা হয়। এই সকল ঔষধের নাম ও গুণ বিভিন্ন। চিকিৎসকগণ রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী।

ঔষধ, মৃত দেহের সৎকার

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যেসকল আত্মীয় স্বজন তাহার দেহ সৎকার করে, তাহারা একত্র মিলিত হইয়া শোকসূচক চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে। তাহারা শোকাবেগে পরিচ্ছদ ছিন্ন এবং মস্তকের কেশবন্ধন উন্মুক্ত করিয়া ফেলে, তারপর মস্তকে ও বক্ষে করাঘাত করিয়া থাকে। কত দিন, অশৌচ ভোগ করিতে হইবে, অথবা অশৌচকালে

কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ নাই। তিন প্রণালীতে মৃতদেহ সৎকার করিবার নিয়ম আছে। (১) অগ্নি দ্বারা মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হয়। (২) মৃতদেহ গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। (২) মৃতদেহ পশু পক্ষীর গ্রাসের জন্য নির্জ্জন বনে রক্ষিত হয়।

রাজার মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিবার নিয়ম আছে। এই নবাভিষিক্ত রাজা মৃতদেহের সৎকার কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার গুণানুসারে তাঁহাকে উপাধি দ্বারা ভূষিত করে, মৃত্যুর পর আর কোন উপাধি প্রদান করিবার প্রথা নাই।

যে গৃহে মৃত্যু সংঘটিত হয়, মৃতদেহের সৎকার কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে সে গৃহে আহার করিবার নিয়ম নাই। সৎকার কার্য্য শেষ হইলে পূর্ব্ববৎ সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মার তর্পণ জন্য বার্ষিক শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম নাই। যে সকল ব্যক্তি মৃতদেহ সৎকারে নিরত হয়, তাহারা আপনাদিগকে অপবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে এবং সৎকার কার্য্য শেষ হইলে নগরের বহির্ভাগে স্নান পুরঃসর পবিত্র হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। যে সকল বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়া আইসে এবং যে সকল কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে ভয় হয় ও জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ জন্মে, অথবা যে সকল ব্যক্তির সংসারের তুচ্ছ বিষয় এবং জীবনের ভোগাদি হইতে মুক্তিলাভ জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহারা গঙ্গাজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সংকল্প করে। তৎকালে তাহাদের আত্মীয় স্বজন তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আহার করাইয়া বিদায় দেয়। অতঃপর ঐ সকল ব্যক্তি নৌকায় আরোহণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন

পূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয়। তাহাদের নৌকারোহণকালে চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে, এই ভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে দেবলোকে জন্ম হয়।

পুরোহিতগণের পক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ অথবা ক্রন্দন করিবার প্রথা নাই। কোন পুরোহিতের পিতা মাতার মৃত্যু হইলে ঐ পুরোহিত তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য মন্ত্র পাঠ করেন, তার পর অতীত কালের বিষয় স্মরণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক সৎকারাদি কার্য্যে নিরত হন। এই ভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা বৃদ্ধিলাভ করে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

ভারতবর্ষের রাজনীতি প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলজনক বলিয়া শাসনকার্য্য সহজ। অধিবাসীদের নাম ধাম প্রভৃতি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার নিয়ম নাই। রাজা প্রজাবর্গকে বলপূর্ব্বক শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বিরত রহিয়াছেন।

শাসন কার্য্য

রাজন্যবর্গের নিজস্ব ভূম্যধিকার প্রধান চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের লভ্য দ্বারা রাজকীয় কার্য্য এবং পূজা অর্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়; দ্বিতীয় অংশের লভ্য মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর অর্থানুকূল্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে; তৃতীয় অংশের লভ্যের দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ গুণবান ব্যক্তিগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়; চতুর্থ অংশের লভ্য ধর্ম্মসভা ও ধর্ম্মক্ষেত্র প্রভৃতিতে দান করিয়া সুবৃত্তি সকলের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে। এই হেতু প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক দেয় রাজকরের পরিমাণ অল্প; এতদ্ব্যতীত যে সময়ের জন্য তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে হয়, তাহার পরিমাণও অপরিমিত নহে। প্রত্যেকেই শান্তিতে স্ব স্ব ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। সকলেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ভূমিকর্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা রাজকীয় ভূমিতে শস্য উৎপাদন করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজকর স্বরূপ দিতে

হয়। যে সকল বণিক বাণিজ্য ব্যবসায় নিরত রহিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন জন্য স্ব স্ব ইচ্ছামত গমনাগমন করেন; যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান করিলেই জল ও স্থল পথ সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য আবশ্যক হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ কাজ করিয়া দিতে বাধ্য হয়; কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবার নিয়ম আছে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ কাজ করে, তাহাকে ঠিক সেই পরিমাণে অর্থ প্রদত্ত হয়।

সৈনিকগণ সীমান্ত স্থানসমূহ রক্ষা করে, অথবা আবশ্যকমত অবাধ্যদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বহির্গত হয়। সৈনিকগণ রাত্রিকালে অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজ প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পাহারা দেয়। প্রয়োজনমত সৈন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে; এই সৈন্য সংগ্রহের কার্য্য সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে নিষ্পন্ন হয়; তৎকালে রাজপুরুষগণ নবনিযুক্ত সৈন্যদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন। শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রী, নগরপাল এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ ভূমিলাভ করেন।

ভারতবর্ষের জল বায়ু এবং ভূমির প্রকৃতি এক এক প্রদেশে এক এক প্রকার বলিয়া নানাবিধ শস্য ও ফলমূল জন্মে। বহু শ্রেণীর পুষ্প, লতা, ফল এবং বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পুষ্প, লতা, ফল এবং বৃক্ষের স্বতন্ত্র নাম আছে। কৃষকেরা উপযুক্ত ঋতুতে কর্ষণ, বপন, কর্ত্তন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং কার্য্য শেষ হইলে বিশ্রামে প্রবৃত্ত হয়। শস্য মধ্যে ধান ও ভুট্টা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আদা, সরিষা, খরমুজা, লাউ দেখিতে পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ও রসুন অতি অল্প পরিমাণে জন্মে। অতি অল্প লোকই পেঁয়াজ ও রসুন ভক্ষণ করে। যাহারা পেঁয়াজ ও রসুন ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে নগর

বৃক্ষাদি, কৃষি, খাদ্য, পানীয়, পাক প্রণালী

প্রাচীরের বহির্ভাগে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, শর্করা, ইক্ষু, সর্ষপ তৈল এবং পিষ্টক ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য সামগ্রী। তাহারা তাজা মাছ এবং মেষ ও হরিণের তাজা মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কখন কখন তাহাদিগকে নোনা মৎস্য মাংসও ভক্ষণ করিতে দেখা যায়। ষাঁড়, গর্দ্দভ, হস্তী, অশ্ব, শূকর, কুকুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, সিংহ, বানর এবং অন্যান্য লোমশ পশুর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যাহারা এই সকল মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা লোকের নিকট হেয় ও ঘৃণ্য; সকলেই তাহাদের নিন্দা করে। তাহারা নগরের প্রাচীরের বহির্ভাগে বাস করে, কদাচিৎ কখনও তাহাদিগকে জনসাধারণের সহিত মিলিত হইতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষে নানাপ্রকার সুরা প্রস্তুত হয়। ক্ষত্রিয়গণ ইক্ষু এবং আঙুরের রসজাত সুরা পান করে। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ ইক্ষু অথবা আঙুরের রসজাত এক প্রকার সরবত পান করে, এই সরবত তীক্ষ্ণবীর্য্য নহে।

বর্ণসঙ্কর ও নীচজাতির পানাহার অন্যান্য জাতির তুলনায় বিভিন্ন নহে। কেবল তাহারা যে সকল পাত্র ব্যবহার করে, তাহাই অন্যরূপ। নানাপ্রকার সুবিধাজনক গৃহসামগ্রীর অভাব নাই। ভারতবাসী কড়াই ও পাতিল প্রস্তুত করিতে জানে, কিন্তু অন্নসিদ্ধ করিবার জন্য ডেকের প্রচলন নাই। ভারতবাসীর ব্যবহার্য্য অনেক পাত্র মৃণ্ময়। তাহারা কদাচিৎ তাম্রপাত্র ব্যবহার করে। তাহারা ভোজনকালে একপাত্রে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মাখিয়া লইয়া আহার করে; কাটা চামচের প্রচলন নাই, হস্তাঙ্গুলিই তৎসমুদয়ের কাজ করে। যদি কেহ পীড়াগ্রস্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি তাম্রনির্ম্মিত ভোজনপাত্র ব্যবহার করে।

ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য, শ্বেত অশ্ব এবং রক্তবর্ণ মুক্তা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ হইতে নানাপ্রকার রত্ন ও মণি সংগৃহীত হয়।

আই-তসিঙ্গ।

চীনদেশ হইতে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তীর্থ পর্য্যটন মানসে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই সকল তীর্থযাত্রীর মধ্যে ফাহিয়ান এবং হিউএনথ্‌সঙ্গের নাম সুপরিচিত। ইঁহাদের পরেই আই-তসিঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

আই-তসিঙ্গের জন্মকাল ৬৩৫ খৃষ্টাব্দ। তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং কৈশোরোচিত উৎসাহ সহকারে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত হন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র বিনয় শাস্ত্র আয়ত্ত করেন; যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার যশোরাশি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই সময় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া বোধিদ্রুম এবং গৃধ্রকূট পর্ব্বত দর্শন জন্য প্রবল কামনা তদীয় হৃদয়ে উত্থিত হইয়াছিল। তিনি এতদর্থ যাত্রার জন্য উদ্যোগী হন এবং সমস্ত উদ্যোগ শেষ করিয়া স্বীয় পরলোকগত আচার্য্যের সমাধি ভবনে গমন পূর্ব্বক সেখানে উপাসনা করেন।

আই-তসিঙ্গের ভারতযাত্রা

অতঃপর আই-তসিঙ্গ পারস্যদেশগামী চৈনিক অর্ণবপোতে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক অর্ণবপোত মালয় দ্বীপ এবং ভারতবর্ষের পথ দিয়া পারস্য দেশে গমনাগমন করিত) আরোহণ করিয়া ভারতযাত্রায় বহির্গত হইলেন (৬৭১ খৃঃ)। তিনি পথিমধ্যে অনেক সময় মৃগদাব এবং কুক্কুটপাদগিরির চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। বস্তুতঃ ভারতীয় বৌদ্ধতীর্থ নিচয়ের দর্শন জন্য প্রবল কামনা তাঁহার সুদীর্ঘ পথক্লেশ অনেক পরিমাণে লঘু করিয়াছিল।

আই-তসিঙ্গ স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ মালয় দ্বীপে উপনীত হন এবং সে স্থানে বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত করিয়া ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তিতে আগমন করেন। এই নগরীতে তিনি সংস্কৃত ভাষা এবং শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। আই-তসিঙ্গ তাম্রলিপ্তিতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া একদল বণিকের সঙ্গে উত্তর ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। মহাবোধি বিহার প্রাপ্ত হইবার দশ দিন পূর্ব্বে তাঁহারা একটি পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হন। এই পর্ব্বত অতিক্রম করা দুরূহ এবং বিপদ সঙ্কুল ছিল। তজ্জন্য পথিকগণ ঐ পথে দলবদ্ধভাবে গমনাগমন করিত। আই-তসিঙ্গ তথায় উপনীত হইয়া দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহার দেহ নিস্তেজ ও বলশূন্য হয়। তিনি তাদৃশ দুরবস্থাতে ও প্রাগুক্ত বণিকদলের সঙ্গে গমন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন অতি সামান্য পথ অতিবাহিত করিতেও শতবার বিশ্রাম করিতে হইত। অবশেষে বণিকগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া একাকী গমন করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে একদল পার্ব্বত্য দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং তাঁহার বস্ত্রাদি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। আই-তসিঙ্গ জীবনের আশা ত্যাগ করেন; তাঁহার জীবনের কামনা পরিতৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু-বিভীষিকা উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু দৈবানুগ্রহে তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল; দস্যুদল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমে লিপ্ত করিয়া গভীর রজনীতে পূর্ব্বগামী বণিকদলের সহিত মিলিত হন।

তাম্রলিপ্তিতে আই-তসিঙ্গ

দস্যুহস্তে আই-তসিঙ্গ

পর দিন প্রাতঃকালে আই-তসিঙ্গ বণিকদলের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করেন এবং কিয়দ্দিবস মধ্যে নালন্দা বিহারে উপনীত

হন। তথায় কিয়দ্দিবস বিশ্রামান্তে তিনি বৌদ্ধতীর্থ নিচয় দর্শনার্থ গমন করেন এবং ভক্ত সাধকের প্রাণ লইয়া গৃধ্রকূট, মহাবোধি বিহার, বৈশালী, কুশীনগর এবং মৃগদাব পরিদর্শন করিয়া নালন্দায় প্রত্যাবৃত্ত হন। এই স্থানে শাস্ত্রানুশীলনে দশ বৎসর যাপিত হইয়াছিল। তারপর তিনি ন্যূনাধিক চারি শত শাস্ত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাম্রলিপ্তিতে ফিরিয়া আইসেন * এবং তথা হইতে অর্ণবপোতারোহণে স্বদেশে গমন করেন।

তীর্থ পর্য্যটন, স্বদেশ যাত্রা।

* তাম্রলিপ্তি সম্বন্ধে আই-তসিঙ্গ লিখিয়াছেন,-- "তাম্রলিপ্তি ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমা হইতে ৪০ যোজন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই নগরীতে ৫।৬টি বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে। তাম্রলিপ্তির জনপুঞ্জ ধনশালী। আমরা এই স্থান হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করি। তাম্রলিপ্তি হইতে যাত্রা করিয়া দুই মাস কাল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে পোত পরিচালন পূর্ব্বক ক—চ নামক স্থানে উপনীত হই। বৎসরের প্রথম বা দ্বিতীয় মাসে সেখানে মালয় দ্বীপ হইতে অর্ণবপোত পৌঁছিবার সময়। কিন্তু সিংহলগামী পোত সকল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পরিচালন করা আবশ্যক। আমরা শীতকাল ক—চ নামক স্থানে অতিবাহিত করিয়া দক্ষিণা-ভিমুখে যাত্রা করি এবং এক মাস পরে মালয় দ্বীপে উপনীত হই। তথায় গ্রীষ্ম-কালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যাপন করিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা পূর্ব্বক একমাসে কওয়াঙ্গ-টঙ্গ (বর্ত্তমান ক্যাণ্টন) নামক বন্দরে পৌঁছি।" আমরা তৎকালের অর্ণব পথ পরিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আর এক জন চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ সম্বন্ধে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "উহিঙ্গ এক মাস কাল অর্ণব পোতে যাপন করিয়া শ্রীভোগে (মালয়) আগমন করেন। এই স্থানের রাজা তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। তিনি তথা হইতে রাজপোতে আরোহণ করিয়া পনর দিনে মালযে (মালয় দ্বীপের অধিপতির শাসনাধীন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ) আগমন করেন। তারপর পনর দিনে ক—চ নামক স্থানে পৌঁছেন। শীতকাল অন্তে তিনি আর একখানি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া পশ্চিম মুখে যাত্রা করেন। অতঃপর ত্রিংশ

আই-তসিঙ্গ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় ক্রমে ক্রমে ষট পঞ্চাশৎ সংখ্যক গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই মহৎ কার্য্যে শিক্ষানন্দ, ঈশ্বর প্রভৃতি ভারতীয় শ্রমণগণ তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ বিনয় শাস্ত্র সম্বন্ধীয়। বস্তুতঃ তিনি বিনয় শাস্ত্রের অন্তর্গত স্ব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্মানিত সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। আই-তসিঙ্গের সমস্ত জীবন অধ্যয়ন, তীর্থ পর্য্যটন এবং ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই ভাবে স্বধর্ম্মের সেবায় আকৈশোর নিরত থাকিয়া তিনি পূর্ণ বয়সে (তৎকালে তাঁহার বয়স ঊনাশী বৎসর হইয়াছিল) পূর্ণ যশে পরলোক গমন করেন (৭১২ খৃঃ)।

অবশিষ্ট জীবন।

আই-তসিঙ্গ পর্য্যটন পরিসমাপ্ত করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চীনদেশে প্রচলিত স্বসম্প্রদায়ের মতানুগত বিনয় সূত্র সকলের কুব্যাখ্যার নিরাকরণ এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ভ্রান্ত মতের নিরসন তদীয় গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল। তজ্জন্য ভারতবর্ষের স্বসম্প্রদায়ের মতানুগত বৌদ্ধ সঙ্ঘনিচয়ের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের বর্ণনাতেই আই-তসিঙ্গ স্বগ্রন্থ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও তাঁহার গ্রন্থ হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধগণের অবস্থা কীদৃশছিল, তাহা জানা যাইতে পারে। কারণ

ভারত বিবরণী

দিন অন্তে নাগপত্তন নামক স্থানে উপনীত হন। তথা হইতে তিনি সিংহল দ্বীপে গমন করেন। নাগপত্তন হইতে সিংহলদ্বীপে পৌঁছিতে ২০ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি সিংহল হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব্ব-ভারতের পূর্ব্ব সীমাস্থিত হরিকেল নামক স্থানে উপনীত হন।"

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মূল মত নিচয়ের পার্থক্য থাকিলেও রীতি নীতি আচার ব্যবহার বিষয়ক পার্থক্য অতি সামান্য ছিল। আমাদের বর্ণিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে ভারতবর্ষের সাধারণ তত্ত্বও লিপিবদ্ধ আছে। ফলতঃ আই-তসিঙ্গের গ্রন্থাবলম্বনে ভারতীয় সভ্যতার একখানি নাতি ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে।

এই দেশের নাম আর্য্যদেশ; আর্য্য শব্দের অর্থ মহৎ, এই দেশে মহদ্ব্যক্তিগণ অবিরত আবির্ভূত হইতেছেন বলিয়া জনপুঞ্জ এই নামে স্বদেশের প্রশংসা করিয়া আসিতেছে। এই দেশ মধ্যদেশ নামেও কথিত হইয়া থাকে, কারণ ভারতভূমি শত শত দেশের মধ্যস্থানে অবস্থিত। মোগল তুর্কি প্রভৃতি উত্তর দেশীয়েরা আর্য্যভূমিকে হিন্দু দেশ আখ্যা প্রদান করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই নাম তাদৃশ প্রচলিত নহে। হিন্দু নাম অন্য ভাষা সম্ভূত, ইহার বিশেষ কোন অর্থ নাই। ভারতীয়গণ এই নাম অবগত নহে। ভারতবর্ষের উপযুক্ত নাম আর্য্যদেশ। অনেকে বলেন যে ইন্দু শব্দের অর্থ চন্দ্র, এবং ভারতবর্ষের চৈনিক নাম ইন্দিয়া ইন্দু শব্দ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদিও ইহার এইরূপ অর্থ হইতে পারে, তথাপি ইহা সুপ্রচলিত নাম নহে। এই স্থানে ইহাও লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক যে, পঞ্চ অংশে বিভক্ত সমস্ত দেশ ব্রহ্ম রাষ্ট্র নামেও কথিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগকে পবিত্র এবং উন্নত বলিয়া বিবেচনা করে ও তজ্জন্য গৌরব অনুভব করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ

সকল প্রকার খাদ্য বস্তু নানাপ্রণালীতে উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়: উত্তরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গম পাওয়া যায়। পশ্চিম প্রদেশে সর্ব্বোপরি তণ্ডুল বা যব অন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। মগধ দেশে (মধ্য ভারত; গম বিরল, কিন্তু ধান্য

ফল, শস্য ইত্যাদি

প্রচুর পরিমাণে জন্মে। দক্ষিণ দেশ এবং পূর্ব্ব সীমান্ত ভূমিতে মগধ দেশের অনুরূপ শস্য অর্জ্জিত হয়।

ঘৃত, মাখন, দুগ্ধ এবং তৈল সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ফল ও পিষ্টকের সংখ্যা এত অধিক যে, এখানে তৎসমুদয়ের নামোল্লেখ সম্ভবপর নহে। সাধারণ লোকেও চর্ব্বি এবং মাংস কদাচিৎ আহার করিয়া থাকে। সুমিষ্ট তরমুজ পাওয়া যায়। ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সালগম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্জ্জিত হয়।

জলাশয়

সর্ব্বত্র জলাশয় বিদ্যমান আছে। এই সকল জলাশয়ের জল প্রচুর। পুষ্করিণী খনন পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত। মাত্র এক যোজন পথ অতিবাহিত করিলেই ২০।৩০টি স্নানোপযোগী স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জলাশয়ের কোনটি বা ক্ষুদ্র, কোনটি বা বৃহৎ। পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে শাল বৃক্ষ রোপণ করিবার নিয়ম আছে। এই সমস্ত জলাশয় বৃষ্টির জলদ্বারা পূর্ণ হয়। এতৎ সমুদয়ের জল নির্ম্মল সলিলা নদীর জলের ন্যায় পরিষ্কার।

স্নান

ভারতবর্ষীয়েরা আহারের পূর্ব্বে স্নান করিয়া থাকে। আহারের পূর্ব্বে স্নান করিলে দুইটি সুফল লাভ হয়। প্রথম, সমস্ত ময়লা ধৌত হইয়া শরীর পরিষ্কার ও লঘু হয়; দ্বিতীয়, খাদ্য সামগ্রী জীর্ণ করিবার শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চিকিৎসা-শাস্ত্রে গুরু ভোজনের পর স্নান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

চিকিৎসা শাস্ত্র, স্বাস্থ্য ইত্যাদি

ভারতবর্ষের চিকিৎসাশাস্ত্র বহ্বায়তন; ভারতীয়গণ চিকিৎসাশাস্ত্র আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বিভাগে শল্য বিদ্যা (ক্ষত নিবারণ জন্য যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নিদ্বারা চিকিৎসা,) দ্বিতীয় বিভাগে শালক্য বিদ্যা (কর্ণ, চক্ষু, মুখ, নাসিকা প্রভৃতির রোগ সম্বন্ধীয় চিকিৎসা) তৃতীয় বিভাগে কায় চিকিৎসা, চতুর্থ বিভাগে ভূতবিদ্যা (দেব, অসুর,

গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিতৃ, পিশাচ প্রভৃতি গ্রহ কুপিত হইলে যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয়, তৎসমুদয়ের চিকিৎসা) পঞ্চমবিভাগে অগদ বিদ্যা (সর্প, কীট, বৃশ্চিক আদির দংশন জনিত রোগের চিকিৎসা), ষষ্ঠ বিভাগে কৌমার ভৃত্যবিদ্যা (শিশুরোগ চিকিৎসা) সপ্তম বিভাগে রসায়ন বিদ্যা (আয়ুর্ব্বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় চিকিৎসা) এবং অষ্টম বিভাগে বাজীকরণ বিদ্যা (শারীরিক শক্তি উদ্ধার জন্য চিকিৎসা) আলোচিত হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গ চিকিৎসা বিদ্যা সম্প্রতি একখানি গ্রন্থে (সম্ভবতঃ সুশ্রুত) সংগৃহীত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষের পঞ্চবিভাগের চিকিৎসকগণই উহার অবলম্বনে চিকিৎসা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। যে চিকিৎসক এই সঙ্কলিত গ্রন্থে সাতিশয় পারদর্শিতা লাভ করেন, তিনি রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষীয়েরা চিকিৎসকগণকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে। তাহাদের নিকট চিকিৎসা ব্যবসায় অতি সম্মানজনক।

ভারতীয়গণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবহিত। তাহারা তদর্থ স্বেচ্ছামত এবং উপযুক্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহারা কোলাহলপূর্ণ লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে ভ্রমণ করে। পূর্ব্বাহ্ন এবং অপরাহ্নের শেষ ভাগ ভ্রমণের জন্য প্রশস্ত সময় রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপ ভ্রমণ করিলে তৎফলে রোগ উপশম এবং পরিপাক শক্তিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পেঁয়াজ এবং রসুন স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর। ভারতবর্ষীয়েরা পেঁয়াজ এবং রসুন ভক্ষণে বিরত রহিয়াছে। এই কারণ তাহাদিগকে অজীর্ণ রোগ হইতে মুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন রোগে পেঁয়াজ এবং রসুন উপকারী; ভারতবর্ষীয়েরা সেই সকল স্থলে উহা ঔষধার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে এই হীন প্রথা দেখা যায় যে,

লোক পীড়া উপস্থিত হইলে শূকর এবং বিড়ালের মূত্র, ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পোষাক পরিচ্ছদ।

আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মনোযোগ প্রদান এবং তৎসম্বন্ধীয় যথোপযুক্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন। ভারতবর্ষের রাজ কর্ম্মচারী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকগণ এক যোড় কোমল ও শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কিন্তু মাত্র একখণ্ড বস্ত্রই নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীস্থ লোক সকলের লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে।

ছত্র।

ভারতীয়গণ ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল ছাতার গঠন এরূপ যে, তাহা দেখিলে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই সকল ছাতা বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত হয়; অনেক স্থলে বাঁশের পরিবর্ত্তে নল খাগড়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছাতা গুলি দেখিতে বুনট করা টুপির মত।

ভোজন পাত্র।

সাধারণতঃ তাম্রপাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল পাত্র ভোজনান্তে মার্জ্জন করিয়া পরিস্কার করিতে হয়। মৃৎপাত্রও ব্যবহার করিবার প্রথা আছে; কিন্তু একবার ব্যবহার করিলেই তাহা অপবিত্র হইয়া যায় এবং গর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই কারণ ভারতবর্ষের দাতব্য শালার নিকটবর্ত্তী পথপার্শ্বে রাশীকৃত পুরাতন মৃৎপাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে চীনা মাটির এবং বার্নিস করা জিনিসের অভাব ছিল। এখন সময় সময় বণিকগণ কর্ত্তৃক বার্নিস করা জিনিস বিদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ।

ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশেই ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। অপর তিন বর্ণের লোক সকলের সঙ্গে একত্র হইলেও ব্রাহ্মণগণ তাহাদের

সহিত আহার ব্যবহার করিতে বিরত থাকেন। বর্ণ সঙ্করদের সহিত ব্রাহ্মণগণের সম্পর্ক এতদপেক্ষাও অল্প। ব্রাহ্মণগণ যে শাস্ত্রের সম্মান করেন, তাহার নাম বেদ, বেদ চারি প্রকার; চতুর্ব্বেদে প্রায় এক লক্ষ শ্লোক আছে। বেদ শব্দের অর্থ নির্ম্মল জ্ঞান। চতুর্ব্বেদ মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, ইহা কাগজে বা পত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। প্রত্যেক যুগেই এরূপ কতিপয় বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের উদ্ভব হইয়াছে, চতুর্ব্বেদের লক্ষ শ্লোক যাহাদের কণ্ঠস্থ।

আত্মহত্যা।

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করা আন্তরিক পবিত্রতার প্রমাণ রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। প্রত্যহ অনেক লোক গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। বুদ্ধ গয়ার পর্ব্বতোপরিও আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেকে অনাহার দ্বারা জীবন বিনষ্ট করে। অনেকে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আত্মহত্যা করে।

আই—ত্সিঙ্গ ঈদৃশ আত্মহত্যার অনেক নিন্দা করিয়াছেন, তাদৃশ প্রথা বিনয় শাস্ত্র-বিরোধী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা।

ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণ মহাযান মতাবলম্বী। তাহারা চারি সম্প্রদায়ে এবং আঠার উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। চারি মূল সম্প্রদায়ের নাম (১) আর্য্য মহাসঙ্ঘিক নিকায়, (২) আর্য্যস্থবির নিকায়, (৩) আর্য্য মূল সর্ব্বাস্তিবাদ নিকায়, (৪) আর্য্য সম্মতিয় নিকায়। আর্য্য মহাসাঙ্ঘিক-নিকায়-ভুক্ত বৌদ্ধগণের সংখ্যা অল্প, ইহারা প্রধানতঃ উত্তর ভারতে বাস করিতেছে। আর্য্যস্থবির-নিকায়-ভুক্ত অধিকাংশ বৌদ্ধ দক্ষিণ ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ উত্তর এবং মধ্যভারত আর্য্য মূল-সর্ব্বাস্তিবাদ-নিকায় ভুক্ত বৌদ্ধগণের বাসস্থান। আর্য্য সম্মতিয়-নিকায় ভুক্ত বৌদ্ধগণ প্রধানতঃ লাট (রাজ পুতনার একাংশ) এবং সিন্ধুদেশে

বাস করিতেছে। পূর্ব্ব ভারতে সকল শ্রেণীর বৌদ্ধ এক সঙ্গে বাস করিতেছে।

মহা প্রভুর ছায়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যগণেরও তিরোধান হইয়াছে। অপধর্ম্মাবলম্বীরা পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং লোক হিতৈষণারূপ ক্ষুদ্র পাহাড় বিনষ্ট হইতেছে। সূর্য্যোপম বুদ্ধদেবের প্রভা রক্ষা করাই জ্ঞানী ও মহদ্ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া মহাশিক্ষা প্রদান সম্ভবপর নহে। সৌভাগ্য-বশতঃ বিচক্ষণ লোকদিগেব নিকট সত্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা বিলুপ্ত হয় নাই; তাঁহাদিগকে আয়াস সহকারে এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ইহা শীল (নীতি) সাগরের তরঙ্গ উত্থিত করিতেছে। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম শেষ দশার নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিলেও উহা রক্ষা পাইবে বলিয়া ভরসা হয; আরও বোধ হয় যে, ধর্ম্মচর্য্যা কুব্যাখ্যা বশতঃ দূষিত হইয়া থাকিলেও উহা ঠিক হইতে পারিবে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতা।

শ্রমণগণ যে কক্ষে বাস করেন, সেই কক্ষের বাতায়ন পথে অথবা কুলঙ্গিতে সময় সময় পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভোজনকালে ঐ মূর্ত্তি পর্দ্দা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়। শ্রমণগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করেন এবং তারপর ঐ মূর্ত্তির নিকট ধূপ ধুনা ও পুষ্পাঞ্জলি দেন। ভোজনের পূর্ব্বে তাঁহারা আহার সামগ্রীর কিয়দংশ ঐ পবিত্র মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। রাত্রিকালে তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে পবিত্র মূর্ত্তি কক্ষান্তরে নীত হয়। প্রধান প্রধান সঙ্ঘারামের প্রবেশ দ্বারে একটি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্ত্তি কাষ্ঠ নির্ম্মিত, তদঙ্গে প্রত্যহ তৈল নিষেক হইয়া থাকে। ইহা মহাকাল দেবের মূর্ত্তি। বৌদ্ধধর্ম্মের পঞ্চ পরিষদকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মহাকাল মূর্ত্তি প্রহরী স্বরূপ প্রধান প্রধান সঙ্ঘারামের দ্বারে স্থাপিত হইয়াছে।

বাণিজ্য ব্যবসায় কৃষিকার্য্য অপেক্ষা নির্দ্দোষ এবং শ্রেয় বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। কৃষিকার্য্যে কীট পতঙ্গের জীবন নাশ হইয়া থাকে; এই জন্য কৃষি কার্য্যের তাদৃশ মর্য্যাদা নাই। অনেক সঙ্ঘারামের সংসৃষ্ট বিস্তৃত ভূমি আছে। শাস্ত্রানুসারে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হওয়া শ্রমণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। শ্রমণগণ শাস্ত্রের অনুশাসন প্রতিপালনে তৎপর। এই কারণ তাঁহারা ঐ সমস্ত ভূমি কৃষকদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তদুৎপন্ন ফল মূল এবং শস্যের এক তৃতীয়াংশ তাঁহারা গ্রহণ করেন, অবশিষ্টাংশ কৃষকেরা পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও কৃষি

সঙ্ঘারাম নিচয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূ-সম্পত্তি ন্যস্ত রহিয়াছে। সঙ্ঘারামের উদ্দেশ্যে ভূমি, গৃহ অথবা কোন বস্তু প্রদত্ত হইলেই বুঝিতে হয়, যে, তদ্দ্বারা সেই সঙ্ঘারামের শ্রমণগণের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। সঙ্ঘারামের শ্রমণগণ অস্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করিবেন, আর গোলা-ভরা পুরাতন ধান্য, কোষপূর্ণ ধন রত্ন এবং বহু দাস দাসী অব্যবহৃত থাকিবে, ইহা বিসদৃশ। ন্যায়ান্যায় বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করা জ্ঞানিগণের পক্ষে কর্ত্তব্য। এরূপ অনেক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে, যেখানে শ্রমণদিগের ভরণ পোষণের ভার তাঁহাদের নিজেদের হস্তে অর্পিত আছে; এইরূপ স্থলে সঙ্ঘারাম ভুক্ত সম্পত্তির আয় শ্রমণগণ মধ্যে বিভক্ত হইয়া থাকে। ঈদৃশ সঙ্ঘারাম সমূহে অপরিচিত ব্যক্তি দিগকে আশ্রয় দানের বন্দোবস্ত নাই। (১)

সঙ্ঘারাম

(১) ভারতীয় সঙ্ঘারাম সমূহের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য নানা প্রকার সুনিয়ম প্রতিপালিত হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাম্রলিপ্তি বিহার সম্বন্ধে আই-তসিঙ্গ যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। ভিক্ষুনিগণ শ্রমণদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য গমন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া

উপবস্ত ক্রিয়া উপলক্ষে শ্রমণদের ভোজ হইয়া থাকে। উপবস্ত শব্দের অর্থ উপবাস। উপবস্ত বৌদ্ধগণের সাপ্তাহিক ধর্ম্ম ক্রিয়া।

বৌদ্ধ ভোজ

উপবস্ত দিবসে বৌদ্ধগণ অষ্টাঙ্গ (নীতি) পালন জন্য শপথ গ্রহণ করেন। উপবস্ত দিবসের ভোজ মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সমস্ত পাত্র পিষ্টক এবং অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ হয় এবং ঘৃত ও মাখন যদৃচ্ছামত ভোজন করা যায়।

ভোজ উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথমে পরলোকগত আত্মা এবং অন্যান্যরূপ ভূতের উদ্দেশ্যে এক পাত্র ভোজ্য উৎসর্গ করিবার নিয়ম আছে। এই সময় একজন লোক সেই ভোজ্য আনয়ন পূর্ব্বক স্থাবরের সম্মুখে হাটু গাড়িয়া উপবেশন করে। অতঃপর স্থবির কিঞ্চিৎ জল ছিটাইয়া দিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে ঐ ভোজ্য পাত্র বনে অথবা নদী বা পুষ্করিণীর পার্শ্বে অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে লুক্কায়িত ভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়।

কোন কোন স্থলে গৃহস্বামী শ্রমণগণের আগমনের পূর্ব্বেই পবিত্র মূর্ত্তি সকল স্থাপিত করেন এবং মধ্যাহ্নকাল আগত হইলে নিমন্ত্রিত শ্রমণবৃন্দ ঐ সকল মূর্ত্তির সম্মুখে করযোড়ে উপবেশন পূর্ব্বক

থাকেন: কোন শ্রমণের ভিক্ষুনাদের প্রকোষ্ঠে গমন করা আবশ্যক হইলে পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হয়। সঙ্ঘারামের বহির্ভাগে গমন করিতে হইলে কোন ভিক্ষুনী একাকিনী যাইতে পারেন না; তাঁহাকে আর একজন সহচরী সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়, কিন্তু কোন গৃহীর আলয়ে গমন করা প্রয়োজন হইলে আরো দুইজন সহচরী আবশ্যক। একদা জনৈক অল্পবয়স্ক শ্রমণ একজন কৃষক পত্নীকে দুই প্রস্থ অন্ন একজন বালকের যোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা প্রকাশিত হইলে তাঁহার বিচার হয়; বিচারকালে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হন, তাহা হইলেও তিনি লজ্জায় অধোবদন হন এবং সঙ্ঘারাম পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। কোন রমণী শ্রমণদের কক্ষে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাহারা আবশ্যক মত মুহূর্ত্তের জন্য গৃহপথে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতে পারে।

উপাস্যগণের ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হন। ধ্যানান্তে তাঁহারা আহার করিতে আরম্ভ করেন। এরূপও দেখা যায় যে, সমাগত শ্রমণবৃন্দ হইতে একব্যক্তি গৃহ স্বামীর মনোনয়ন অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

গৃহস্বামী নিমন্ত্রিত শ্রমণদিগকে আলোক প্রদান এবং পুষ্প বিতরণ পূর্ব্বক সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। তিনি সুগন্ধ চূর্ণ দ্বারা তাঁহাদের পদ মর্দ্দন এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধূপ ধুনা দগ্ধ করিয়া থাকেন।

ভোজ উপলক্ষে গৃহস্বামী বাদ্য ও সঙ্গীতের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

স্থবির ব্যতীত অন্য ব্যক্তির অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইবার অধিকার নাই। উপাধ্যায় বিনয় শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ হইয়া থাকেন। অনেক বালক সঙ্ঘ ভুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। এই সকল বালক মানব নামে অভিহিত হয়। অনেক বালক সাহিত্যাদি অধ্যয়ন জন্য বৌদ্ধ উপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই সকল শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত। কি মানব শিক্ষার্থী, কি ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী, সকলের পক্ষেই সঙ্ঘারামে অবাস্থত করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু তাহাদের ভরণ পোষণের ব্যয় নিজেদের বহন করিতে হয়। শিক্ষার্থীরা উপাধ্যায়দিগকে দাসের ন্যায় সেবা করিয়া থাকে। শিক্ষার্থীদিগকে সঙ্ঘারামের ভাণ্ডার হইতে আহার্য্য প্রদান শাস্ত্রাবরুদ্ধ। কিন্তু যদি কোন দাতা তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করেন, তবে তাহাদের আহার্য্য প্রদানে দোষ নাই। শিক্ষার্থীরা প্রথম এবং শেষ রাত্রিতে উপাধ্যায়ের নিকট গমন করে। এই সময় তাহারা উপাধ্যায়ের আদেশে আসন পরিগ্রহ করিয়া পাঠ গ্রহণ করে। তৎকালে উপাধ্যায় তাহাদিগকে সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা

বৌদ্ধ উপাধ্যায়।

করিয়া দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং কোন প্রকার দুর্ব্যবহার বা অপব্যবহার বিষয়ে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেন। কোন শিক্ষার্থীর দোষ দৃষ্ট হইলে যাহাতে তাহার অনুশোচনা এবং দোষ সংশোধন জন্য যত্ন উপস্থিত হয়, উপাধ্যায় তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করেন। শিক্ষার্থীরা উপাধ্যায়ের গাত্র মর্দ্দন করিয়া দেয়, তাঁহার বস্ত্রাদি ভাঁজ করিয়া রাখে এবং প্রাঙ্গণ ও কক্ষ পরিমার্জ্জন করে। বস্তুতঃ উপাধ্যায়ের পক্ষে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহারা তৎসমুদায় সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে কোন শিক্ষার্থী রোগাক্রান্ত হইলে উপাধ্যায় স্বহস্তে তাহার শুশ্রূষা করেন, তাহাকে ঔষধ ও পথ্য দেন এবং পিতার ন্যায় যত্ন সহকারে তাহার রোগ মোচন জন্য যত্নশীল হন।

নালন্দা বিহার।

নালন্দা বিহারে বৌদ্ধ শাস্ত্রানুমোদিত আচার ব্যবহার সূক্ষ্মভাবে প্রতিপালিত হইতেছে। তজ্জন্য এই বিহারবাসীর সংখ্যা বহু। তাঁহাদের সংখ্যা তিন সহস্র অপেক্ষাও অধিক। নালন্দা বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিদধিক দুই শত পল্লী উৎসর্গীকৃত রহিয়াছে। এই বিপুল সম্পত্তি যুগযুগান্তরক্রমে ভারতীয় রাজন্যগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহতভাবে হইয়া আসিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বিনয় শাস্ত্রের অনুশাসন সকল সূক্ষ্মভাবে প্রতিপালিত হইতেছে। বর্ষাকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নালন্দা বিহারস্থ প্রত্যেক শ্রমণের জন্য কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্থবিরগণের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষ সকল নির্দ্দিষ্ট হয়, তারপর মর্য্যাদানুসারে শ্রমণবৃন্দ কক্ষ প্রাপ্ত হন। এক বৎসর অন্তে পুনর্ব্বার এতৎসম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। নালন্দা বিহারের প্রশস্ত গৃহের সংখ্যা আট এবং প্রকোষ্ঠের সংখ্যা তিন শত। সুবিধার্থ শ্রমণগণের উপাসনা পৃথক পৃথক স্থানে হইয়া

থাকে। প্রত্যহ একজন অগ্রগামী গায়ক স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন; তাঁহার অগ্রে অগ্রে বালক ও ভৃত্যবর্গ পুষ্প ও ধূপ ধুনা লইয়া যায়। অগ্রগামী গায়ক এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে উপনীত হন এবং প্রত্যেক গৃহে উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রের তিনটী অথবা পাঁচটী শ্লোক আবৃত্তি করেন। গোধূলি সময়ে তাঁহার কার্য্য শেষ হয়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন শ্রমণ মন্দিরাভিমুখে একাকী উপবেশন করিয়া বুদ্ধদেবের মহিমা ধ্যান করেন; আবার কোন কোন শ্রমণ মন্দিরে গমনপূর্ব্বক পরস্পর সংলগ্নভাবে হাঁটু গাড়িয়া উপবিষ্ট হন এবং তারপর ভূমিতে হস্ত রাখিয়া তাহাতে মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক ত্রিকাঙ্গ প্রণাম করেন।

আরব্য বিবরণী।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; স্বাধীন কাল, মোসলমান শাসনকাল এবং ব্রিটিশ শাসনকাল। ভারতবর্ষের স্বাধীন যুগ এবং মোসলমান শাসনাধীন যুগের মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা টানিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, ভারতবর্ষ মোসলমানের সংস্পর্শে আসিয়াও সুদীর্ঘ কাল আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে কদাচিৎ কোন স্থানে মোসলমানের অধিকার স্থাপিত হইত; কিন্তু দুর্জ্জয় হিন্দুগণ অচিরে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধন করিতেন; কেবল পঞ্জাবের একাংশে মোসলমানের স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারত ইতিহাসের তিন বিভাগ।

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরব দেশীয় মোসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ

করেন। ইহাই মোসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ। এই আক্রমণের পাঁচ শত সাতান্ন বৎসর পরে পাঠান জাতীয় মোসলমানগণ উত্তর ভারতে অধিকার স্থাপন করেন। প্রাগুক্ত সময় মধ্যে কতিপয় আরব্যলেখক ভারত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল লেখকের গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের বিবরণ সঙ্কলন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আরব্য বিবরণী।

আমরা প্রধানতঃ ছয় জন লেখকের গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিব। এই সকল লেখকের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমে প্রদত্ত হইতেছে।

ছয় জন লেখক।

বণিক সোলেমান, ইনি বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ৮৫১ খৃষ্টাব্দ সোলেমানের ভারত ভ্রমণের সময়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সোলেমান।

ইবন খুরদতবা, ইনি বোগদাদের খলিফাগণের রাজত্বকালে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ৯১২ খৃষ্টাব্দে ইবন খুরদতবার মৃত্যু হয়।

ইবন খুরদতবা।

অল মসূদি,ইহার প্রকৃত নাম আবুহাসন আবি ; অল মসূদি উপাধি মাত্র। অল মসূদির জনৈক পূর্ব্বপুরুষ মহাপুরুষ মোহাম্মদের মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন কালে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। অল মসূদির জীবনের অধিকাংশ দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত হয়। ৯৫৬ খৃষ্টাব্দ তাঁহার মৃত্যুকাল।

অল মসূদি।

অলইস্তখিরি, ইনি সুপ্রসিদ্ধ ইস্তখরে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অল-ইস্তখরি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, প্রকৃত নাম সেখ আবু ইসাক। আবু ইসাক একজন প্রসিদ্ধ দেশপর্য্যাটক ছিলেন। তিনি মোসলমান অধ্যুসিত সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়।

অলইস্তখিরি।

ইবন হোকল, ইনি বোগদাদের অধিবাসী ছিলেন, ইঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আবুল কাসিম। আবুল কাসিমের বাল্যকালে তুর্কীগণ বোগদাদ আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের নির্ম্মম আক্রমণে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন, একারণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন সংকল্প করেন। আবুল কাসিম ৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ পরিত্যাগ করেন এবং বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগত হন।

ইবন হোকল।

অলইদ্রিসি. ইনি মরোক্কোর অধিবাসী ছিলেন; নানা ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সিসিলিতে স্থায়ী বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন। সিসিলির অধিপতির আদেশে তিনি আপন ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে রচনা করেন।

অলইদ্রিস।

আমাদের অবলম্বন স্বরূপ ছয় জন লেখকই দেশ পর্য্যটন বা বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ইহারা সকলেই আরব্যকুল সম্ভূত ছিলেন। এই সকল আরব্য লেখক ভারতবর্ষের যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তৎসাময়িক সুন্দর চিত্র।

অল মসূদি স্বীয় গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ, সমুদ্র, ভূমি এবং পর্ব্বতে বিস্তৃত; যবদ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতের সীমা বিস্তৃত; অন্য দিকে সিন্ধু ও খোরসান পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ভারতবর্ষের অন্য পার্শ্বে তিব্বত অবস্থিত। এই দেশে ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে; ভারতবাসীরা অনেক সময় পরস্পর যুদ্ধ করে। অধিকাংশ ভারতবাসীই পরকাল এবং পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী। বিদ্যাবুদ্ধি, শাসনপ্রণালী, দর্শনশাস্ত্র, শারীরিক বল ও বর্ণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে হিন্দুগণ অন্যান্য কৃষ্ণকায় জাতি হইতে বিভিন্ন।

ভারতবর্ষ, অনন্য সাধারণত্ব।

এই নানা ভাষা ও নানা ধর্ম্ম-সংবলিত অনন্য সাধারণ সুবিস্তৃত দেশ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মণ্ডলে স্বতন্ত্র রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরব্য পর্য্যাটকগণ বহুসংখ্যক রাজবংশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা কতিপয় রাজ্যের বিবরণ অবগত হইয়া থাকি। আমরা এখানে সেই সকল রাজ্যের নাম উল্লেখ করিতেছি। বল্লার, জুরজ, তাফন, রুমি. কাসবিন, ঘান, কামরুন, যাব, কুমার, কাশ্মীর, কনৌজ, কিরঙ্গ।

রাজ মণ্ডল।

বল্লার, আরব্য ভ্রমণকারিগণের হস্তে পতিত হইয়া বল্লভিপুর বল্লার নামে পরিচিত হইয়াছে। এই বল্লভিপুরের রাজন্যগণ বল্লভি নামে এক অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। টড সাহেব লিখিয়াছেন যে, বল্লভিপুর রাজ্য মালব দেশে অবস্থিত ছিল। ফরাসী পণ্ডিত রেইনাড সাহেবও এই মতাবলম্বী। দক্ষিণে তাপ্তী নদী এবং উত্তরে আরাবলী পর্ব্বত পর্য্যন্ত বল্লভিপুর রাজ্যের সীমা প্রসারিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ্ সঙ্গ বল্লভিপুর রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। টমাস সাহেবের মতে ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে বল্লভি বংশের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। টমাস সাহেবের নিরূপণ সঙ্গত নহে। কারণ আরব্য লেখকগণের সময়েও বল্লভিপুর রাজ্যের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল; আরব্য লেখকগণের ভারত আগমন কাল ৮৫১ খৃঃ—৯৬৮ খৃঃ। যাহা হউক, বল্লভিবংশের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও ভবনগরের ২০ মাইল দূরে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

বল্লার।

জুরজ, আরব্য লেখকগণ গুর্জ্জর বা গুজরাট নাম বিকৃত করিয়া জুরজ করিয়াছেন। গুজরাট রাজ্য বল্লভিপুরের উত্তরে অবস্থিত ছিল। হিউএন্থ্ সঙ্গ বল্লভিপুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া সুরাট ও গুজরাটে উপনীত হইয়াছিলেন।

জুরজ।

তাফন, সোলেমান লিখিয়াছেন, "তাফক"; ইবনখুরদতবা এবং মস্যুদির মতে "তাফন"। আরব্য লেখকগণ আপনাদের গ্রন্থে তাফক বা তাফনবাসিনী রমণীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত রেইনাড এই বর্ণনার সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় রমণীর সাদৃশ্য দেখিয়া তাফক বা তাফন আরঙ্গাবাদের নিকট কোন স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রেইনাড সাহেবের নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। সোলেমান লিখিয়াছেন, তাফক গুর্জ্জরের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। মস্যুদি লিখিয়াছেন, তাফন পার্ব্বত্য রাজ্য। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ তৈফন্দ নামক দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া আসারু-ল বিলাদ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তৈফন্দ তাফন হইতে অভিন্ন। উক্ত গ্রন্থে তৈফন্দ রাজ্যের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি জন্মে যে, তাফন রাজ্য ঝিলাম এবং সিন্ধু নদের মধ্যস্থিত পর্ব্বতমালায় অবস্থিত ছিল।

তাফন।

রুমি, প্রাগুক্ত রেইনাড সাহেব লিখিয়াছেন, রুমি রাজ্য প্রাচীন বিশাপুর রাজ্যের সহিত অভিন্ন। কিন্তু এই বিশাপুর রাজ্যের অবস্থানও অদ্য পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে নাই। অল মস্যুদি লিখিয়াছেন, রুমি রাজ্যের পার্শ্বে কামন নামক এক দেশ অবস্থিত ছিল; ইবন খুরদতবা লিখিয়াছেন, কামরুন রাজ্য রুমির সহিত সংযুক্ত এবং কামরুন রাজ্যের পার্শ্বেই চীন রাজ্যের সীমা ছিল। আমাদের বোধ হয় যে, কামরূপই আরব্য লেখকগণের হস্তে পতিত হইয়া "কামন" বা "কামরুনে" দাঁড়াইয়াছে। যদি আমাদের এই অবধারণ যথার্থ হয়, তবে রুমি রাজ্য পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

রুমি।

কাসবিন, টড লিখিয়াছেন, কাসবিন রাজ্য প্রাচীন কচ্ছভোজ-

রাজ্যের নামান্তর মাত্র। কিন্তু রেইনাড সাহেবের মতে কাসবিনের আধুনিক নাম মহীশূর। ঐতিহাসিক ডোসন সাহেব লিখিয়াছেন, কাসবিন রাজ্যের বর্ত্তমান নাম নির্ভুলরূপে ঠিক করিবার কোন উপায় নাই।

কাসবিন।

যান, যান রাজ্য কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই।

যান।

কামরুন, কামরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কামরুন হইয়াছে।

কামরুন।

যাব, যাব রাজ্য কোন স্থানে ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই।

যাব।

কুমার, কুমারিকা অন্তরীপ এবং ত্রিবাঙ্কুরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কুমার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইবন ফকিয়া নামক একজন আরব্য ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, কুমার রাজ্যে মদ্যপায়ীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য উত্তপ্ত লৌহ শলাকা তাহাদের শরীরে স্থাপন করিয়া উহা শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত তদবস্থাতেই রাখা হইত; ইহাতে অনেক ব্যক্তির জীবন নাশ পর্য্যন্ত ঘটিত।

কুমার।

কিরঞ্জ, সোলেমান লিখিয়াছেন, কিরঞ্জ, কিন্তু মসূদি লিখিয়াছেন, ফিরঞ্জ। রেইনড সাহেবের মতে করমণ্ডল উপকূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিরঞ্জ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী কলিঙ্গ রাজ্য বলিয়া অনুমিত হয়।

কিরঞ্জ।

আরব্য লেখকগণের মতে ভারতীয় রাজ্যসমূহে বল্লারের নরপতি প্রতাপে, ক্ষমতায়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা অল মসূদির গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "বর্ত্তমান সময়ে মানকির নগরের বল্লার সম্রাট ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। ভারতবর্ষের অনেক অধিপতি

মানকির রাজদূতের তোষামোদ করিয়া থাকেন। বল্লারের চারিদিকে অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য বিদ্যমান। বল্লারের সৈন্য ও হস্তীর সংখ্যা অপরিমিত। রাজধানী মানকিরনগর পর্ব্বতে অবস্থিত, এ কারণ অধিকাংশ সৈন্যই পদাতিক।

বল্লার রাজ।

বল্লারের নরপতির সমকক্ষ না হইলেও তৎকালে গুজরাটাধিপতিও সাতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন। বণিক সোলেমান লিখিয়াছেন, গুজরাটের সৈন্য সংখ্যা অগণ্য। ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজার তাদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য নাই। ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ মধ্যে গুজরাটাধিপতিই ইসলাম ধর্ম্মের প্রবলতম শত্রু। গুজরাটাধিপতি সাতিশয় সম্পদশালী; তাঁহার উষ্ট্র ও অশ্বের সংখ্যা অপরিমিত। গুজরাটে বিনিময়ের জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের রেণু ব্যবহৃত হয়; এই দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের খনি আছে বলিয়া লোক-শ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে। গুজরাটের ন্যায় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশই দস্যু তস্করের ভয় হইতে নিরাপদ নহে।

গুজরাট রাজ।

আরব্য লেখকগণ ভারতীয় রাজবংশের পরিচয় প্রদান করিয়াই আপনাদের গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নাই; রাজনীতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য ঐ আলো-চনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মসূদি লিখিয়া গিয়াছেন, "ভারতীয় রাজকুমারগণ চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে রাজ-পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। রাজন্যবৃন্দ কদাচিৎ প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখীন হয়েন; রাজকার্য্য সম্পাদনের সময় ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষে প্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষে রাজদর্শন করিবার উপায় নাই। হিন্দুজাতির মতে নরপতি সর্ব্বদা প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখীন হইলে তাঁহার মর্য্যাদার লাঘব এবং বিধিদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার হয়। ভারতবর্ষে শাসনকার্য্য প্রকৃতিপুঞ্জের সদ্ভাব এবং রাজপুরুষগণের প্রভাব প্রতিপত্তি

রাজনীতি।

দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজপদ বংশানুক্রমিক। রাজমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজপুরুষগণও পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। হিন্দুজাতি সুরাপানে বিরত রহিয়াছেন; যাহারা সুরা পান করে, তাহারা হিন্দু সমাজে সাতিশয় তিরস্কৃত হয়। সুরা পান ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া যে, হিন্দুজাতি উহার ব্যবহারে বিরত রহিয়াছেন, তাহা নহে; সুরা বুদ্ধির ভ্রংশ এবং শক্তির বিলোপ সাধন করে, এজন্য তাঁহারা সুরাপানে বিরত রহিয়াছেন। যদি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন নরপতি সুরাপানে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তবে তিনি রাজ্য শাসনের অযোগ্য বলিয়া সিংহাসনচ্যুত হন।"

সোলেমানের গ্রন্থেও ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার মতামতও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ভারতবর্ষের রাজ্যসমূহে অভিজাত সম্প্রদায় এক বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা কেবল এই অভিজাতগণের হস্তগত রহিয়াছে। নরপতিগণ আপনাদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পণ্ডিত ও চিকিৎসকগণ সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। তাহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ভুক্ত। অন্য শ্রেণীর ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাঁহাদের ব্যবসায় গৃহীত হইতে পারে না। হিন্দুজাতি বিলাস ব্যসনের বিরোধী। তাঁহারা সুরাপান করেন না, সুরা তাঁহাদের নিকট ঘৃণ্য। তাঁহাদের মতে সুরাপায়ী রাজা নরপতি নামের যোগ্য নহেন। ভারতবর্ষের রাজন্যগণ শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, এই কারণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সন্ধি বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। প্রকৃতি পুঞ্জ বলিয়া থাকে, যদি রাজা সুরাপানে মত্ত হন, তবে কি প্রকারে তিনি রাজ্যের গুরুভার বহন করিবেন? ভারতীয় নরপতি কখন কখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। যদি পার্শ্ববর্ত্তী রাজা কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হন, তবে বিজয়ী রাজা পরাজিত রাজ বংশেরই একজন

রাজকুমারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, এই নবাভিষিক্ত রাজা বিজেতার অধীন হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। ঈদৃশ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ব্যতীত বিজিত দেশের প্রজাবর্গকে শান্ত ও বশীভূত করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

রাজ সৈন্য।

ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের অসংখ্য সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল সৈন্যকে বেতন দিবার প্রথা নাই। (১) কোন ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইলে এই সকল সৈন্য সমবেত হইয়া যুদ্ধ করে। তার পর যুদ্ধ শেষ হইলে তাহারা কপর্দ্দক মাত্রও গ্রহণ না করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

রাজ মৃত্যু, সহমরণ।

ভারতবর্ষের কোন কোন দেশের রাজার মৃত্যু হইলে এক অদ্ভুত প্রথার অনুষ্ঠান হইত বলিয়া সোলেমান উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এখানে ঐ প্রথার বর্ণনা করিতেছি। রাজশব শ্মশানে বহন করিয়া লইবার সময় একজন স্ত্রীলোক অগ্রে অগ্রে সম্মার্জ্জনী হস্তে গমন করিত এবং চিৎকার করিয়া বলিত, "নগরবাসিগণ, তোমরা দেখ, এই ব্যক্তি গতকল্য তোমাদের অধিপতি ছিলেন, তোমাদিগকে শাসন করিতেন; তাঁহার সমস্ত আদেশ জন সাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইত; দেখ, আজ তাঁহার কি দশা হইয়াছে। তিনি পৃথিবী হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন, মৃত্যুর দূত তাঁহার আত্মা লইয়া গিয়াছেন। অতএব জীবনের সুখে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বিপথগামী হইওনা।" এই বর্ণনার পর ভারতবর্ষের রাজবংশে যে সতীদাহের প্রথা বিদ্যমান ছিল, তাহার উল্লেখ করা

(১) কোন কোন স্থলে এই প্রথার ব্যতিক্রম হইত। বল্লালের নরপতি অর্থ দ্বারা সৈন্য পরিপোষণ করিতেন; আরব্য ভ্রমণকারিগণের লেখা হইতে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়

হইয়াছে। রাজশব দাহন করিবার সময় রাজমহিষীগণ চিতায় প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাঁহারা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন নাশ, কি জীবিত থাকিয়া বৈধব্য অবলম্বন করিতেন, তৎসম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণ তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

কেবল যে ভারত-নারীই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন নাশ করিতে সমর্থ ছিলেন, তাহা নহে; ভারতবর্ষের পুরুষ জাতিও স্বহস্তে জীবন নাশ করিতে পারিতেন। এতৎ সম্বন্ধে সোলেমান লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহ বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইলে এবং ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়িলে তদীয় আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ অথবা জলে নিমজ্জিত করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়। তাঁহারা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী বলিয়া এইভাবে আত্মনাশ করিতে সমর্থ।

আত্মহত্যা

সোলেমানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে ভারতবর্ষের রাজান্তঃপুরিকাগণের অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইতে পারি। সোলেমান লিখিয়াছেন যে, অধিকাংশ নরপতিই পুরঙ্গনাদিগকে রাজসভায় আনয়ন করিতেন; তাঁহারা বিনা অবগুণ্ঠনে সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থিত থাকিতেন।

অবরোধ প্রথা

বর্ণভেদ ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। এই বর্ণ বৈষম্য বিদেশী মাত্রেরই চোখে পড়ে। আমাদের আরব্য-পর্য্যাটকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও ভারতবর্ষের বর্ণ-বৈষম্য সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা এখানে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

বর্ণ বিভাগ

ইবন খুরদতবা লিখিয়াছেন, হিন্দুজাতি সাতভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর নাম সারকুত্রিয়া। অলইদ্রিসি লিখিয়াছেন, কত্রিয়া। ইবন খুরদতবা এবং অলইদ্রিসি উভয়েই লিখিয়াছেন, ঐ শ্রেণী অতিশয়

সম্ভ্রান্ত ; রাজগণ এই শ্রেণী হইতে গৃহীত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের আপামর সাধারণ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত লোকদিগকে সম্মান প্রদর্শন করে ; কিন্তু ইঁহারা কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন না।

সপ্তবর্ণ, কক্রিয়া

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ কখনও সুরা স্পর্শ করেন না। শাস্ত্র চর্চ্চায় ইঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণগণ ব্যাঘ্র চর্ম্ম বা অন্য কোন পশু চর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করেন। কখন কখন ব্রাহ্মণগণ দণ্ডধারণ করিয়া চতুঃপার্শ্বে সমাগত জন মণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের শক্তি ও মহিমা ঘোষণা করেন। ইঁহারা মূর্ত্তির উপাসক ; ইঁহাদের বিশ্বাস যে, এই সকল মূর্ত্তি সন্তুষ্ট হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ, দার্শনিক, কবি এবং গণক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিদ্বজ্জন মাত্রেই ব্রাহ্মণবংশজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রাজন্যগণ তাদৃশ বিদ্বজ্জনের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করেন। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে এই সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার আছে।

ব্রাহ্মণ

তৃতীয় শ্রেণীর নাম ক্ষাত্রেয়। ক্ষাত্রেয়ের পক্ষে তিন পাত্রের অধিক সুরাপান নিষিদ্ধ। ইবন খুরদতবা লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ ক্ষাত্রেয় কন্যা বিবাহ করেন ; কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিতে অসমর্থ। কিন্তু অলইদ্রিসি অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি পীড়ন করেন ; ব্রাহ্মণগণ ক্ষাত্রিয় কন্যার পাণি পীড়ন করিতে অসমর্থ।

ক্ষত্রিয়

শূদ্র — চতুর্থ শ্রেণীর নাম শূদ্র। শূদ্রগণ কৃষি ও শ্রমজীবি।

বৈশ্য — পঞ্চম শ্রেণীর নাম বৈশ্য। বৈশ্যগণ শিল্প ব্যবসায়ী।

ষষ্ঠ শ্রেণীর নাম চণ্ডাল। চণ্ডালগণ সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট কাজ

চণ্ডাল বাজিকর।

করে। চণ্ডালগণ গান বাদ্য পটু, তাহাদের রমণীরা সুন্দরী।

সপ্তম শ্রেণীর নাম বাজিকর ইত্যাদি।

আরব্য লেখকগণের মতে হিন্দুজাতি ৪২টী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত।

ধর্ম্ম সম্প্রদায়।

কোন কোন সম্প্রদায় অবতার বাদী ছিল। তৎকালে নিরীশ্বর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ও পরিদৃষ্ট হইত। অনেকে শালগ্রাম বা লিঙ্গ উপাসক ছিল। এই সকল শিলার মস্তকে ঘৃত ও তৈল মর্দ্দিত হইত। কোন কোন সম্প্রদায় সূর্য্যের উপাসনা করিত; তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সূর্য্য সৃষ্টি স্থিতি পালনকর্ত্তা। কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে হোমের অনুষ্ঠান দেখা যাইত। কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে বৃক্ষ বা সর্পের পূজা প্রচলিত ছিল। কয়েকটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা হইতে বিরত থাকিয়া সমস্ত মত অস্বীকার করিত।

আমরা আরব্য পর্য্যটকগণের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে বিবরণ সঙ্কলন করিলাম, তাহা হইতে দুইটী বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

ভারতবাসীর কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং বিলাসবিমুখতা।

প্রথম হিন্দু জাতির বিলাস বিমুখতা; দ্বিতীয়, কষ্ট সহিষ্ণুতা। হিন্দু জাতির সাধু সন্ন্যাসীর জীবনে বিলাস বিমুখতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার চরম দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। এতৎসম্বন্ধে বণিক সোলেমান যাহা লিখিয়াছেন, এখানে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "ভারতবর্ষে একশ্রেণীর লোক পর্ব্বতে ও বনে বাস করেন। তাঁহারা কদাচিৎ লোকালয়ে উপস্থিত হন। অনেক সময় তাঁহারা কেবল স্বচ্ছন্দ বনজাত ফল বা শাক শবজি আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। তাঁহাদের অনেকে উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থিতি করেন। অনেকে

সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। আমি একজন সাধুকে এইভাবে দণ্ডায়মান দেখি; তারপর ষোল বৎসর অন্তে পুনর্ব্বার ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাঁহাকে তদবস্থাতেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রৌদ্রতাপে সাধু দ্রবীভূত হয়েন নাই।”

অলবেরুনী।

অলবেরুনী

ভারত বিবরণী লেখক সুপ্রসিদ্ধ অলবেরুনী খিবার অধিবাসী ছিলেন। তিনি মোসলেম্ সমাজে মুনজ্জিম (জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত) বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। স্বদেশ প্রেমে তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত ছিল। এই কারণ সুলতান মাহমুদ গজনা খিবা বিজয়ান্তে তাঁহাকে বন্দী করেন; এই অবস্থায় তিনি গজনীতে নীত হন এবং সেখানে রাজকীয় বন্দীরূপে তাঁহার জীবনের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হয়। তদীয় গ্রন্থাবলী পাঠে অনুমিত হয় যে, তাঁহাকে এই সুদীর্ঘ কাল সুলতান মাহমুদের বিদ্বেষ কলুষিত দৃষ্টির সম্মুখে বাস করিতে হইয়াছিল। তিনি সুলতানের সঙ্গে অনেকবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। পররাজ্য-লোলুপ সুলতানের উদ্দাম তাণ্ডবে অলবেরুনীর জন্মভূমি খিবা এবং তদ্দেশীয়গণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল; অলবেরুনী তাঁহার সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সে উৎপীড়ন ও অত্যাচারের পুনরভিনয় দেখিতে পান। এই কারণ সহৃদয় অলবেরুনী ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষীয়গণের জন্য সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠেন এবং তাদৃশ সমবেদনা বশতঃ ভারতীয় সমাজ এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সকল আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া

সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর তিনি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

অলবেরুনীর গ্রন্থ অতি মূল্যবান। আমরা তদীয় গ্রন্থ পাঠে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সভ্যতা কীদৃশ অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল তাহা জানিতে পারি। অলবেরুনী মোসলমান কুল দুর্ল্লভ উদারতা সহকারে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং বিজ্ঞ ও সমদর্শীর ন্যায় হিন্দু সভ্যতা ও শাস্ত্রের দোষগুণ দেখাইয়াছেন।

অলবেরুনীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত

অলবেরুনীর গ্রন্থ সুবৃহৎ, ইহা অশীতি অধ্যায়ে বিভক্ত। পাঠক গণের কৌতূহল নিবারণ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

ভাষা, ধর্ম্ম এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের পার্থক্য নিবন্ধন হিন্দুজাতি মুসলমানের নিকট রহস্যাবৃত রহিয়াছে। এই রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া হিন্দু জাতির প্রকৃত পরিচয় লাভ করা সহজ নহে। কারণ তাহারা অন্যদেশীয়ের প্রতি সাতিশয় বিরূপ, তাহারা অন্যদেশীয়দিগকে ঘৃণা সূচক ম্লেচ্ছনামে অভিহিত করে। হিন্দুগণ অন্য জাতীয়দের সঙ্গে কোন প্রকার কুটম্বিতা স্থাপন অথবা আহার বিহার করা নিতান্ত দুষ্কার্য্য রূপে গণ্য করিয়া থাকে। যদি কেহ এই প্রকার দুষ্কার্য্য করিয়া একবার অপবিত্র হয়, তবে তাহাকে পবিত্র করিয়া পুনঃগ্রহণ করিবার ভাব হিন্দু জাতির নাই। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুগণ আপনাদের অর্জ্জিত বিদ্যা অন্যকে শিক্ষা দিতে বিমুখ রহিয়াছে। তাহাদের এক বর্ণীয়গণ অন্য বর্ণীয়দের নিকট হইতে আপনাদের অর্জ্জিত বিদ্যা গোপন রাখিবার জন্য সাতিশয় যত্নশীল; এরূপ অবস্থায় বিদেশীয়গণের পক্ষে কোন প্রকার তত্ত্ব লাভ একরূপ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

হিন্দু জাতি, সঙ্কীর্ণতা

হিন্দু জাতির এরূপ বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে তাহাদের দেশ ব্যতীত আর দেশ নাই, তাহাদের জাতি ব্যতীত আর জাতি নাই, তাহারা ব্যতীত আর কোন সৃষ্ট জীব জ্ঞান অথবা বিদ্যার অধিকারী নহে। তাহারা অত্যন্ত অহঙ্কারী ; যদি তাহাদিগকে বলা যায় যে, খোরসান অথবা পারস্যে বিদ্যার চর্চ্চা আছে এবং সেখানে বিদ্বান ব্যক্তি বাস করেন, তবে তাহারা উহা অলীক বা অজ্ঞতা প্রসূত বলিয়া তুচ্ছ করে। যদি হিন্দুগণ অন্যদেশ ভ্রমণ করিতে এবং অন্য জাতির সহিত মিলিত হইতে আরম্ভ করে, তবে এই সঙ্কীর্ণতার পরিহার হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কারণ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ অনেক পরিমাণে উদার চিত্ত ছিলেন, এরূপ প্রমাণের অভাব নাই।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের উত্তরে পর্ব্বতমালা দণ্ডায়মান ; দক্ষিণে ভারত মহা-সাগর ; উত্তরস্থ পর্ব্বতমালা হইতে বহুসংখ্যক নদনদী প্রবাহিত হইতেছে। যদি ভারতবর্ষের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তবে প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর অতীত-কালে এই দেশের অধিকাংশ স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, তারপর কালক্রমে ঐ সকল নদনদীর প্রবাহসঞ্চিত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত হইয়াছে।

কনৌজ

কনৌজ ভারতবর্ষের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত ; এই কারণ কনৌজের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী দেশ মধ্যদেশ নামে খ্যাত। কনৌজ যে কেবল ভৌগলিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থানুসারেই ভারতবর্ষের মধ্য বিন্দুরূপে পরিগণিত, তাহা নহে। রাজনৈতিক হিসাবেও ভারতবর্ষের কেন্দ্র স্বরূপ সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। কারণ পুরাকালে এই কনৌজ রাজ্য ভারতবর্ষের যোগ্যতম রাজন্যগণ এবং বীরবৃন্দের বাসভবন ছিল। কনৌজ গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সুবৃহৎ নগর। বর্ত্তমান সময়ে ইহার অধিকাংশই ভগ্নদশায় পতিত

হইয়াছে; কারণ রাজধানী গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ বারি নামক নগরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মথুরা নগরী ভারতবর্ষের একটি সুপ্রসিদ্ধস্থান। বাসুদেবের কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়াই ঐ নগরী তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মথুরা

কনৌজ ও মথুরার উত্তরদিকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে স্থানেশ্বর অবস্থিত।

স্থানেশ্বর

কনৌজ হইতে দক্ষিণদিকে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগ বৃক্ষ অবস্থিত; এইস্থানে হিন্দুগণ ধৰ্ম্মলাভ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় নানা প্রকার শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে।

প্রয়োগের অক্ষয় বট

কনৌজ রাজ্যের রাজধানী বারি হইতে যাত্রা করিলে গঙ্গানদীর পূর্ব্বদিকে অযোধ্যা এবং চিরখ্যাত বারাণসা দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যা ও বারাণসী

বারাণসী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলে গঙ্গনদীর তীরে পাটলী-পুত্র, জল্ল, দুগামপুর এবং গঙ্গাসায়র প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গাসায়র নামক স্থানে গঙ্গানদী সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

পাটলীপুত্র, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান

মথুরা হইতে উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলে অল্প দূর দূর বহু-সংখ্যক পল্লীগ্রাম অতিক্রম করিতে হয়; এইরূপ একটি স্থানের নাম ভাইলসান। এইস্থানে ভাইলসান নামক দেবমন্দির স্থাপিত আছে। ভাইলসান হিন্দুগণের নিকট অতি প্রাসদ্ধ স্থান। ভাইলসান হইতে অনতিদূরে অরদিন নামক স্থান অবস্থিত। অরদিনে মহাকাল নামক দেবমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

উজ্জয়িনী মহাকালমূর্ত্তি

উজ্জয়িনীর পশ্চিমদিকে ধার নামধেয় নগর অবস্থিত। এই নগর মালব রাজ্যের রাজধানী।

ধার

ধার নগর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলে মহারাষ্ট্র দেশে উপনীত হইতে হয়; তারপর কঙ্কনদেশ, কঙ্কন-দেশের রাজধানীর নাম টান। কঙ্কন দেশের সীমান্তে সমুদ্র।

মহারাষ্ট্র ও কঙ্কন

(গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্র উপকূলে) প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির স্থাপিত ছিল। এইস্থান হইতে অনতিদূরে (গুজ-রাটের রাজধানী) অনহিলবার (পত্তন) অবস্থিত।

গুজরাট

অনহিলবার হইতে দক্ষিণদিকে লার দেশে উপনীত হইতে হয়। তারপর বিরোজ এবং রিহঞ্জুর নামক রাজ্যদ্বয়ের রাজধানী পাওয়া যায়। এই উভয় নগরের পাদমূলই সাগর জলরাশি দ্বারা বিধৌত হইতেছে।

লার প্রভৃতি দেশ

পশ্চিমদিকে মুলতান নগর অবস্থিত। মুলতান নগরের পশ্চাতে ভাটি। ভাটি হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে গমন করিলে অরোর নামক নগরে উপনীত হইতে হয়, এই নগর সিন্ধুনদের দুই বাহুর মধ্যস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে। অরোর নগর পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া অগ্রসর হইলে সিন্ধুসাগর মিলন স্থল আসিয়া পড়ে, সেখানে লোহরানি নামক নগরী দেখিতে পাওয়া যায়।

মুলতান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান

কাশ্মীর চতুর্দ্দিকে শৈলমালা পরিবেষ্টিত, প্রকৃতির দুর্ভেদ্যস্থানে অবস্থিত। এই দেশের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ হিন্দুজাতির শাসনাধীন। পশ্চিমাংশে কতিপয় ক্ষুদ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠিত আছে। উত্তর ভাগ এবং পূর্ব্বভাগের কিয়দংশে খোতান ও তিব্বতের তুর্কিগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কাশ্মীরের

কাশ্মীর।

অধিবাসীরা পদব্রজে গমনাগমন করে, তাহাদের দেশে হস্তী বা অন্য কোন বাহনের প্রচলন নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পাল্কীতে আরোহণ করিয়া গমন করেন। পূর্ব্বকালে তুর্কিগণের উপদ্রবে কাশ্মীরদেশ বিধ্বস্ত হইয়াছে। কাশ্মীরবাসীরা স্বদেশ রক্ষার জন্য সাতিশয় মনোযোগী, কাশ্মীর দেশের সমস্ত পথ ঘাট সুরক্ষিত। তজ্জন্য এই দেশে বিদেশীয়গণের পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে সময় সময় দুই একজন বিদেশীয় (প্রধানতঃ ইহুদি) বণিক দেখিতে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে অপরিচিত হিন্দুর পক্ষেই প্রবেশ নিষিদ্ধ; এরূপ স্থলে অন্য জাতীয় লোকের যে প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। কাশ্মীরের প্রধান নগর ঝিলাম নদীর তীরে অবাস্থত, এই নগর নদীর উভয় তীরেই বিস্তৃত এবং সাঁকো দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত।

ধর্ম্ম, ঈশ্বরের স্বরূপ।

হিন্দুগণের পরমেশ্বর সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ; তিনি এক, অনন্তকাল স্থায়ী; তাঁহার আরম্ভও নাই, শেষও নাই; তিনি আপন ইচ্ছামত কর্ম্মশীল, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞানবান, জীবন্ত, জীবনপ্রদ, শাসক, পালন কর্ত্তা; তাঁহার রাজশক্তি অসাধারণ এবং সমস্ত সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যের অতীত; তিনি কোন পদার্থের সদৃশ নহেন, কোন পদার্থও তাঁহার সদৃশ নহে।

শিক্ষিত হিন্দুগণের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা কিরূপ, তাহা বর্ণিত হইল। সাধারণ হিন্দুদের ঐশ্বরিক ধারণা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে নানাপ্রকার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাদের অনেকমত ঘৃণার্হ। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই; পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন হিন্দুশাস্ত্রবেত্তা পরমেশ্বরকে বিন্দু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, শারীরিক গুণ সকল তাহাতে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু অজ্ঞ হিন্দুগণ এহ

বাক্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া ঠিক করিয়াছে যে, পরমেশ্বর বিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র। কোন কোন হিন্দু এই তুলনায় অতৃপ্ত হইয়া পরমেশ্বরকে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ এবং দশ অঙ্গুলি পরিমিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। যদি একজন অজ্ঞ হিন্দু শ্রবণ করে যে, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বদর্শী; তবে সে ব্যক্তি মনে করে যে, চক্ষু ব্যতীত দৃষ্টি অসম্ভব, এক চক্ষু অপেক্ষা দুই চক্ষুতে দৃষ্টি অধিকতর পরিষ্কার হয়, অতএব পরমেশ্বর সহস্র লোচন।

তেত্রিশ কোটি দেবতা

হিন্দুগণ দেবোপাসক; তাহাদের শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। এই সকল দেবতায় মানব সুলভ আহার বিহার এবং মৃত্যু আরোপিত হইয়াছে। এই দেবগণের অন্তস্তলে তিনটি মূলশক্তি বিদ্যমান; ব্রহ্মা, নারায়ণ ও রুদ্র। এই তিন শক্তির মিলিত নাম বিষ্ণু। ব্রহ্মা আদি কারণ, নারায়ণ পালন কর্ত্তা এবং রুদ্র বা শঙ্কর সংহার কর্ত্তা। হিন্দু জাতির ধর্ম্মমত সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে, যে তত্ত্বে উপনীত হইতে হয়, তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

দেবস্থান, সোমনাথ

এইরূপ কথিত আছে যে, রোহিণীর প্রতি অনুরাগাধিক্য নিবন্ধন চন্দ্রদেবের অপরপত্নী বৃন্দ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া পিতা প্রজাপতির নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। প্রজাপতি তৎশ্রবণে পরিতপ্ত হইয়া উঠেন, তাঁহার অভিশাপে চন্দ্রদেব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। অতঃপর চন্দ্রদেব অনুতপ্ত চিত্তে প্রজাপতির শরণাপন্ন হন এবং তদীয় আদেশে সিন্ধুদেশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মহাদেবের লিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সে দারুণ মহাব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করেন। সোম অর্থাৎ চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া

এই মূর্ত্তির নাম সোমনাথ হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণের বিশ্বাস ছিল যে, চন্দ্র প্রত্যহ এই লিঙ্গ মূর্ত্তির সেবা করিতেন। কারণ চন্দ্রের গতি নিবন্ধন সাগরোপকূলবর্ত্তী সোমনাথ মন্দির দিবা রাত্রিতে দুইবার প্লাবিত হইয়া যাইত, এবং তাহাতে লিঙ্গ মূর্ত্তির স্নান ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। সোমনাথের উপাসকগণ প্রত্যহ এক কলস গঙ্গাজল ও এক সাজি কাশ্মীর কুসুম আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা করিত। হিন্দুরা বিশ্বাস করিত যে, সোমনাথ দেবের কৃপায় লোকের অচিকিৎস্য বদ্ধমূল ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ ঘটে। সোমনাথ লিঙ্গ মূর্ত্তির তাদৃশ সর্ব্বব্যাপি প্রসিদ্ধিলাভের প্রকৃত কারণ এই যে, তদীয় মন্দির সমুদ্র বন্দরের পার্শ্ববর্ত্তী ছিল এবং সে পথে সুদূর চীন প্রভৃতি দেশগামী যাত্রিগণ গমনাগমন করিতেন। ৪১৬ হিজিরী অব্দে সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে লিঙ্গ মূর্ত্তির ঊর্দ্ধভাগ চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইয়াছিল। অধোভাগ গজনীতে নীত হয়। সেখানে ভগ্নমূর্ত্তির একাংশ নগরস্থিত ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অপরাংশ গজনীর মসজিদের সোপানে স্থাপিত আছে।

আদিত্য।

মুলতানের সূর্য্যমন্দির সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এইস্থানে সর্ব্বদিক হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী আগমন করিত। মন্দিরের দেব মূর্ত্তির নাম আদিত্য ছিল। মোহাম্মদ মুলতান নগর অধিকার করিয়া তাহার বিপুল সমৃদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হন এবং তাদৃশ সমৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। তিনি জানিতে পারেন যে, আদিত্য মন্দিরের সর্ব্বব্যাপি প্রতিষ্ঠা নিবন্ধন অগণ্য জন সমাগমই মুলতান নগরকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। এই কারণ তিনি বিপুল আয়ের উপায় স্বরূপ আদিত্য মূর্ত্তি অক্ষত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বিজয়ী জনম ইবন সইবান সে

মূর্ত্তি ভগ্ন করেন। বর্ত্তমান সময়ে আদিত্য মন্দিরের পার্শ্বে মোসলমানের জুমা মসজিদ স্থাপিত আছে।

স্থানেশ্বর হিন্দুজাতির একটি অতি পবিত্র স্থান। এই স্থানে চক্রস্বামী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহারাজ ভরত যুদ্ধের স্মরণ চিহ্ন রূপে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুলতান মাহমুদ চক্রস্বামী দেব মন্দিরের ধ্বংস সাধন করেন এবং দেবমূর্ত্তিটি গজনীতে লইয়া যান।

চক্রস্বামী।

কাশ্মীরের সারদা মূর্ত্তির প্রসিদ্ধি সুদূরব্যাপী; এই মূর্ত্তি কাষ্ঠ নির্ম্মিত। তদ্দর্শন জন্য ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে যাত্রিগণ দলে দলে আগমন করিয়া থাকে।

সারদা।

মহদ্ব্যক্তিগণ দেব মূর্ত্তি সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের উপলক্ষেই ঐ সকল মূর্ত্তির নিকট হিন্দুগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছে। যে সকল উপাদানে ঐ সকল মূর্ত্তি গঠিত, তাহাতে এরূপ কিছু নাই, যাহা হিন্দুগণের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে। মুলতান নগরের আদিত্য মূর্ত্তি কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। রামচন্দ্র লঙ্কা বিজয় শেষ করিয়া যে শিবমূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন, তাহা বালুকা নির্ম্মিত ছিল।

মন্তব্য।

ব্রাহ্মণের জীবন চারি আশ্রমে (১) বিভক্ত। ব্রাহ্মণ কুমারগণ সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করিয়া যজ্ঞোপবীত, দর্ভ এবং দণ্ডধারণ করিয়া থাকেন এবং তার পর বেদাদি অধ্যয়ন জন্য গুরু গৃহে গমন করেন। গুরুগৃহে বাস কাল অষ্টাদশ বৎসর। এই সময় তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম জন্য নানা প্রকার কঠোর নিয়ম পালন করিয়া থাকেন এবং আচার্য্যের সমস্ত গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা প্রতিদিন মধ্যাহ্নে বা সায়াহ্নে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করেন।

ব্রাহ্মণ আশ্রম চতুষ্টয়

(১) ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

পঞ্চাধিক গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ নিষিদ্ধ। ভিক্ষালব্ধ অন্ন আচার্য্যকে প্রদত্ত হয়। তিনি ইচ্ছামত তৎসমুদয়ের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট শিষ্যবৃন্দকে প্রত্যর্পণ করেন; তাঁহারা তদ্দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকেন।

অধ্যয়ন সমাপন অন্তে ব্রাহ্মণ গণ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়েন এবং দ্বাদশ বর্ষানধিকা কন্যার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। সন্তান লাভ তাহাদের লক্ষ্য। কিন্তু মাসান্তে একদিন অর্থাৎ রজঃ দর্শনের চতুর্থ দিবস স্ত্রী সহবাসের নিয়ম। ব্রাহ্মণগণের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পঞ্চবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। শিষ্যবৃন্দের স্বেচ্ছা প্রদত্ত দক্ষিণা, পৌরহিত্য কার্য্যের দক্ষিণা, রাজা এবং ধনবানের দান এবং অযত্নলব্ধ শস্য ও ফল। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্য নিষিদ্ধ না হইলেও তাদৃশ কার্য্য প্রশস্ত নহে; কিন্তু ঋণ দান ও কুসীদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। গৃহে অগ্নিরক্ষা এবং বাদ্য সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

ব্রাহ্মণগণ পঞ্চবিংশতি বৎসর গার্হস্থ্য আশ্রমে যাপন করিয়া নির্জ্জন বনে গমন করেন এবং তথায় পুনর্ব্বার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় কেবল মাত্র অরণ্য জাত শাক, ফল ও মূল দ্বারা তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণ পত্নীগণও পতি সমভিব্যাহারে বনে গমন করেন। বানপ্রস্থ আশ্রমে তাঁহাদিগকে সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়।

অতঃপর ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। তৎকালে তাঁহারা গৈরিক বসন ব্যবহার করেন এবং সর্ব্বসঙ্গ শূন্য হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্ম চিন্তায় সমাহিত হন। এই সময় তাঁহাদিগকে কেহ কোন বস্তু দান করিলে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও পরদিনের জন্য সঞ্চিত হয় না।

সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাগ দ্বেষ ক্রোধাদির অতীত হইয়া তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ মোক্ষ চিন্তায় যাপন করেন।

ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ কর্ম্ম সর্ব্বসম্মত। লোক সেবা, ভিক্ষা প্রদান, দান গ্রহণ, অধ্যয়ন এবং হোম সম্পাদন। তাঁহারা দিবা রাত্রিতে মাত্র দুই বার ভোজন করেন, একবার মধ্যাহ্নে, দ্বিতীয় বার রাত্রি সমাগমে। আহারের পূর্ব্বে এক বা ততোধিক অতিথির সৎকার. গো ও পক্ষীর সেবা এবং হোম সম্পাদন জন্য অন্ন সঞ্চিত করিয়া রাখিতে হয়। তারপর তাঁহারা অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন পূর্ব্বক ভোজন করেন। ভোজনাবশিষ্ট গৃহের বহির্ভাগে রাখিয়া দেওয়া হয়। পশু পক্ষী বা মনুষ্য, কাহারও উদর পূর্ত্তির উদ্দেশ্যেই এই প্রথা প্রচলিত আছে।

ব্রাহ্মণগণ সিন্ধুনদ এবং শরমনবতি নদীর মধ্যগত দেশে বাস করেন। এই সীমা অতিক্রম করিয়া তুর্কি বা কর্ণাট জাতি অধ্যুষিত দেশে গমন নিষিদ্ধ। তাঁহারা পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিগন্তবর্ত্তী সাগর মেখলা পরিবেষ্টিত দেশে অবশ্য বাস করিবেন। ভারতীয়গণের ধারণা যে, যে দেশে কৃষ্ণসার হরিণ বিচরণ করেনা, এবং কুশ জন্মেনা, তাহা ব্রাহ্মণদের বাসের উপযোগী নহে। এইরূপ দেশে গমন করিলে তাঁহাদিগকে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়।

ক্ষত্রিয়গণ বেদ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে বেদের অধ্যাপন নিষিদ্ধ। তাঁহারা দেশ শাসন ও দেশ রক্ষা করেন। কারণ এই কার্য্য সাধন জন্যই তাঁহাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়

ক্ষত্রিয়গণ এক গ্রন্থি তিন গুচ্ছ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। তাঁহাদিগকে ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া এই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়। ক্ষত্রিয়গণ হোম সম্পাদন করেন।

বৈশ্য ও শূদ্রের পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

ব্রাহ্মণ সেবাই শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কৃষি, ভূমি কর্ষণ এবং বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি। দুই গ্রন্থি এক সূত্র যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিবার অধিকার বৈশ্যগণের আছে। যদি কোন শূদ্র দারিদ্র্য সত্বেও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে অভিলাষী হয়, তবে তাহাকে সূত্র ধারণ করিতে দেওয়া হয়। বৈশ্যগণ ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কোন বৈশ্য বা শূদ্র বেদ পাঠ করিলে তাহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে হয়। বিচার কালে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে রাজা তদীয় জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করেন। বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে হোম সম্পাদন নিষিদ্ধ। কিন্তু তাহারা ভগবানের ধ্যান, ভিক্ষাদান এবং লোক সেবা করিতে অধিকারী।

বৈশ্য ও শূদ্র

শূদ্র অপেক্ষা নিম্নপর্য্যায়ভুক্ত হিন্দুরা অন্ত্যজ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা আট শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের গৃহীত ব্যবসায়ানুসারে এই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। যথা, (১) চর্ম্মকার (২) রজক, (৩) বাজিকর, (৪) নাবিক, (৫) ধীবর, (৬) শিকারী, (৭) তন্তুবায় এবং (৮) বাঁশকর। এতন্মধ্যে রজক, চর্ম্মকার এবং তন্তুবায় ব্যতীত আর পাঁচ শ্রেণীতে পরস্পরে বিবাহের নিয়ম আছে। প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের সহিত এই সকল অন্ত্যজ জাতীয় লোকের একত্র বাস করিবার নিয়ম নাই। তাহারা নগর বা গ্রামের বহির্ভাগে অদূরে বাস করে।

অন্ত্যজবর্ণ

হাড়ি, ডোম এবং চণ্ডাল নামে বহু সংখ্যক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা হিন্দু জাতির বর্ণ ও শ্রেণীর বহির্ভূত। এই সকল লোক নগর বা গ্রামের ময়লা পরিষ্কার করা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্যে নিযুক্ত আছে। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল সঙ্কর জাতি নামে পরিচিত।

সঙ্কর জাতি

এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তাহার অপরাধ হইয়া থাকে। এই অপরাধ চৌর্য্যাপরাধের প্রায় তুল্য। যদি ব্রাহ্মণ ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হন, অথবা শূদ্র ভূমি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তবে ঐরূপ অপরাধ হয়।

মন্তব্য

ভারতবর্ষে জাতিভেদ এবং বর্ণভেদ প্রথা নিবন্ধন নানা প্রকার বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব ছাড়িয়া দিলে সকল মনুষ্যই সমান। বাসুদেব মুমুক্ষুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "তীক্ষ্ণদর্শী ব্যক্তির বিচারে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সমান, শত্রু মিত্র, সত্যবাদী প্রতারক, এমন কি, সর্প নকুলে কোন ভেদ নাই। তীক্ষ্ণ দর্শীর নয়ন সমক্ষে সকল পদার্থই তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কেবল অজ্ঞের নিকটই ভেদ ও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।"

তীর্থ দর্শন হিন্দু জাতির অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। তবে তীর্থ দর্শন করিলে পুণ্য সঞ্চয় ও সদ্গতি হইয়া থাকে। হিন্দুগণ পুণ্য ভূমি দর্শন, সর্ব্বজনারাধ্য দেবমূর্ত্তির আরাধনা অথবা পবিত্রতোয়া নদীতে অবগাহন করিবার জন্য তীর্থ স্থানে গমন করে। হিন্দুগণ তীর্থক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক দেবমূর্ত্তির পূজা অর্চ্চনা, স্তব পাঠ, উপবাস ও ব্রাহ্মণ, পুরোহিত এবং দীন দরিদ্রদিগকে ধন দান এবং নদীতে অবগাহন করে। অতঃপর তাহারা মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

তীর্থ দর্শন

তীর্থ স্থান মাত্রেই যাত্রীগণের অবগাহন জন্য প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল দীর্ঘিকা খনন এবং তৎসমুদয়ের সোপানাবলী নির্ম্মাণকালে হিন্দুগণ অদ্ভুত স্থাপত্য কৌশলের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

অনেক স্থান ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া হিন্দুর নিকট

তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বারাণসী এইরূপ একটি তীর্থক্ষেত্র।

বারাণসী।

এই স্থানে সন্ন্যাসীগণ আগমন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন অবস্থিতি করেন। বারাণসী ধামে মৃত্যু হইলে পরকালে উত্তম লোক লাভ হয়। অপরাধী ব্যক্তি বারাণসী ধামে প্রবেশ করিতে পারিলে স্বীয় অপরাধের জন্য সমস্ত দণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। বারাণসীর ঈদৃশ পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হইবার কারণ এই যে, একদা চতুরানন ব্রহ্মার সহিত মহাদেব শঙ্করের কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহারা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মার একটি মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইয়া পড়ে। শঙ্কর জয়ের চিহ্ন স্বরূপ ব্রহ্মার মুণ্ডটি সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। একদা তিনি মুণ্ড সহকারে বারাণসীতে আগমন করেন। এই স্থানে মুণ্ডটি হস্তচ্যুত করিয়া অদৃশ্য হন।

স্থানেশ্বর।

স্থানেশ্বর অথবা কুরুক্ষেত্র হিন্দুর আর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে কুরু নামক একজন কৃষক বাস করিতেন। তিনি ধার্ম্মিক ও পবিত্র চরিত্র ছিলেন, দৈব বলে নানা প্রকার অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক ও পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির বাসস্থান ছিল বলিয়া কুরুক্ষেত্র তীর্থ রূপে সম্মানিত হইতেছে। বিশেষতঃ ভারত যুদ্ধ এবং দুষ্কৃতদের বিনাশকালে এই স্থানে বাসুদেবের লীলা প্রকটিত হইয়াছিল;

মথুরা।

মথুরা নগরীও একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান; এই স্থানে অসংখ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। মথুরার অদূরবর্ত্তী নন্দগোলা নামক স্থানে বাসুদেবের জন্ম ও বাল্যকাল অতি-বাহিত হইয়াছিল, ইহাই মথুরার তীর্থ স্থান রূপে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ।

কাশ্মীর।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণ তীর্থ দর্শন উপলক্ষে কাশ্মীরে গমন করিতেছে।

মুলতান। মুলতানের দেব মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে হিন্দু যাত্রীরা দলে দলে সেখানে গমন করিত।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে উপবাস স্বেচ্ছাকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্র। উপবাসের পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে আহার নিষিদ্ধ। উপবাসের দিন উপবাসকারী হিন্দুগণ দন্তমার্জ্জন ও স্নান অন্তে দিবসের কর্ত্তব্য কার্য্যে নিরত হয়। তাহারা হস্তে জল গ্রহণ করিয়া তাহা চারিদিকে ছিটাইয়া দেয়। অতঃপর যে দেবতার প্রীতি কামনায় উপবাস করা হইতেছে, তাহারা তদীয় নাম জপ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তদবস্থায় সমস্ত দিন যাপন করে। পর দিন সূর্য্যোদয় হইলে তাহারা আহার করিয়া থাকে।

উপবাস

উপবাসের প্রকার ভেদ আছে। যাহারা একাহারী, তাহাদের উপবাসের নাম এক নক্ত। এই সকল ব্যক্তি মাত্র মধ্যাহ্নে ভোজন করেন। আর এক প্রকার উপবাসের নাম কৃচ্ছ্র। এই উপবাসকালে প্রথম দিন মধ্যাহ্নে ভোজন করিবার নিয়ম আছে; পর দিন সন্ধ্যা-কালে আহার করিতে হয়; তৃতীয় দিন যাচ্ঞা ব্যতীত দৈবক্রমে কোন আহার্য্য লব্ধ হইলে তদ্দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ বিধি। চতুর্থ দিন সম্পূর্ণ উপবাস। কৃচ্ছ্র উপবাস অপেক্ষা পরাক উপবাস কঠিন। প্রথম তিন দিন কেবল মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিতে হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে তিন দিন সন্ধ্যাকালে ভোজন করিবার নিয়ম। সপ্তম দিবস হইতে ক্রমাগত তিন অহোরাত্র সম্পূর্ণ উপবাস করিতে হয়। ইহার নাম পরাক উপবাস। এখন চন্দ্রায়ন উপবাসের বিষয় লিখিতেছি। পূর্ণিমা তিথি হইতে চন্দ্রায়ন উপবাসের আরম্ভ। এইদিন সম্পূর্ণ উপবাস। পর দিন কেবল এক গ্রাস আহার্য্য গ্রহণ করিতে হয়, তৃতীয় দিন দ্বিগুণ, চতুর্থ দিন ত্রিগুণ; এই ভাবে ক্রমশ: আহার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। পুনর্ব্বার অমাবস্যা তিথিতে উপবাস

এবং তারপর আবার পূর্ব্বোক্ত ভাবে আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি। এইরূপ ক্রমাগত চলিবে। আর এক প্রকার উপবাসের নাম মাস উপবাস। ইহাতে পূর্ণ এক মাস উপবাস করিতে হয়। এক এক মাসের উপবাসে পর জন্মে এক এক রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে বলিয়া হিন্দুদের বিশ্বাস।

চৈত্র,—ধন লাভ এবং সন্তান বর্গের উৎকর্ষবশতঃ আনন্দ লাভ।

বৈশাখ,—স্ববংশের নেতৃপদ এবং সৈন্য শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠতা লাভ।

জ্যৈষ্ঠ,—রমণীকুলের প্রীতি লাভ।

আষাঢ়,—ধন লাভ।

শ্রাবণ,—জ্ঞান লাভ।

ভাদ্রপদ,—স্বাস্থ্য, সাহস, ধন এবং গো লাভ।

আশ্বযুজ,—জয় লাভ।

কার্ত্তিক,—লোক প্রিয়তা লাভ এবং মনস্কামনা সিদ্ধি।

মার্গশীর্ষ,—সুদৃশ্য এবং উর্ব্বর দেশে জন্ম।

পৌষ,—যশোলাভ।

মাঘ,—অগণ্য ধন লাভ।

ফাল্গুন,—ভালবাসা লাভ।

যিনি কেবল দ্বাদশ দিন উপবাস ভঙ্গ করিয়া একবৎসর ব্যাপী উপবাস করিতে পারেন, তাঁহার দশ সহস্র বৎসর স্বর্গলোক বাস এবং তারপর সর্ব্বমান্য মহদ্বংশে জন্ম হয়।

প্রত্যেক মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী এবং একাদশী তিথিতে উপবাস করিবার নিয়ম আছে। নির্দ্দিষ্ট দিন সংখ্যাধিক মাস দুর্ভাগ্য সূচক বলিয়া সে মাসে এই উপবাস নিষিদ্ধ।

চৈত্র মাসের ষষ্ঠ দিনে সূর্য্যের প্রীতি কামনায় হিন্দুগণ উপবাস করিয়া থাকে।

আষাঢ় মাসে অনুরাধা নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান দিনে বাসুদেবের

শয়ন আরম্ভ হয়। এই দিন উপবাস করিবার নিয়ম আছে। এই দিবস বৈষ্ণবগণের পক্ষে মৎস্য, মাংস, মিষ্টান্ন ভোজন এবং স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ ও একাহার প্রশস্ত।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সোমনাথের প্রীতিকামনায় হিন্দুগণ উপবাস করিয়া থাকে।

ভাদ্রপদ মাসের পঞ্চম দিনে সূর্য্যের প্রীতিকামনায় হিন্দুগণ উপবাস করিয়া থাকে।

ভাদ্রপদ মাসে রোহিণী নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান দিনে বাসুদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণ ঐদিন হিন্দুগণ উপবাস করিয়া থাকে। মতান্তরে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান হইলে উপবাস করিতে হয়, কারণ বাসুদেব ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আশ্বয়ুজ মাসে কন্যা রাশিতে সূর্য্যের প্রবেশ কালে উপবাস করিবার নিয়ম আছে।

আশ্বয়ুজ মাসের অষ্টম দিনে হিন্দুগণ ভগবতীর মঙ্গল কামনায় উপবাস করিয়া থাকে।

কার্ত্তিক মাসে রেবতী নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান দিনে বাসুদেবের শয়ন হইতে উত্থান হয়। এই উপলক্ষে হিন্দুগণ উপবাস করিয়া থাকে। মতান্তরে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে রেবতী নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান হইলে উপবাস করিতে হয়। এই উপবাস দিনে হিন্দুগণ গোবর দ্বারা গাত্র মার্জ্জন এবং পরদিন গোবর, গোমূত্র এবং গোদুগ্ধ দ্বারা উপবাস ভঙ্গ করে।

পৌষ মাসের ষষ্ঠ দিনে সূর্য্যের প্রীতিকামনায় হিন্দুগণ উপবাস করিয়া থাকে।

মাঘ মাসের তৃতীয় দিনে কেবল হিন্দুনারীগণ উপবাস করে; এই

দিন তাহারা শ্বশুর কুলস্থ অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজন দিগকে উপহার প্রদান করিয়া থাকে।

আমরা ভারতবর্ষের জাতীয় উৎসবের বর্ণনা করিতেছি।

হিন্দোলি চৈত্র উৎসব ; চৈত্র মাসের একাদশ দিবসে এই উৎসব হইয়া থাকে; এই দিবস হিন্দুগণ বাসুদেবের মন্দিরে গমন করে, সেখানে বাসুদেবের মূর্ত্তি চতুর্দ্দোলে স্থাপন করিয়া ঝুলন হয়। হিন্দুদের গৃহেও বাসুদেবের ঝুলন হয়; তাহারা সমস্ত দিবস এই উৎসবে ব্যাপৃত থাকে এবং আমোদ করে।

উৎসব।

বসন্ত উৎসব ; চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হইয়া থাকে; বসন্তোৎসব ভারতীয় রমণীবৃন্দের অতীব প্রিয়; তাহারা তদুপলক্ষে রত্নাভরণে দেহ সজ্জিত করে এবং পতির নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হয়।

চৈত্র ষষ্ঠী উৎসব ; চৈত্র মাসের দ্বাবিংশ দিবসে দেবী ভগবতীর উদ্দেশ্যে এই উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই দিন নরনারীগণ স্নান ও দানাদি করে।

গৌরী তৃতীয়া উৎসব ; বৈশাখ মাসের তৃতীয় দিবসে হিন্দুনারীবৃন্দ দেবী গৌরীর উদ্দেশ্যে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা স্নানান্তে বসন ভূষণে সজ্জিত হয় এবং তার পর, গৌরী মূর্ত্তির সম্মুখে পূজা এবং দীপারতি করে। এই দিন তাহারা সুগন্ধ দান করে এবং ঝুলন ক্রীড়ায় রত হয়। গৌরী তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হয়; পর দিন রমণীবৃন্দ অন্ন বিতরণ করিয়া তদনন্তর আহার করে।

কৃষি উৎসব ; বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। কৃষি কার্য্য

আরম্ভের পূর্ব্বে এই উৎসব। হিন্দুগণ কৃষিক্ষেত্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ষোলটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে; এক এক শ্রেণীতে এক এক জন ব্রাহ্মণ বলি দান ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

বসন্ত উৎসব; বৈশাখ মাসে যে দিন দিবা রাত্রি সমান হয়, সে দিন হিন্দুগণ একটি উৎসব করে; এই উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থাকে।

ফল উৎসব; জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিবসে অথবা অমাবস্যা তিথিতে এই উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে হিন্দুগণ ভাবি মঙ্গল কামনায় সর্ব্ব প্রকার ফল নদীতে অর্পণ করে।

রূপপঞ্চ উৎসব; জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রূপপঞ্চ উৎসবের অনুষ্ঠান। হিন্দুনারীগণ এই উৎসব সম্পাদন করে।

আহারী উৎসব; এই উৎসব সমগ্র আষাঢ় মাস ব্যাপী; দান আহারী উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই সময় গৃহস্থেরা নূতন হাঁড়ি কলসও সংগ্রহ করিয়া রাখে।

পূর্ণিমা উৎসব; শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া এই উৎসব নিষ্পন্ন হয়।

ভাদ্রপদ মাসে অনেকগুলি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, আমরা তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

পিতৃপক্ষ উৎসব; মঘা নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান দিবস হইতে এই উৎসব আরম্ভ হয় এবং একপক্ষ কাল স্থায়ী থাকে; এই সময় হিন্দুগণ পিতৃলোকের প্রীত্যর্থ দান করে।

হরবালি (?) উৎসব; তৃতীয় দিবসে হিন্দুনারীগণ এই উৎসব সম্পন্ন করে। উৎসবের কতিপয় দিবস পূর্ব্বে তাহারা সাজিতে মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া তদুপরি নানা প্রকার বীজ রোপন করে। উৎসবের দিবস তাহাতে অঙ্কুর উদ্গম হয়। হিন্দুনারীগণ উহাতে গোলাপ

পুষ্প এবং সুগন্ধ অর্পণ করিয়া সমস্ত রাত্রি নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে যাপন করে এবং পর দিন প্রাতে ঐ সকল সাজি জলে ধৌত করিয়া নিজেরা স্নান করে এবং তার পর ধন বিতরণ করিয়া উৎসব শেষ করে।

গাইহউ (?) উৎসব; ষষ্ঠ দিবসে এই উৎসব হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে কয়েদীকে আহার দ্রব্য প্রদত্ত হয়।

ধ্রুবগৃহ (?) উৎসব; অষ্টম দিবসে গর্ভবতী এবং সন্তানাকাঙ্ক্ষাবতী নারীগণ সুস্থ সন্তান কামনায় এই উৎসব করিয়া থাকে।

পারভূতি উৎসব; একাদশ দিবসে এই উৎসব সম্পাদিত হয়। এতদুপলক্ষে হিন্দুগণ ব্রাহ্মণদিগকে নূতন উপবীত দান করে।

করার (?) উৎসব; কৃষ্ণ পক্ষীয় প্রতিপদ তিথিতে এই উৎসবের আরম্ভ। এই উৎসব সপ্তাহ ব্যাপী হইয়া থাকে। উৎসবের প্রথম দিবসে হিন্দুগণ স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে বসন ভূষণে সজ্জিত করে, বালক বালিকাগণের ক্রীড়া কৌতুকে ও আনন্দ কোলাহলে গৃহ উৎসবময় হইয়া থাকে। সপ্তম দিবসে গৃহস্থগণ স্বয়ং বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া উৎসব করে। মাসের অবশিষ্ট দিনেও উৎসব থাকে; এই সময় তাহারা পুত্র কন্যাদিগকে প্রত্যহ সজ্জিত করে, ব্রাহ্মণদিগকে দান প্রদত্ত এবং লোক সেবা হইয়া থাকে।

বাসুদেবের জন্ম উৎসব; রোহিণী নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান দিবস হইতে এই উৎসব আরব্ধ হইয়া তিন দিবস স্থায়ী হয়।

মহা নবমী উৎসব; আশ্বযুজ মাসের প্রথম ভাগে মহানবমী উৎসব হইয়া থাকে। মহানবমী উৎসব উপলক্ষে হিন্দুগণ ইক্ষু এবং নানাবিধ ফল ভগবতীর সম্মুখে নিবেদন করে। দেবী

প্রতিমার সম্মুখে ছাগবলি হইয়া থাকে। হিন্দুগণ দেবী ভগবতীর প্রীতি কামনায় বহু দান করে।

পুহাই (?) উৎসব; আশ্বযূজ মাসে রেবতী নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান দিবসে পুহাই উৎসব সম্পাদিত হয়। রাজা কংশের আদেশে বাসুদেবের মল্লযুদ্ধে নিরত হইবার স্মৃতি লইয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান। এই কারণ ঐ দিবস মল্ল ক্রীড়া এবং পশু যুদ্ধ হইয়া থাকে।

দীপালি উৎসব; কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই উৎসব সম্পাদিত হয়। এরূপ কথিত আছে যে, কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বাসুদেবের অর্দ্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী বলি রাজাকে সপ্তম লোক হইতে মুক্তি দান করেন, এই উপলক্ষেই দীপালি উৎসবের অনুষ্ঠান। এতদুপলক্ষে হিন্দুগণ স্নানান্তে সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত হয়, এবং আত্মীয় স্বজনকে পান সুপারী উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করে। অতঃপর তাহারা মন্দিরে গমন পূর্ব্বক ধন দান করে এবং দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ক্রীড়া কৌতুকে নিরত থাকে। সন্ধ্যাকালে সমস্ত গৃহে দীপমালা প্রজ্বলিত হয় এবং তাহার আলোকে সমস্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

—উৎসব; কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে একটি উৎসব আরব্ধ হইয়া সমগ্র কৃষ্ণপক্ষ ব্যাপী হয়। রমণীদিগকে ভোজে আমন্ত্রণ ও বসন ভূষণ প্রদান এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

গৌরী তৃতীয়া উৎসব; মার্গশীর্ষ মাসের তৃতীয় দিবসে গৌরীর উদ্দেশ্যে রমণী ভোজন হইয়া থাকে। তাহারা এই দিন ধনী গৃহে সম্মিলিত হয়, সেখানে তাহারা গৌরীর একাধিক রৌপ্য প্রতিমা সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া সুগন্ধ প্রদান করে এবং তার পর পরস্পর ক্রীড়া কৌতুকে নিরত হয়। পরদিন প্রাতে তাহারা দানাদি কার্য্য করে।

অষ্টক উৎসব; পৌষ মাসের অষ্টম দিবসে এই উৎসব সম্পাদিত হয়। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থাকে।

পৌষ মাসে আর কোন বিশেষ উৎসব নাই। তবে এই মাসের অধিকাংশ দিনই হিন্দুগণ মিষ্ট পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভোজন করে।

মাঘ তৃতীয়া উৎসব; মাঘ মাসের তৃতীয় দিবসে গৌরীদেবীর উদ্দেশ্যে রমণী ভোজন হইয়া থাকে ; এতদুপলক্ষে তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির গৃহে গৌরী প্রতিমার সম্মুখে সম্মিলিত হয় এবং সেখানে মহার্ঘ বসন ভূষণ, মনোহর সুগন্ধ এবং সুমিষ্ট আহার সামগ্রী প্রদান করে। এই স্থানে অষ্টোত্তর এক শত কলস শীতল জল রাখা হয় ; এই শীতল জল দ্বারা তাহারা চারি প্রহরে চারি বার গাত্র প্রক্ষালন করে। পরদিন তাহারা গরীব দুঃখীকে ধন বিতরণ এবং আত্মীয় স্বজনদিগকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে।

কামাহ উৎসব; মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হইয়া থাকে। এই দিন সন্ধ্যাকালে হিন্দুগণ সমস্ত উচ্চ স্থানে দীপ প্রজ্বলিত করে।

দোল উৎসব; ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোল উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে ; রমণীভোজন এই উৎসবের একটি অঙ্গ ; আলোকমালা প্রদান আর একটি অঙ্গ।

শিবরাত্রি; দোল উৎসবের পর দিন রাত্রিতে শিবরাত্রি উৎসব হইয়া থাকে। এই রাত্রিতে হিন্দুগণ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা শিবের আরাধনা করে।

আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দান অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজকর পরিশোধ অন্তে উপার্জ্জিত ধনের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে সঞ্চয়, দান ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। উপার্জ্জিত ধনের কত অংশ দান কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, তৎসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কোন মতে সমগ্র আয়ের নবমাংশ, কোন মতে রাজকর পরিশোধ অন্তে যে ধন অবশিষ্ট থাকে,

তাহা চারি অংশে বিভাগ করিয়া তাহার একাংশ ব্যয় করা আবশ্যক।

কুসীদ

সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। কেবল শূদ্রগণ একশত মুদ্রায় দুই মুদ্রা হিসাবে সুদ গ্রহণ করিতে পারে।

পুরাকালে ভারতীয়গণের পক্ষে পশুহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের মাংসাহারের ইচ্ছা বশতঃ সে নিয়ম পরিত্যক্ত

নিষিদ্ধ পানীয় ও খাদ্য

হইয়াছে। এখন মাংস ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। মেষ, ছাগ, হরিণ, শশক, গণ্ডার, মহিষ, চড়ুই, কপোত, ঘুঘু, ময়ূর, চকা প্রভৃতি স্থলচর এবং জলচর পশু পক্ষী ভক্ষ্য। গো, অশ্ব, খচ্চর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হস্তী পালিত কুক্কুট, কাক, শুক প্রভৃতি পশু পক্ষী অভক্ষ্য। ডিম্ব ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণগণের পেঁয়াজ ও রসুন অভক্ষ্য; সুরাপান নিষিদ্ধ; তবে শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। তাহারা সুরাপান করিতে পারে; কিন্তু বিক্রয় করিতে অসমর্থ। শূদ্রগণের মাংস বিক্রয়ও নিষিদ্ধ। এরূপ কথিত আছে যে, ভরত রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে গোমাংস আহার করিবার প্রথা ছিল। কিন্তু উহা নানা প্রকার রোগজনক বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে; গোমাংস আহার সম্বন্ধীয় নিষেধাত্মক বিধি সাতিশয় কঠোর ও সঙ্কোচক।

হিন্দুগণের বিবাহ অতি অল্প বয়সে হইয়া থাকে; এই কারণ পিতামাতা বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে। বিবাহক্রিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক

বিবাহ।

সম্পাদিত হয়। পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে পিতা মাতা ব্রাহ্মণ এবং গরীব দুঃখীদিগকে ধন দান করে। বিবাহের সময় পণ প্রদান করিবার প্রথা নাই। তবে বর পাত্রীকে স্বেচ্ছামত উপঢৌকন প্রদান করে; এই সকল দ্রব্য পাত্রীর স্ত্রীধন রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। পত্নী ইচ্ছা করিলে তৎসমুদয় পতিকে পরবর্ত্তীকালে প্রত্যর্পণ করিতে পারে। একবার বিবাহ হইয়া গেলে

সে বন্ধন আমরণ অক্ষুণ্ণ থাকে। কারণ হিন্দু জাতির পতি বা পত্নী পরিত্যাগের ব্যবস্থা নাই।

হিন্দুগণ একাদিক্রমে চারি বিবাহ করিতে পারে। তদতিরিক্ত বিবাহ নিষিদ্ধ। যদি কোন ব্যক্তির চারি স্ত্রী থাকে এবং তাহাদের এক জনের মৃত্যু হয়, তবে ঐ ব্যক্তি আর এক রমণীর পাণি পীড়ন করিয়া চারি সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারে। কিন্তু চতুর্ধিক বিবাহ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।

পতির মৃত্যু হইলে পত্নীর পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাকে চির জীবন বৈধব্য ভোগ করিতে অথবা মৃত পতির সহিত চিতায় দগ্ধীভূত হইতে হয়। অনেক বিধবা জীবনধারণ অপেক্ষা সহমরণই অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করে। কারণ হিন্দুবিধবাদিগকে আজীবন নানা প্রকার দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতে হয়। বিধবা রাজ-মহিষীগণ কর্তৃক রাজবংশের অপ্রীতিকর দুষ্কার্য্য সম্পাদিত হইবার আশঙ্কায় অনেক সময় তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দগ্ধ করা হইয়া থাকে। কিন্তু রাজমহিষী বৃদ্ধা অথবা পুত্রবতী হইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়, কারণ মাতার সদাচরণের জন্য পুত্র দায়ী।

হিন্দুগণের পক্ষে আত্মীয়াকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করা নিতান্ত দোষাবহ; অপরিচিতা কন্যার পাণিগ্রহণ তদপেক্ষা শ্রেয়স্কর। পিতৃ অথবা মাতৃকুলে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে বর কন্যা হইতে পাঁচ পুরুষ অতিক্রান্ত হইয়া থাকিলে বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু তাদৃশ বিবাহ অপ্রশস্ত এবং লোকের অপ্রিয়।

কোন কোন হিন্দুর বিশ্বাস যে, পত্নীর সংখ্যা বিবাহার্থী ব্যক্তির বর্ণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ চারি পত্নী, ক্ষত্রিয় তিন পত্নী, বৈশ্য দুই পত্নী এবং শূদ্র এক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। পুরা-কালে উচ্চ বর্ণের বিবাহার্থী পুরুষ নিম্ন বর্ণ হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে

পারিত এবং সে বিবাহের ফলে পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তাহারা মাতৃকুল ভুক্ত হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রথা রহিত হইয়াছে।

বিবাহান্তে পতি পত্নীর মিলনের পূর্ব্বে গর্ভাধান নামক একটি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার নিয়ম আছে; কিন্তু অনেক স্থলে নব্য পরিণীত যুবক লজ্জা বশতঃ এই ক্রিয়া সম্পাদন করিতে বিরত থাকে; তার পর পত্নী অন্তর্ব্বত্নী হইলে চতুর্থ মাসে সীমন্তোন্নয়ন ক্রিয়ার সহিত এক সঙ্গে ঐ ক্রিয়া সম্পাদন করে। প্রসবান্তে নবজাত সন্তানের জাতক কর্ম্ম নামক একটী ক্রিয়া সম্পাদন করিবার প্রথা আছে। প্রসূতির অশৌচ অন্ত হইলে নবজাত সন্তানের নামকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রসূতির অশৌচকালে তাহার জলপূর্ণ কলস স্পর্শ করা নিষিদ্ধ; তাহার বাসগৃহে ভোজন নিষিদ্ধ, কোন ব্রাহ্মণ তাহার গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে অসমর্থ। ব্রাহ্মণের অশৌচকাল ৮ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন এবং শূদ্রের ৩০ দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সন্তানের অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কর্ণভেদ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ভারতীয় রাজন্যগণের দোষে অনেক সময় স্ত্রীলোকেরা কুলটা বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। রাজন্যগণ এই সকল কুলটা রমণীদিগকে দেবমন্দিরে নৃত্য ও গীতবাদ্যের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। রাজাদেশের জন্যই ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিত-গণ তাহাদিগকে দেবমন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে অসমর্থ। রাজন্যগণ নাগরিক এবং প্রজাবর্গকে প্রলুব্ধ করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাদৃশ প্রথা প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। এই উপায়ে রাজকোষে যে অর্থাগম হয়, তাহা সৈন্যের প্রতিপালনার্থে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

দেবদাসী।

পুরাকালে ভারতীয়গণ মৃতদেহ উন্মুক্ত স্থানে নিক্ষেপ করিত। এই প্রথা নিবন্ধন মৃতদেহ হইতে দুর্গন্ধ উত্থিত হইয়া লোক পীড়ার

সৃষ্টি করিত। এই কারণ নারায়ণ মৃতদেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্যাবধি সেই নিয়ম প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তদীয় উত্তরাধিকারিগণ তাহার দেহ ধৌত, সুগন্ধ চর্চ্চিত এবং নব বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া চন্দন ও অন্যান্য কাষ্ঠ দ্বারা ভস্মীভূত করে। দগ্ধ অস্থির কিয়দংশ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবার প্রথা আছে। এতৎফলে মৃতব্যক্তির আত্মা নরক হইতে স্বর্গে গমন করে। অবশিষ্ট ভস্মাবশেষ চিতার পার্শ্ববর্ত্তী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়। মৃত ব্যক্তির চিতায় প্রস্তর আস্তৃত ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তিন বৎসর ন্যূন বয়স্ক বালক বালিকার মৃতদেহ ভস্মীভূত করিবার প্রথা নাই। যে সকল ব্যক্তি মৃতদেহ ভস্মীভূত করে, তাহারা নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র ধৌত এবং তার পর নিজেরা স্নান করিয়া পরিশুদ্ধ হয়। যে সকল ব্যক্তি দারিদ্র্য বশতঃ আত্মীয় স্বজনের মৃত দেহ ভস্মীভূত করিতে অসমর্থ হয়, তাহারা উহা উন্মুক্ত মাঠে অথবা স্রোতশালী জলাশয়ে নিক্ষেপ করে।

মৃত সংকার।

হিন্দুগণ সতীদাহ করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি জীবনে বীতস্পৃহ অথবা অচিকিৎস্য পীড়াক্রান্ত অথবা জরাগ্রস্ত হয়, তবে তাহাকেও জীবিত অবস্থায় দগ্ধীভূত করা হইয়া থাকে; এইরূপ স্থল ব্যতীত অন্য কোন কারণে জীবিত দেহ নষ্ট করিবার নিয়ম নাই। কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি অচিকিৎস্য ব্যাধি বা জরা নিবন্ধন আত্মহত্যা হইতে বিরত থাকেন। কেবল বৈশ্য এবং শূদ্রগণ পরজন্মে ইহজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অবস্থা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ শারীরিক অবস্থায় জীবনান্ত করে। ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়গণের অগ্নিতে জীবন নাশ শাস্ত্র বিধি দ্বারা বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের জীবনে নিতান্ত নিঃস্পৃহা উপস্থিত হইলে তিনি সূর্য্য বা

সতীদাহ, আত্মহত্যা, প্রয়াগে গঙ্গা নদীতে জীবন নাশ।

চন্দ্র গ্রহণের সময় অন্য কোন উপায়ে জীবনান্ত করেন। কোন কোন স্থলে বা লোকে অর্থ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া জীবনান্ত করে। প্রয়াগ নামক তীর্থে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থলে একটি বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে; ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া নদীতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করে।

হিন্দুজাতির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধান সমূহের প্রধান নিয়ম এই যে, কন্যা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীলোকের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকার নাই। মনুর বিধানানুসারে পুত্রের অংশের চারিভাগের এক ভাগ কন্যার প্রাপ্য। কন্যার অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃবিয়োগ হইলে তাহার ভরণ পোষণ পৈতৃক সম্পত্তি হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তারপর বিবাহকালে ঐ সম্পত্তির লভ্য হইতে যৌতুকাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয় প্রদত্ত হয়। এইরূপ স্থলে বিবাহের পর পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার সমস্ত অধিকার লোপ পায়। মৃতব্যক্তির বিধবা পত্নী আজীবন তদীয় উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে ভরণ পোষণ প্রাপ্ত হইবার অধিকারিণী। উত্তরাধিকারিগণ মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। মৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত সম্পত্তি পরিত্যক্ত না হইলেও উত্তরাধিকারিগণকে উহা পরিশোধ করিতে হয়। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সম্পূর্ণ অভাব থাকিলেও উত্তরাধিকারিগণ তদীয় বিধবা পত্নীর ভরণপোষণের ব্যয় প্রদান করিতে বাধ্য।

উত্তরাধিকার।

হিন্দু বিধানানুসারে পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা অধস্তন পুরুষের দাবি অগ্রগণ্য। পিতামহ এবং পিতা অপেক্ষা পুত্র এবং পৌত্রের দাবি অগ্রগণ্য। পূর্ব্ব বা অধস্তন পুরুষগণের একাধিক শ্রেণী থাকিলে মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পর্কের ঘণিষ্ঠতানুসারে উত্তরাধিকার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পৌত্রের অপেক্ষা পুত্রের এবং পিতামহ অপেক্ষা পিতার দাবি

অগ্রগণ্য। সমশ্রেণীর উত্তরাধিকারত্ব হিন্দু বিধানানুসারে অগ্রগণ্য নহে। পূর্ব্ব বা অধস্তন উত্তরাধিকারী না থাকিলেই মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা তদীয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। ভগিনীর পুত্র অপেক্ষা কন্যার পুত্রের দাবি অগ্রগণ্য। উত্তরাধিকারিগণ সকলে তুল্য অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যতপুত্র তত অংশ, অথবা যত ভ্রাতা, তত অংশ। ক্লীব ব্যক্তিকে পুরুষের তুল্য গণ্য করিবার নিয়ম আছে।

মৃতব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাজকোষে গৃহীত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে রাজার কোন অধিকার নাই। উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহাদের সম্পত্তি দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত ষোড়শ দিবস ভোজ দিয়া থাকে; শেষ দুই দিবসে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দিগকে অর্থদান করিবার নিয়ম আছে। এই ষোড়শ দিনের প্রত্যহ গৃহদ্বারের বহির্ভাগে কাষ্ঠ-মঞ্চোপরি মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে অন্ন ও জল রাখিয়া দিতে হয়। ঈদৃশ প্রথার কারণ এই যে, সম্ভবতঃ ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির আত্মা-পরলোকগত না হইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে এবং তজ্জন্য তাহার অন্ন ও জল আবশ্যক হয়। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ দশম দিবসে তাহার উদ্দেশ্যে বহু অন্ন ও জল বিতরণ করিয়া থাকে। তার পর দিবস হইতে একবৎসর কাল প্রত্যহ একজন লোকের উপযোগী অন্ন ব্রাহ্মণ গৃহে প্রেরণ করিবার নিয়ম আছে। এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর দিবস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসে এক দিবস ভোজ হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ মাসের ভোজে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক আহ্বান এবং অধিক অর্থ ব্যয় করিবার নিয়ম আছে। বৎসর অন্ত হইবার একদিবস পূর্ব্বে মৃতব্যক্তি এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে ভোজ

শ্রাদ্ধ

দিতে হয়; তারপর বৎসরের শেষ দিবসে ভোজ অন্তে সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া থাকে।

বিচার

বিচারক প্রথমতঃ প্রমাণ স্বরূপ লিখিত দলিল প্রদর্শন করিতে আদেশ করেন। লিখিত দলিলের অভাবে সাক্ষীর মৌখিক প্রমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার নিয়ম আছে। সাক্ষীর সংখ্যা অন্যূন চারি জন হওয়া আবশ্যক। যদি বিচারার্থী স্বীয় অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ হয়, তবে বিচারক বিবাদীকে শপথ পূর্ব্বক বাদীর দাবি অস্বীকার করিতে আদেশ করেন। কিন্তু বিবাদীও বাদীকে বলিতে পারে, তুমি শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক দাবি সম্পর্কে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ কর, আমি তোমার দাবি পূর্ণ করিয়া দিব। বিচারার্থীর দাবি সামান্য হইলে বিবাদী পাঁচজন ব্রাহ্মণের সমক্ষে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করে, "যদি আমি মিথ্যা কথা বলি, তবে যেন আমার দাবির আট গুণ ক্ষতি পূরণ করিতে হয়।" সাক্ষীর সহায়তা ব্যতীত দোষী কি নির্দ্দোষ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আর কতিপয় উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিতেছি।

(১) বিবাদীকে এক প্রকার তীব্র বিষ পান করিতে দেওয়া হয়; বিবাদী কর্ত্তৃক সত্য কথিত হইলে ঐ বিষ পানে তাহার কোন অনিষ্ট হয় না।

(২) বিবাদী স্রোতস্বতী নদী অথবা সুগভীর কূপের নিকট নীত হয়; অতঃপর বিবাদী নদী বা কূপগর্ভস্থিত জলের প্রতি সম্বোধন করিয়া বলে, জল, তুমি পবিত্র, সত্য মিথ্যা সমস্তই তোমার নিকট প্রকট, যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে যেন আমার মৃত্যু হয়, যদি সত্য বলি, তবে যেন রক্ষা পাই। তাহার বাক্য শেষ হইলে পাঁচজন দূত তাহাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করে। বিবাদী কর্ত্তৃক সত্য কথিত হইলে তাহার মৃত্যু হয় না।

(৩) বাদী এবং বিবাদী উভয়েই সর্ব্বলোক-মান্য দেবতার মন্দিরে প্রেরিত হয়। এই স্থানে বিবাদী সমস্ত দিন উপবাস করে। পর দিন প্রাতে সে ব্যক্তি নব বস্ত্র পরিধান করিয়া বাদী সহ দেবমূর্ত্তি সমক্ষে গমন করে, তখন পুরোহিত দেবমূর্ত্তির মস্তকে জল ঢালিতে প্রবৃত্ত হন এবং ঐ জল বিবাদীকে পান করিতে দেন। বিবাদী কর্ত্তৃক সত্য কথিত না হইলে তাহার রক্ত বমন আরম্ভ হয়।

(৪) বিবাদীকে মানযন্ত্রে ওজন করা হয়। বিবাদী মানযন্ত্র হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেবগণকে সাক্ষী করিয়া আপনার সমস্ত বক্তব্য কাগজে লিপিবদ্ধ করে। তার পর ঐ ব্যক্তিলিখিত কাগজ মস্তকে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার মানযন্ত্রে আরোহণ করে। বিবাদী কর্ত্তৃক সত্য কথিত হইলে তাহার ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়।

(৫) সমভাগে ঘৃত ও তিলতৈল কটাহে লইয়া উত্তপ্ত করা হয়; ঘৃত ও তৈল সম্পূর্ণ উষ্ণ হইলে তন্মধ্যে একখণ্ড স্বর্ণ নিক্ষেপ করা হয়; অতঃপর বিবাদী হস্ত দ্বারা ঐ স্বর্ণখণ্ড উত্তোলন করিবার জন্য আদিষ্ট হয়। বিবাদী কর্ত্তৃক সত্য কথিত হইলে অক্ষত হস্তে স্বর্ণ-খণ্ড উত্তোলন করা সম্ভবপর হয়।

(৬) বিবাদীর হস্তে বৃক্ষপত্র ধান্য সহ স্থাপন করিয়া তদুপরি একখণ্ড সম্পূর্ণ উত্তপ্ত লৌহ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তদবস্থায় তাহাকে সপ্তপদ গমন করিতে হয়। বিবাদী কর্ত্তৃক সত্য কথিত হইলে তাহার হস্ত অক্ষত থাকে।

অপরাধ এবং দণ্ড

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নীচবর্ণীয় লোক হত হইলে উপবাস, দান এবং জপ করিলেই সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ হত হইলে তাহার পাপের দণ্ড পরকালে হইয়া

থাকে। এই কারণ ঐ হত্যার জন্য তাহাকে ইহ জীবনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ।

হিন্দুজাতির মত এই যে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু মহাপাতকের ক্ষয় কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্ম হত্যা, গো হত্যা সুরাপান এবং পরদারগমন মহাপাতক রূপে গণ্য। ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ঈদৃশ মহাপাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে রাজা তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

যদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণীয় কোন ব্যক্তি স্ববর্ণীয় লোকের হত্যাপরাধে দোষী হয়, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তদ্ব্যতীত লোক শিক্ষার জন্য রাজাও তাহার অনুরূপ দণ্ড বিধান করেন।

অপহৃত দ্রব্যের মূল্য অনুসারে চৌর্য্যাপরাধ সম্বন্ধীয় দণ্ডের তারতম্য হইয়া থাকে। ঈদৃশ অপরাধ গুরুতর হইলে রাজা ব্রাহ্মণ চোরের চক্ষু তুলিয়া ফেলেন এবং বাম হস্ত ও দক্ষিণ পদ অথবা দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ কাটিয়া দেন। চোর ক্ষত্রিয় হইলে কেবল তাহার হস্ত পদ কাটিয়া বিকলাঙ্গ করিয়া দিবার বিধান আছে। এতদ্ভিন্ন অন্য বর্ণীয় চোরের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

কুলটা স্ত্রীকে স্বামীগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদত্ত হয়।

রাজকর।

গবাদি পশু এবং শস্য হইতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহার একাংশ রাজকর রূপে দিতে হয়। গোচারণ ভূমি এবং শস্যভূমির জন্য এই কর। এতদ্ব্যতীত ধন সম্পত্তি এবং পরিবার পরিজনের রক্ষার জন্য রাজা প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে তাহার উপার্জ্জিত ধনের এক ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন। যাহারা কৃষক এবং পশু পালক, তাহাদিগকেও এই কর দিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি

ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে, তাহারা শুল্ক প্রদান করে। ব্রাহ্মণের নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই।

অব্দ।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে পাঁচ প্রকার অব্দ প্রচলিত আছে। এই সকল অব্দের নাম (১) শ্রীহর্ষাব্দ, (২) বিক্রমাদিত্যাব্দ, (৩) শকাব্দ, (৪) বল্লভাব্দ, (৫) গুপ্তাব্দ। শ্রীহর্ষাব্দ মথুরা এবং কান্যকুব্জ রাজ্যে এবং বিক্রমাদিত্যাব্দ দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত আছে। বল্লভবংশীয় রাজগণ হইতে বল্লভাব্দ প্রচলিত হইয়াছে। গুপ্তরাজগণ গুপ্তাব্দের প্রচলন করিয়াছেন। এক্ষণ পারসীক ৪০০ অব্দ (১০৩১ খৃঃ অব্দ, ফেব্রুয়ারী) চলিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ভারতীয় অব্দ সকলের কাল নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীহর্ষাব্দ	১৪৮৮
বিক্রমাদিত্যাব্দ	১০৮৮
শকাব্দ	৯৫৩
বল্লভাব্দ	৭১২
গুপ্তাব্দ	৭১২

সুলতান মাহমুদ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের ফল।

পূর্ব্ববর্ত্তীকালে কোন মোসলমান বিজেতাই কাবুলের সীমা এবং সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন নাই। তুর্কীগণের অধিপতি সবক্তগীন গজনীতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হন; প্রথমতঃ তিনিই কাবুল ও সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সবক্তগীন ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেন এবং তদর্থ অল-গাজী উপাধিতে ভূষিত হন। আমাদের এই নরপতি উত্তরাধিকারিগণের সুবিধার জন্য ভারত সীমান্ত দুর্ব্বল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় পথ নির্ম্মাণ করেন। এই সকল পথে তদীয় পুত্র মাহমুদ ত্রিংশৎ বৎসর বা তদধিক কাল ভারতবর্ষে প্রবেশ

করিয়া ছিলেন। তাঁহারা পিতা পুত্রে উভয়েই পরমেশ্বরের দয়া লাভ করেন। মাহমুদ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণের সমৃদ্ধি ধ্বংস এবং আশ্চর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাদৃশ শৌর্য্যবীর্য্যের ফলে হিন্দুগণ ধূলিকণার ন্যায় চারিদিকে উড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য এই বিক্ষিপ্ত হিন্দুগণ মোসলেম জাতির প্রতি অপরিসীম ঘৃণা পোষণ করিয়া আসিতেছে। এই কারণেই হিন্দুর বিদ্যা মোসলমান কর্ত্তৃক বিজিত দেশ সমূহ হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে এবং মোসলমানের অনধিগম্য কাশ্মীর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। এই সকল স্থানে ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক কারণে দেশী এবং বিদেশী গণের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে।

উপসংহার।

পুরাকালে ভারতভূমি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎকালে "সাগর মধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতা শূন্য" ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজন্যমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বক্ষণ ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রজ্বলিত থাকিত। এক রাজ্য অন্য রাজ্যের ধ্বংস সাধন জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিল।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ কেবল দুইবার একতাবদ্ধ হইয়াছিল; প্রথম, মহারাজ অশোকের সময়; দ্বিতীয়, মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সময়।

অশোক ও সমুদ্রগুপ্ত

মহারাজ অশোকের পরাক্রম অপরিসীম ছিল। তিনি সুবিশাল আর্য্যাবর্ত্তের চক্রবর্ত্তী রাজা রূপে সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন। তক্ষশিলা হইতে কামরূপ এবং কাশ্মীর ও হিমাচল হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠালাভ

করিয়াছিল। ভারতীয় রাজন্যকুলে মহারাজ অশোকের পরেই মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত দ্রাবিড়জাতি-অধ্যুষিত দেশ হইতে অনুগাঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে স্বীয় বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা।

হিউএন্‌থসঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, আমরা তাহা বর্ণনা করিতেছি। সে সময় হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নর্ম্মদাবিধৌত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত ছিল। এই সকলের কোন কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন দেখিতে পাওয়া যাইত। তৎসমুদয়ে এক এক বংশের লোক সমূহ মিলিত হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বৈশালী রাজ্যে লিচ্ছবি বংশীয়গণ সম্মিলিতভাবে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঈদৃশ শাসনপ্রণালী বিশিষ্ট আর কতিপয় রাজ্যের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কুশীনগর রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে মল্লগণ দেশ শাসন করিতেন। তৎকালে যে সকল রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে তিনটি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই তিনটি রাজ্যের নাম মগধ, কোশল এবং কৌশাম্বী। রাজগৃহে মগধ রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই স্থানে রাজা বিম্বিসার রাজত্ব করিতেন। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র অজাতশত্রু রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। কোশল রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল শ্রাবস্তী। সেখানে প্রসেনজিৎ নামক গুণবান রাজা রাজত্ব করিতেন। বুদ্ধদেবের জীবনের শেষভাগে প্রসেনজিতের পুত্র বিরুঢ়ক শ্রাবস্তীর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কৌশাম্বী রাজ্যের অধিপতির নাম ছিল উদয়ন।

এই সময় পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের কিয়দংশ পরাধীন ছিল। আমরা

হিরোডোটসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী অংশে পারস্যাধিপতির প্রতিনিধি শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৫৭ অব্দে আবির্ভূত হইয়া ৪৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা লিখিত হইল। পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিতে হইলে গ্রীকবীর আলেকজণ্ডারের অভিযান বৃত্তান্ত অবলম্বন করা আবশ্যক। আলেকজণ্ডার শতদ্রুর তীরে উপস্থিত হইলেই তাঁহার অগ্রগতি শেষ হইয়াছিল, তিনি সিন্ধুনদের পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই কারণ তদীয় অভিযান বৃত্তান্ত হইতে কেবল পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশের রাজনৈতিক অবস্থাই অবগত হওয়া যায়। আমরা তৎসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আলেকজণ্ডারের আক্রমণকালের অবস্থা

মহাবীর আলেকজণ্ডার ৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দের বসন্তকাল হইতে ৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সার্দ্ধ দুই বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিদৃষ্ট প্রদেশ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) সিন্ধুনদের পশ্চিমকূলবর্ত্তী রাজ্য সমূহ; (২) সিন্ধু এবং শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী রাজ্য সমূহ; (৩) আলেকজণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তন পথের দুই পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহ।

আলেকজণ্ডার সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষভুক্ত যে সকল ক্ষুদ্র জনপদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের নাম যথাক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে। অস্তি (হস্তীশ) রাজার রাজ্য, পুষ্কলাবতী (পেশওয়ারের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান চারসদা নামক স্থান), আস-পাস-সয়ান এবং গৌরিয়ান জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত রাজ্যদ্বয় (বর্ত্তমান চিত্রল,

গিলগিট প্রভৃতি স্থান), অশ্বকানী জাতির রাজধানী মাসগা নগর (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সোয়াত নদীর তীরবর্ত্তী মনগ্লৌর নামক স্থান), অনদক নগর, অরিগেইয়ন নগর, বাজিরা (বাজোর), অভিসার রাজ্য (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান হাজরা জেলা) এবং নিশারাজ্য (বর্ত্তমান জালালাবাদ জেলার নিকটবর্ত্তী স্থান)।

আলেকজণ্ডার নিশারাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশিলা রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার পরেই বিতস্তার পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী মহারাজ পুরুর রাজ্য (বর্ত্তমান ঝিলাম, গুজরাট এবং সাপুর জেলা) উল্লিখিত হইয়াছে। এই রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের বিষয় আমরা জানিতে পারি। এই রাজ্যে গ্লউসাই নামক জাতির বাস ছিল। আলেকজণ্ডার গ্লউসাই জাতিকে পরাভূত করিয়া চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর মধ্য-স্থলে মহারাজ পুরুর ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আলেকজণ্ডার ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া অদর ইসতাই জাতির রাজধানী পিমপ্রমা নগরী অধিকার করিয়াছিলেন। পিমপ্রমার নিকটবর্ত্তী স্থানে (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান গুরুদাসপুর জেলায়) কাথাই নামক পরাক্রান্ত জাতির রাজ্য স্থাপিত ছিল। আলেকজণ্ডার কাথাই জাতিকে বিধ্বস্ত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া শতদ্রুর তীরে উপনীত হন।

আলেকজণ্ডার শতদ্রুর তীর হইতে সিন্ধুনদের পথে স্বদেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকালে কতিপয় রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তৎসমুদয়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। লবণ পর্ব্বতরাজ্য (তৎকালে সৌভূত এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন), শিবি জনপদ, মালই রাজ্য (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মুলতান জেলা), আগলাইস জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত রাজ্য, ক্ষুদ্রক জাতির রাজ্য, মৌসিকানাস নামক রাজার রাজ্য (পরবর্ত্তী কালে এই

রাজ্যের রাজধানী আলোর নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে শিকারপুর জেলায় উহার ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে) অক্সিকোনস রাজার রাজ্য এবং সম্বোস রাজার রাজ্য (সিন্ধুমান নামক স্থানে এই রাজার রাজধানী বিদ্যমান ছিল ; সিন্ধুমান বর্ত্তমান সময়ে সেওয়ান নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে)।

ফলতঃ আলেকজণ্ডার সার্দ্ধ দুই বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া বহুসংখ্যক রাজ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। এই সমুদয় রাজ্য পরস্পর স্বতন্ত্র ছিল ; সময় সময় এক রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যের শত্রুতা উপস্থিত হইত। আলেকজণ্ডারের পরিদৃষ্ট রাজ্য সমূহ মধ্যে কোন কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাদৃশ রাজ্য সকলকে স্বাধীন বিশেষণে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের রাজনৈতিক অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। শতদ্রু হইতে যমুনা নদী ১৬৮ মাইল দূরে অবস্থিত, যমুনা হইতে গঙ্গা নদী ১১২ মাইল দূরে অবস্থিত, গঙ্গা নদীর এই স্থান হইতে কালিনিপাক্স (লাসন সাহেবের মতে কালিনিপাক্সের বর্ত্তমান নাম কনৌজ) ২৮৬ মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে। শতদ্রুর প্রাগুক্ত স্থান হইতে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল অর্থাৎ সমগ্র দোয়াব প্রদেশ দৈর্ঘ্যে ৬২৫ মাইল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে পাটলীপুত্র ৪২৫ মাইল রূপে লিপিবদ্ধ আছে। পাটলীপুত্র হইতে গঙ্গার মুখ ৭৩৮ মাইল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মেগাস্থিনিসের ভারতবর্ষ

তৎকালে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রাচ্যদেশ অর্থাৎ মগধ-সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই দেশ শাসন করিতেন। তাঁহার ছয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং নয় হাজার রণহস্তী ছিল। এই সৈন্যবল দ্বারাই তাঁহার প্রতাপ ও আধিপত্য কিরূপ সুবিস্তৃত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, মথুরা ও আগ্রার পার্শ্ববর্ত্তিনী যমুনা নদী চন্দ্রগুপ্তের দেশ দিয়া প্রবাহিত ছিল। এই কারণ উপলব্ধি হয় যে, ঐ সকল স্থানের অধিপতিগণ চন্দ্রগুপ্তকে চক্রবর্ত্তী নরপতিরূপে সম্মান করিতেন।

গঙ্গা নদীর সাগর-সঙ্গমস্থলে গঙ্গারাঢ়ি নামক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। গঙ্গার উপকূলে সমুদ্রের নিকট কলিঙ্গ নামে আর একটি রাজ্য দেখা যাইত। গঙ্গার তীরে মালাই নামে একটি জাতির বাস ছিল। মেগাস্থিনিসের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া উপলব্ধি হয় যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ বঙ্গের কিয়দংশ কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। পরথনিস নামক নগরে কলিঙ্গ দেশের রাজা বাস করিতেন। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান পরথনিস নামে পরিচিত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

কলিঙ্গ দেশের পশ্চাতে কতিপয় শৌর্য্যবীর্য্যশালী জাতি একজন অধিপতির অধীনে বাস করিত। এই অধিপতির ৫০ হাজার পদাতিক সৈন্য, ৪ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৪ শত রণহস্তী ছিল। এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলে অন্দরোজাতির আবাস স্থানে উপস্থিত হইতে হইত। মেগাস্থিনিস-বর্ণিত অন্দরোজাতিকে প্রাচীন অন্ধ্র জাতি রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অন্ধ্র গণ প্রথমতঃ গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর মধ্যস্থলে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তারপর নর্ম্মদার তীর দেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

তৎকালে বর্ত্তমান রাজপুতনা বহুসংখ্যক পার্ব্বত্য জাতির বাসভূমি ছিল। গ্রীক দূত এই সকল পার্ব্বত্য জাতির বর্ণনার অন্তে হোরেসো নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের রাজধানী সমুদ্রতীরে প্রতিষ্ঠিত এবং বাণিজ্যের জন্য খ্যাত ছিল। হোরেসো জাতি সৌরাষ্ট্রীয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান মাদুরা এবং তিনেভেলি জেলায় পাণ্ড্য নামে এক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। রমণীই কেবল পাণ্ড্যরাজ্য শাসন করিবার অধিকারিণী ছিলেন। এই রাজ্যে তিনশত নগর পরিদৃষ্ট হইত এবং দেশ রক্ষার জন্য দেড় লক্ষ পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত থাকিত।*

হিউএন্থ্ সঙ্গের গ্রন্থ পাঠে আমরা দুই জন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতির নাম জানিতে পারি। অশোক ও কনিষ্ক। মহারাজ

অশোক

অশোক দীর্ঘকাল (২৬৩—২৩৩ খৃঃ পূঃ) মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। হিউএন্থ্ সঙ্গ পুনঃ পুনঃ তাঁহার সুগভীর ধর্ম্ম নিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অশোক রাজা স্বধর্ম্মের মহিমা প্রচারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত বলা হইবে না। আমাদের চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে অশোক নির্ম্মিত স্তূপাদি বিদ্যমান দেখিয়া ছিলেন। তাদৃশ নিদর্শন একদিকে তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম কর্ম্ম-তৎপরতা এবং অন্যদিকে তাঁহার ভারতব্যাপী প্রাধান্যের পরিচায়ক ছিল। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অশোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ ভারতবর্ষের সুবিশাল অংশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

* এই বৃত্তান্তের কোন কোন অংশ প্লিনি ও এরিয়ানের গ্রন্থে লিপি বদ্ধ আছে। কিন্তু তৎসমুদয় মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। এজন্য সর্ব্বত্রই মেগাস্থিনিসের নাম প্রদত্ত হইল।

মহারাজ অশোকের ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারও বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগ অতি প্রবল ছিল। তাঁহার প্রতাপও যথেষ্ট ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিউএন্থ সঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার আধিপত্য সুদূরপ্রসারী ছিল। চীন প্রভৃতি দেশ হইতে রাজন্যগণ তাঁহার নিকট দূতপ্রেরণ করিতেন। ইতিহাসবেত্তৃগণের মত এই যে, কাবুল ও কাশগড় হইতে আগ্রা এবং গুর্জ্জর পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

কনিষ্ক

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক জন বৈদেশিক বণিক (ইনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন) ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার গ্রন্থপাঠে আমরা সিন্ধুদেশের কিয়দংশ এবং দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারি।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভারতবর্ষ

সিন্ধু নদের তীর হইতে সমগ্র সৌরাষ্ট্র ভূমিতে শকগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বাণিজ্য বন্দর বরবরিকন শকগণের আধিপত্যাধীন সিন্ধু-সাগর-সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল। তৎকালে চিরখ্যাত উজ্জয়িনী নগরীর অস্তিত্ব ছিল এবং তথা হইতে সর্ব্বপ্রকার পণ্য রপ্তানী হইত।

নর্ম্মদা নদীর তীর হইতে দক্ষিণদিকে দক্ষিণ দেশ বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজ্য আরিয়াকি বা আর্য্যকি নামে কথিত হইত। আর্য্যকির বর্ত্তমান নাম মহারাষ্ট্র বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কল্যাণনগর এই দেশের প্রধান নগর ছিল।

দক্ষিণ দেশের বিবরণের শেষে আমরা কেপরোবোট্রস নামধেয় একজন অধিপতির রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে কেপরোবোট্রসের সংস্কৃত নাম কেরলপুত্র।

পূর্ব্বোক্ত রাজ্যের পার্শ্বেই গোলকুণ্ডা নামক এক নগর বিদ্যমান ছিল। এই নগরের অধিপতির নাম বা উপাধি পাণ্ডিয়ান ছিল। এই রাজ্য ও মেগাস্থিনিস-বর্ণিত পাণ্ড্য রাজ্য অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

টলেমির ভূগোল-বৃত্তান্ত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থ হইতে প্রাগুক্ত রাজ্য সকলের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কেরলপুত্রের রাজ্যের রাজধানীর নাম করৌরা ছিল। বর্ত্তমান কোইম্বাটুর জেলার অন্তর্গত করুর নামক স্থান প্রাচীন করৌরারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। করুর শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ নগর। টলেমির গ্রন্থানুসারে পাণ্ডিয়ান বা পাণ্ড্যগণ কোলখাই নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। টলেমি সোর নামক একটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। চোল তাঁহার হস্তে পতিত হইয়া সোর হইয়াছে। টলেমি দক্ষিণ ভারতের একাংশকে দমিরিকি নামে আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।*

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভারতবর্ষ

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহু সংখ্যক অসভ্য জাতির আধিপত্য বদ্ধমূল ছিল। টলেমির গ্রন্থে এই সকল অসভ্য জাতি পুলিন্দেই, প্রপিওটাই, ফিলটাই প্রভৃতি নামে উল্লিখিত

---

* মৈশরিক ও গ্রীক লেখকদ্বয় কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি (আমরা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে উত্তর সরকার, গঞ্জাম জেলা ও ভিজিগাপটম জেলা ছাড়িয়া দিতেছি), এবং মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অর্থাৎ টলেমি বর্ণিত দমিরিকি দেশে তিনটি খ্যাত নামা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই তিনটির নাম পাণ্ড্য, চোল ও চের বা কেরল।

হইয়াছে। রাজপুতনায় প্রমর বংশীয়গণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে অনেক গুলি স্বতন্ত্র রাজ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। পালিমবোথারা (পাটলিপুত্র) কার্টিসিনা (কর্ণসুবর্ণ), গঙ্গারাঢ়ি, তামালাতস (তাম্রলিপ্তি) প্রভৃতি নামে এই সকল রাজ্য কথিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা অন্ধকারাচ্ছন্ন; (১) তারপর পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে, চৈনিক

(১) বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে রাজনৈতিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই বলিয়া আমরা তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। কিন্তু খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিবার উপায় আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ভারতে গুপ্তবংশ নামে এক নূতন রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজার নাম সমুদ্রগুপ্ত। তিনি ৩২৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্ত বিপুল ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন। সমগ্র উত্তর-ভারত তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী নদী হইতে পশ্চিমদিকে যমুনা ও চম্বল নদী পর্য্যন্ত এবং উত্তর দিকে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণ দিকে নর্ম্মদার তীরভূমি পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সমতট, কামরূপ, দবাক (বর্ত্তমান বগুরা, দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলা), কর-ত্রিপুররাজ্য (বর্ত্তমান কুমায়ুন, আলমোরা, গাড়োয়াল এবং কাঙ্গরা) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিত। তৎকালে পঞ্জাব, পূর্ব্বরাজপুতানা এবং মালব দেশের অধিকাংশ স্থলে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী বিদ্যমান ছিল। এই সকল রাজ্যের শাসন ভার এক একবংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। যৌধেয় বংশীয়গণ শতদ্রুর উভয় তীরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাদ্রকগণ মধ্য-পঞ্জাবের অধিকারী ছিলেন। গ্রীকবীর আলেকজণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে পঞ্জাবে মালই, কাথাই প্রভৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাহাদের স্থানে ঐ সকল নূতন বংশের উদ্ভব হইয়াছিল। আর্জ্জুনায়ন ও আভীরগণ যথাক্রমে পূর্ব্ব রাজপুতানা এবং মালব দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

পরিব্রাজকের আলোক সম্পাতে উহা আংশিক ভাবে আমাদের নিকট পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তদীয় ভ্রমণ-কাহিনীতে সিন্ধু-নদের পশ্চিমস্থ বহু হিন্দুরাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জনপদের মধ্যে টৌলি, উদ্যান, গান্ধার, পুরুষপুর এবং নগরহার সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

ফাহিয়ানের ভারতবর্ষ।

ফাহিয়ান সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলা ব্যতীত পঞ্জাবের আর কোন রাজ্যের নাম তদীয় ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লিখিত হয় নাই। পঞ্জাবের পর মথুরা দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা দেশের পশ্চিম দিকে মরুভূমির পশ্চাতে পশ্চিম-ভারত অর্থাৎ রাজপুতানার রাজ্য সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। তত্রত্য অধিপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মথুরার দক্ষিণ দিকে মধ্যদেশ বিস্তৃত ছিল। ফাহিয়ান মধ্যদেশে সাতিশয় গ্রীষ্ম অনুভব করিয়াছিলেন। মধ্যদেশে একাধিক নরপতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফাহিয়ান কনৌজ, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, এবং কৌশাম্বী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে ফাহিয়ান এই সকল চিরখ্যাত নগরের কোন রাজনৈতিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তিনি এই সকল নগর পরিদর্শন করিয়া চম্পা নগরীতে আগমন করেন; তৎকালে চম্পা একটি বিস্তৃত রাজ্যে অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই রাজ্য তৎকালে অঙ্গ নামে খ্যাত ছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে উহা দক্ষিণ বিহার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ফাহিয়ান চম্পা হইতে তাম্রলিপ্তি রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। এই রাজ্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া

গিয়াছেন, "তাম্রলিপ্তি রাজ্যের রাজধানী তাম্রলিপ্তি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এই রাজ্যে চতুর্বিংশতি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এই দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল।"

আমরা খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর এই সাতিশয় অসম্পূর্ণ ও আংশিক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়া পরবর্ত্তীকালের বিবরণ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মিহিরকুল

হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, পঞ্জাবে মিহিরকুল নামক হূনজাতীয় নরপতি রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ৫১০ অব্দ তাঁহার আবির্ভাব-কালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত অংশে তাঁহার আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। কাশ্মীরে এক স্বতন্ত্র রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মহারাজ মিহিরকুলের বিশ্বাস-ঘাতকতায় এই রাজবংশ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তৎকালে গান্ধারে ও সিন্ধুদেশে বৌদ্ধরাজত্ব দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সকল রাজ্যের নরপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের পোষণ করিতেন। মগধের বালাদিত্য রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মিহিরকুলকে কর প্রদান করিতেন।

সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষ

হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গ স্বয়ং ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া প্রায় সমগ্রদেশ পর্য্যটন করেন। তৎকালে সমগ্র ভারত-বর্ষে অশীতি সংখ্যক রাজ্য বিদ্যমান ছিল; এতন্মধ্যে অনেক অধিপতি করদ রাজা ছিলেন।

হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গের সময়ে কাবুল, জালালাবাদ, পেশওয়ার, গজনী এবং বান্ধ প্রদেশে যে সকল হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা কাপা-সিয়ার পরাক্রান্ত নরপতির করদ ছিল। কাশ্মীরে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজবংশের আধিপত্য ছিল। পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলা, সিংহপুরা, উরশা, পুনাক প্রভৃতি রাজ্যের শাসনপতি কাশ্মীরাধিপতিকে কর প্রদান

করিতেন ; মুলতান ও সরকট রাজ্যদ্বয় তাকি রাজ্যের অধীন ছিল। তাকিরাজ্যের রাজধানী লাহোরের নিকটবর্ত্তীস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিন্ধুদেশে শূদ্রকুলোদ্ভব বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেন। সিন্ধু-রাজ্যের পার্শ্বেই বল্লভী এবং গুর্জ্জর নামে দুইটি রাজ্য দেখিতে পাওয়া যাইত।

কনৌজের অধিপতি শিলাদিত্য ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নর্ম্মদা নদীর কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক রাজা তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। সুদূরবর্ত্তী কামরূপের অধিপতি কুমারও তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন।

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ মগধের গৌরব ও বৈভব অতীতের কুক্ষিগত দেখিয়াছিলেন। তৎকালে পাটলীপুত্র নগরের ভগ্নদশা উপস্থিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যে দেশ বঙ্গদেশ নামে পরিচিত হইতেছে, তাহা পাঁচ স্বতন্ত্র রাজ্যে (পৌণ্ড্র বর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণ-সুবর্ণ) বিভক্ত ছিল। এই পঞ্চ রাজ্যের অন্যতম রাজ্য কর্ণসুবর্ণ পরাক্রান্ত ছিল। এই রাজ্যের অধিপতি শশাঙ্ক কনৌজের অধিপতি শিলাদিত্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ বর্দ্ধনকে রণক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এই রাজ্যের যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পতন দশার বিবরণ। কলিঙ্গদেশ বন জঙ্গলে পূর্ণ এবং বন্যহস্তীর আবাস রূপে পরিণত হইয়াছিল। কলিঙ্গ রাজ্য অতিক্রম করিলে অন্ধ্র, কোঙ্কন, কোশল, ধনককট প্রভৃতি রাজ্য দেখিতে পাওয়া যাইত।

দক্ষিণভারতে মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রবল প্রতাপ ছিল। তৎকালে

রাজা পুলকেশী মহারাষ্ট্রের রাজসিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করিতেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার সাতিশয় বাধ্য ও অনুগত ছিল। কনৌজের অধিপতি পুলকেশীকে পরাজিত করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু পুলকেশীই রণক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিয়া স্বরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ছিলেন।

চিরপ্রসিদ্ধ মালব, সৌরাষ্ট্র, প্রভৃতি রাজ্য বিদ্যমান ছিল। হিউএনৎসঙ্গের মালব গমনের ষাট বৎসর পূর্ব্বে শিলাদিত্য নামক একজন অসামান্য ধীমান্ ও বিদ্বান্ নরপতি মালবদেশে রাজত্ব করিতেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরবদেশীয় মোসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইহাই মোসলমান কর্ত্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ। এই আক্রমণের পাঁচশত সাতান্ন বৎসর পরে পাঠান জাতীয় মোসলমানগণ উত্তরভারতে অধিকার স্থাপন করেন। প্রাগুক্ত সময়ের মধ্যে, কতিপয় আরব্যলেখক পর্য্যটন বা বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত ভারতবিবরণী হইতে আমরা কতিপয় রাজ্যের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাকি। আমরা এখানে সেই সকল রাজ্যের নাম উল্লেখ করিতেছি। বল্লার (বল্লভীপুর), জুরজ (গুজরাট), তাফন (ঝিলাম ও সিন্ধুনদের মধ্যস্থিতরাজ্য,) রুমি (পূর্ব্ববঙ্গস্থিত একটি রাজ্য), কাসবিন, ঘান, কামরুন (কামরূপ), যাব এবং কুমার (কুমারিকা অন্তরীপ এবং ত্রিবাঙ্কুরের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য), কাশ্মীর, কনৌজ, কিরঞ্জ।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অলবেরুনী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, কনৌজ ভারতবর্ষের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত। কনৌজ যে কেবল ভৌগলিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থানুসারেই ভারতবর্ষের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত, তাহা নহে, রাজনৈতিক হিসাবেও ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্বরূপ সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

অলবেরুনী উজ্জয়িনীর নাম উল্লেখ করিয়া তারপর লিখিয়াছেন, উজ্জয়িনীর পশ্চিমদিকে ধার নামধেয় নগর অবস্থিত। এই নগর মালবরাজ্যের রাজধানী। ধার নগর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলে মহারাষ্ট্র দেশে উপনীত হইতে হয়, তারপর কঙ্কন দেশ ; কঙ্কন দেশের রাজধানীর নাম টান। গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রের উপকূলে প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির অবস্থিত ছিল।

এইস্থান হইতে অনতিদূরে (গুজরাটের রাজধানী) অনহিলবার (পত্তন) অবস্থিত। অনহিলবার হইতে দক্ষিণদিকে লার নগরে উপনীত হইতে হয়। তারপর বিরোজ এবং রিহঞ্জর নামক রাজ্যদ্বয়ের রাজধানী পাওয়া যায়। এই উভয় নগরের পাদমূলই সাগর জল রাশি দ্বারা বিধৌত হইতেছে।

অলবেরুনী কাশ্মীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ হিন্দুজাতির শাসনাধীন। পশ্চিমাংশে কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। উত্তর ভাগ এবং পূর্ব্বভাগের কিয়দংশে খোতান ও তিব্বতের তুর্কিগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম

খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব স্বধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইহার তিন শত বৎসর পরে ধর্ম্মপ্রাণ অশোকের অপূর্ব্ব সাধনায় সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল এবং অন্যূন সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল।

এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে অসংখ্য ভারতীয় নরপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, অশোক, কনিষ্ক, শিলাদিত্য প্রভৃতি চিরখ্যাত রাজন্যবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকল্পে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁহারা জ্ঞানানুরাগী ও বিদ্যার উৎসাহ দাতা ছিলেন। এক একটি বিহারে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ অবস্থিতি করিয়া

শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। বৌদ্ধ রাজন্যবৃন্দ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যাপন জন্য তাঁহারা জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেন; এই সকল কার্য্যে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধশাস্ত্রানুমত চিকিৎসালয়, অন্নসত্র, পশু-চিকিৎসালয় প্রভৃতি শুভকর অনুষ্ঠানে তাঁহাদের অগাধ ব্যয় ছিল

বৌদ্ধধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্ম

তাদৃশ রাজবল লাভ করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিদ্বন্দ্বী আর্য্যধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক-লেখকগণের গ্রন্থে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্তম্ভ স্বরূপ শ্রমণগণের বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ ব্রাহ্মণগণের বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ আছে। তৎকালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ সমান সম্মানভাজন ছিলেন। বৌদ্ধগণ বর্ণভেদ মানিতেন না। গ্রীক-লিখিত বৃত্তান্তে নানাবর্ণের লোকের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁহাদের বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, গ্রীক-লেখকগণ বৌদ্ধ ও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মীদের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন নাই।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম খৃঃ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা

মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক-লেখকগণের আবির্ভাবের ন্যূনাধিক আটশত বৎসর পরে বহুসংখ্যক চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে মহারাজ অশোক নির্ম্মিত বৌদ্ধস্তূপাদি সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তৎসমুদয়ের অনেকগুলিই ভগ্নস্তূপে পরিণত হইতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যগণ নানাপ্রকার মূর্ত্তি উপাসনা প্রচলিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ উৎসব সমূহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত; এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার কুসংস্কার বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালের রাজন্যগণ বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগীই

হউন বা আর্য্যধর্ম্মানুরাগীই হউন, সমভাবে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন। সর্ব্বত্রই আর্য্য-দেবালয় ও বৌদ্ধ-মঠ পাশাপাশি দৃষ্ট হইত। আর্য্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট হইতে মূর্ত্তি উপাসনা গ্রহণ করিয়া অভিনব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নূতন উদ্যমে মস্তক উত্তোলন করিবার উপক্রম করিতেছিল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ অলবেরুনী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় ভারতীয়গণ হিন্দু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অলবেরুনী হিন্দুধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্ণের বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তদীয় গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের বিবরণ অতি সামান্য; তাহাও ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ। ফলত: নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল।

অলবেরুনীর সময়ে ভারতীয়গণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

হিন্দুগণের পরমেশ্বর এক এবং অনন্তকাল স্থায়ী, তাঁহার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। তিনি আপন ইচ্ছামত কর্ম্মশীল, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞানবান, জীবন্ত, জীবনপ্রদ, শাসক, পালনকর্ত্তা; তাঁহার রাজশক্তি অসাধারণ ও সমস্ত সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যের অতীত; তিনি কোন পদার্থের সদৃশ নহেন, অথবা কোন পদার্থও তাঁহার সদৃশ নহে।

আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃতি।

হিন্দুগণ দেবোপাসক; তাহাদের শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। এই সকল দেবতায় মানব-সুলভ আহার বিহার এবং মৃত্যু আরোপিত হইয়াছে। এই দেবগণের অন্তস্তলে তিনটি মূলশক্তি বিদ্যমান,—ব্রহ্মা, নারায়ণ এবং রুদ্র। এই তিন শক্তির মিলিত নাম বিষ্ণু। ব্রহ্মা আদিকারণ, নারায়ণ শাসনকর্ত্তা এবং রুদ্র

বা শঙ্কর সংহার কর্ত্তা। হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, তীর্থ দর্শন করিলে পুণ্য সঞ্চয় ও আত্মার সদ্গতি লাভ হয়। এই কারণ তাহারা পুণ্যভূমি দর্শন, দেবমূর্ত্তির পূজা অর্চ্চনা এবং পুণ্যতোয়া নদীতে অবগাহন করিবার উদ্দেশ্যে তীর্থ স্থানে গমন করে। হিন্দুগণ উপবাস এবং নানাপ্রকার ধর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে।

বৌদ্ধকালের পরবর্ত্তী হিন্দুধর্ম্মের দুইটি প্রধান অঙ্গ বর্ণভেদ ও মূর্ত্তি উপাসনার মধ্যে মূর্ত্তিউপাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে, আর বর্ণভেদ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনেও উহা নিমজ্জিত হয় নাই।

ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য ছিল। গৌরবর্ণ আর্য্যগণ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া এই কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আপনাদের গৌরবর্ণের জন্য গৌরব অনুভব করিয়া তৎরক্ষার্থ সাতিশয় অবহিত হইয়াছিলেন। এই ভাবেই প্রথমে ভারতবর্ষে মানুষে মানুষে ভেদ জন্মিয়াছিল এবং সে ভেদের নাম বর্ণভেদ প্রদত্ত হইয়াছিল। তারপর কার্য্যভেদে গৌরবর্ণ আর্য্যগণও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমতঃ একবর্ণের লোক অন্য বর্ণে গৃহীত হইতে পারিত; এক বর্ণীয় লোকের সঙ্গে অন্য বর্ণীয় লোকের আহার ব্যবহার বাধাহীন ছিল; এক বর্ণীয় লোকে অন্য বর্ণ হইতে পত্নী গ্রহণ করিত। ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ক প্রমাণের আভাস গ্রীক ও চৈনিক লেখকগণের বৃত্তান্ত হইতেও পাওয়া যায়।

বর্ণভেদ।

মেগাস্থিনিসের আগমনের বহুপূর্ব্বেই কার্য্যভেদে বর্ণভেদ জন্মিয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয়গণ সাত বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। "যথা, ধর্ম্ম ও বিদ্যা ব্যবসায়ী, রাজ-পারিষদ ও

কর্ম্মচারী, চর বা দূত, যোদ্ধা, গো মেষ-রক্ষক, কৃষক এবং নানাবিধ শিল্প ব্যবসায়ী লোক। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উপরি উক্ত সাতটি বর্ণ শাস্ত্রবর্ণিত চারি বর্ণের রূপান্তর মাত্র। ধর্ম্ম ও বিদ্যা ব্যবসায়ী, রাজপারিষদ ও কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ নহে; তবে কতক ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম ও বিদ্যা অনুশীলন করিতেন, কেহ কেহ রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন; সুতরাং বিদেশীয় দর্শক দুই সম্প্রদায়কে দুই বর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যোদ্ধাগণ ক্ষত্রিয়। গো মেষ-রক্ষক, কৃষক, ও শিল্প ব্যবসায়িগণ বৈশ্য ও শূদ্র হইবে। গুপ্তচর ও দূতদিগকে গ্রীকগণ ভ্রমক্রমে একটি ভিন্ন বর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপরি উক্ত গ্রীক-বিবরণে দাসের নামোল্লেখ মাত্র নাই, এবং এরিয়ন স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে দাস নাই, সকলেই স্বাধীন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিন শতাব্দী পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে শূদ্রগণ আর দাস ছিল না; তাহারা নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত।" (১)

হিউএন্থ্ সঙ্গের গ্রন্থে ভারতীয়গণের চতুর্ব্বর্ণের বিষয় সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। হিন্দুজাতি চারি বর্ণে বিভক্ত। প্রথম ব্রাহ্মণ;—ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ চরিত্র, ধর্ম্মই তাঁহাদের রক্ষক, তাঁহারা সদাচার সম্পন্ন এবং সুনীতিপরায়ণ। দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়;—ক্ষত্রিয়গণ রাজজাতীয়; বহুকাল হইতে তাঁহারা দেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন; তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ এবং দয়াশীল। তৃতীয় বৈশ্য;—বৈশ্যগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ী; ইঁহারা দেশে বিদেশে বাণিজ্যে নিযুক্ত আছেন। চতুর্থ শূদ্র;—শূদ্রগণ কৃষি ব্যবসায়ী। এই চতুর্ব্বর্ণে জাতীয় বিশুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা অনুসারেই

(১) ৺রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস।

পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বিবাহকালে নূতন কুটম্বের পদমর্য্যাদা অনুসারে তাঁহাদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ণভেদ অধিকতর প্রসারিত ও দৃঢ় হইয়াছিল। এই প্রথা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে হীন ও অস্পৃশ্য করিয়া তুলিতেছিল। অলবেরুনী লিখিয়াছেন, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তাহার অপরাধ হইয়া থাকে। এই অপরাধ চৌর্য্যাপরাধের প্রায় তুল্য। যদি ব্রাহ্মণ ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হন, অথবা শূদ্র ভূমি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তবে ঐরূপ অপরাধ হয়। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বিবরণ অন্তে অলবেরুনী অন্ত্যজজাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে তদংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। শূদ্র অপেক্ষা নিম্নপর্য্যায়ভুক্ত হিন্দুরা অন্ত্যজ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা আট শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের গৃহীত ব্যবসায় অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। যথা, (১) চর্ম্মকার, (২) রজক, (৩) বাজিকর, (৪) নাবিক, (৫) ধীবর, (৬) শিকারী, (৭) তন্তুবায় এবং (৮) বাঁশকর। তন্মধ্যে রজক, চর্ম্মকার এবং তন্তুবায় ব্যতীত আর পাঁচ শ্রেণীতে পরস্পরে বিবাহের নিয়ম আছে। প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের সহিত এই সকল অন্ত্যজ জাতীয় লোকদের একত্র বাস করিবার প্রথা নাই। তাহারা নগর বা গ্রামের বহির্ভাগে অদূরে বাস করে। (১)

(১) হিউএন্থ সঙ্গের গ্রন্থ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে ধীবর, মাংসবিক্রেতা, নর্ত্তক নর্ত্তকী এবং সম্মার্জ্জক প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীরা নগর বা পল্লীর বহির্ভাগে বাস করিত। কিন্তু হিউএন্থ সঙ্গের বর্ণনার সঙ্গে অলবেরুনীর বর্ণনা তুলনায় পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার উদ্দেশ্যে যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা জাতিমূলক, প্রসারিত ও সাতিশয় কঠোর হইয়া দাঁড়ায়।

হাড়ি, ডোম এবং চণ্ডাল নামে বহুসংখ্যক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা হিন্দু জাতির বর্ণ ও শ্রেণীর বহির্ভূত। এই সকল লোক নগর বা গ্রামের ময়লা পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত আছে। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল সঙ্কর জাতি নামে পরিচিত।

শাসন প্রণালী এবং ব্যবস্থা

আলেকজণ্ডারের সহচর লেখকগণ ভারতবর্ষের রাজ্য শাসন ব্যবস্থা দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, উভয় প্রকার শাসন প্রণালী দেখিয়াছিলেন। আলেকজণ্ডারের পরবর্ত্তী মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক লেখকগণ ভারতীয় রাজ্যশাসন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে কাহারও প্রতি বাণিজ্য বিভাগের, কাহারও প্রতি নাগরিক বিভাগের, কাহারও প্রতি সৈনিক বিভাগের ভার ন্যস্ত আছে। কেহ বা নদ নদী এবং ভূমি পরিমাপের কার্য্য পরিদর্শন করেন। শিকারীদিগের তত্ত্বাবধান করিবার এবং তাহাদের দোষ গুণ বিচার করিয়া দোষ গুণানুযায়ী শাস্তি পুরস্কার দিবার ভারও এই সকল কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। ইঁহারা কর আদায় করেন এবং কাঠুরিয়া, সূত্রধর, লৌহ কর্ম্মকার এবং খনিজ পদার্থ উত্তোলনকারীদিগের কার্য্য পরিদর্শন করেন। ইঁহারা পথ নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন।

যাহাদের প্রতি নাগরিক কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, তাহারা ছয় দলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দলে পাঁচ জন করিয়া কর্ম্মচারী। প্রথম দলের কর্ম্মচারী সাধারণতঃ দেশীয় শিল্পের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। দ্বিতীয় দলের কর্ম্মচারী প্রধানতঃ বিদেশীয়দের আদর অভ্যর্থনাদি কার্য্য পরিদর্শন এবং তাহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের যোগে তাহাদের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার

ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দলের কর্ম্মচারী সমস্ত অধিবাসীদের জন্ম মৃত্যুর তালিকা সংগ্রহ করেন। চতুর্থ দল ব্যবসায় বাণিজ্যের বিষয় পরিদর্শন করেন। পঞ্চম দল কল-কারখানায় নির্ম্মিত সমস্ত বস্তু সাধারণের জ্ঞাত সারে বিক্রয় করেন। ষষ্ঠ দল, যত জিনিস বিক্রয় হয়, তাহার মূল্যের দশম ভাগ রাজার অংশরূপে আদায় করেন। এই সমস্ত দল উপরি উক্ত কার্য্য সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে সম্পন্ন করেন। প্রত্যেক দলের উপর পৃথক পৃথক কার্য্যভার ন্যস্ত রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত যে সকল বিষয়ের উপর সাধারণের হিতাহিত নির্ভর করে, তাহা সকলেরই দেখিতে হয়, যথা—সরকারি দালানাদির উপযুক্ত সংস্কার, জিনিস পত্রের উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ এবং বাজার বন্দর ও মন্দিরের তত্ত্বাবধান। সৈন্য বিভাগের কার্য্য পরিচালন জন্য এক শ্রেণীর শাসন কর্ত্তা আছেন, ইহারাও ছয় দলে বিভক্ত। পাঁচ পাঁচ জন কর্ম্মচারী লইয়া এক একটি দল। এক দলের কর্ম্মচারিগণ নৌ-সেনার তত্ত্বাবধান করেন; দ্বিতীয় দলের কর্ম্মচারিগণ অস্ত্র শস্ত্র, সৈনিক পুরুষ ও যুদ্ধে নিয়োজিত পশ্বাদির খাদ্য এবং যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বহনোপযোগী গোযানাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই দলের লোক যুদ্ধের সময় ঢাক ও ঘণ্টা বাজাইবার জন্য পরিচারক ও রণতুরঙ্গের জন্য সহিস এবং যন্ত্রাদি নির্ম্মানের জন্য শিল্পী সংগ্রহ করিয়া দেন। তৃতীয় দল পদাতিকগণের তত্ত্ব লইবার জন্য নিযুক্ত হন। চতুর্থ দল যুদ্ধ তুরঙ্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন। পঞ্চম দল যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্যে এবং ষষ্ঠ দল রণকুঞ্জরের তত্ত্বাবধানে সময় অতিবাহিত করেন।

ঈদৃশ সুব্যবস্থিত শাসনপ্রণালী ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া অনুমান করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে; সমস্ত রাজা একই প্রণালীতে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এরূপ অনুমান

করিবার কোন হেতু নাই। তৎকালের শ্রেষ্ঠ নরপতি চন্দ্রগুপ্তের শাসিত দেশে যে প্রকার শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল, মেগাস্থিনিস কেবল তাহাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতৎ স্বত্বেও তাঁহার বর্ণনা হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী কীদৃশ ছিল, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

গ্রীক-লেখকগণ কর্তৃক প্রশংসিত ভারতীয় শাসন প্রণালী ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্থ্ সঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বহু বৎসর বাস করিয়া প্রায় সমস্ত রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতবর্ষের সুব্যবস্থিত শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বগ্রন্থে রাজা কর্তৃক প্রজা পীড়নের বিষয় কিঞ্চিৎমাত্রও উল্লেখ করেন নাই; তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের এই রূপ প্রতীতি জন্মে যে, রাজশাসন গুণে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রকৃতিপুঞ্জ সমৃদ্ধ, সন্তুষ্ট এবং রাজানুরাগী ছিল। হিউএন্থ্ সঙ্গ ভারতীয় শাসন প্রণালীর যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনোজ্ঞ; আমরা তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ভারতবর্ষের রাজনীতি প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলজনক বলিয়া শাসন কার্য্য সহজ। রাজা প্রজাবর্গকে বলপূর্ব্বক শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বিরত রহিয়াছেন। রাজন্যবর্গের ভূম্যধিকার প্রধান চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের লভ্য দ্বারা রাজকীয় কার্য্য এবং পূজাঅর্চ্চনার নিজস্ব ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়, দ্বিতীয় অংশের লভ্য মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর অর্থানুকূল্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তৃতীয় অংশের লভ্য দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ গুণবান ব্যক্তিগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়, চতুর্থ অংশের লভ্য ধর্ম্মসভা ও ধর্ম্ম ক্ষেত্র প্রভৃতিতে দান করিয়া সুবৃত্তি সকলের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করা হইয়া

থাকে। এই হেতু প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক দেয় রাজকরের পরিমাণ অল্প; এতদ্ব্যতীত যে সময়ের জন্য তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে হয় তাহার পরিমাণও অপরিমিত নহে। প্রত্যেকেই শান্তিতে স্ব স্ব ধন সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। সকলেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে। যে সকল বণিক বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিরত রহিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন জন্য স্ব স্ব ইচ্ছামত গমনাগমন করেন। যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান করিলেই জল ও স্থল পথ সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য আবশ্যক হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ কাজ করিয়া দিতে বাধ্য হয়; কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবার নিয়ম আছে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ কাজ করে, তাহাকে ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ প্রদত্ত হয়।

সৈনিকগণ সীমান্ত স্থান সমূহ রক্ষা করে, অথবা প্রয়োজন মত অবাধ্যদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বহির্গত হয়। সৈনিকগণ রাত্রিকালে অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পাহারা দেয়। প্রয়োজন মত সৈন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে; এই সৈন্য সংগ্রহের কার্য্য সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে নিষ্পন্ন হয়। তৎকালে রাজপুরুষগণ নবনিযুক্ত সৈন্যদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন। শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রী, নগরপাল এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব ভরণ পোষণ নির্ব্বাহার্থে ভূমি লাভ করেন। জনমণ্ডলী মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, তাহারাই কেবল সৈনিকের পদে নিয়োজিত হয়।" এই সকল সৈন্য রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ শিবিরে বাস করে। ভারতীয় সৈন্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ এবং হস্তী। সারথি আদেশ প্রদান করে, তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থিত পরিচারকগণ রথ পরিচালনা করে। রথ পরিচালনের জন্য অশ্ব চতুষ্টয় নিযুক্ত হয়। সেনাপতি উপবিষ্ট থাকেন; রক্ষী সৈন্য তাঁহাকে

চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্ঠন পূর্ব্বক রথ-চক্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া গমন করে। পদাতিক সৈন্য শত্রুর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যূহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় এবং পরাজিত হইলে আদেশ লইয়া ইতস্ততঃ গমন করে। অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতগতিতে যুদ্ধের সাহায্য করে। শারীরিক বল ও সাহসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অশ্বারোহী সৈন্য নির্ব্বাচিত হয়।

রাজকর এবং শুল্ক

প্রাচীন ভারতের রাজন্যবৃন্দ প্রজার হিতকর প্রণালীতে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজার নিজব্যয় ও শাসন কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রজাবর্গের নিকট হইতে কর গৃহীত হইত। কিন্তু সে করের পরিমাণ অত্যধিক ছিল না। মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভূমির উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। আমরা হিউএন্থ্ সঙ্গের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ঐ ভূমিকর এক ষষ্ঠাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কৃষক, শ্রমজীবী ও বণিক এই তিন শ্রেণী হইতে কর আদায় হইত। এতৎ সম্বন্ধে অলবেরুনী লিখিয়াছেন—গবাদি পশু এবং শস্য হইতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহার একাংশ রাজকর রূপে দিতে হয়। গোচারণ ভূমি এবং শস্য-ভূমির জন্য এই কর। এতদ্ব্যতীত ধন সম্পত্তি এবং পরিবার পরিজনের রক্ষার জন্য রাজা প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে তাহার উপার্জ্জিত ধনের এক ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন। যাহারা কৃষক এবং পশুপালক তাহাদিগকেও এই কর দিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে, তাহারা শুল্ক প্রদান করে। ব্রাহ্মণগণের নিকট রাজ কর গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই।

বিচার এবং দণ্ড

স্বয়ং রাজা এবং তদীয় কর্ম্মচারিগণ বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা দিবসে নিদ্রা যাইতেন না, বিচার গৃহে থাকিয়া সমস্ত দিন বিচার করিতেন। ভারতীয় বিচারপ্রণালী অতি সরল ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষ, কি

সদোষ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষা করিবার নিয়ম ছিল। এইরূপ পরীক্ষা প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ বিদেশীয় লেখকবর্গের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারকগণ বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত বিষয় ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতেন। কোন প্রকার দুষ্কার্য্যের অনুসন্ধান কালে সাক্ষীকে বেত্র বা লগুড় দ্বারা পীড়িত করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল। বৈদেশিক পর্য্যটক মাত্রেই ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধি কঠোরতাবর্জ্জিত ছিল। কিন্তু কোন কোন অপরাধে অপরাধীকে বিকলাঙ্গ করিবার নিয়ম ছিল। হিউএন্থ সঙ্গ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে সশ্রম দণ্ড বিধানের নিয়ম ছিল না। অপরাধীর যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দণ্ড হইত। অলবেরুনী ভারতীয় দণ্ড ব্যবস্থার প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশ (একগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অন্য গণ্ড আঘাতকারীর সম্মুখে আনয়ন করিবে) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ব্যভিচার অতি গুরুতর অপরাধরূপে পরিগণিত ছিল। তাদৃশ অপরাধের দণ্ডও অতীব কঠোর ছিল। অলবেরুনীর গ্রন্থ পাঠ করিলে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, বর্ণ ভেদানুসারে দণ্ডের তারতম্য হইত। মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক লেখক বৃন্দ লিখিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুগণ এরূপ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে, তাঁহারা রাজদ্বারে গমন করিতেন না।

সুরাপান

আলেকজণ্ডারীয় যুগে হিন্দুরাজন্যবৃন্দ সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ যজ্ঞের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে মদ স্পর্শও করিত না। ইহার পরবর্ত্তী-কালে সুরাপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যাহারা সুরাপান করিয়া আপনাদের চরিত্র কলুষিত করিত, তাহারা হিন্দু সমাজে সাতিশয় তিরস্কৃত হইত। কোন রাজার সুরাপান দোষ জন্মিলে

তাঁহাকে রাজ্য শাসনের অযোগ্য বলিয়া রাজ্যচ্যুত করা হইত।

ভারতীয় রাজন্যগণ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত ছিলেন; কদাচিৎ কোন স্থানে অন্য বর্ণীয় নরপতি দেখিতে পাওয়া যাইত। ব্রাহ্মণগণ রাজকার্য্যের সহায়তা করিতেন। কিন্তু সাধারণতঃ পার্থিব বিষয় তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইত; নিন্দা বা প্রশংসায় তাঁহাদের চিত্তের কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইত না। তাঁহারা কেবল আত্মবলে নির্ভর করিয়া জ্ঞানান্বেষণে নিরত থাকিতেন। দেশাধিপতি তাঁহাদের গুণ গ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। জনমণ্ডলী তাঁহাদের যশোরাশি বর্দ্ধিত করিয়া তুলিত এবং অকুণ্ঠিত ভাবে তাহাদের নিকট অবনত হইত।

রাজকুল, ব্রাহ্মণ

বিদেশীয়গণের গ্রন্থ সমূহে যে কেবল ব্রাহ্মণকুলের প্রশংসাবাদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে; সাধারণতঃ ভারতবাসী মাত্রেই চরিত্রগুণে গরীয়ান ছিল; বিদেশীয় লেখকগণ মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা ন্যায়পরায়ণ এবং অপকার্য্য-বিমুখ ছিল। তাহাদের ব্যবহার প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা শূন্য ছিল। তাহারা পরকালের ভয়ে বিচলিত হইত। ইহারা কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া চুক্তি করিত। ইহাদের মধ্যে চৌর্য্য অতি বিরল ছিল, লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থায় থাকিত। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। কেহ প্রতারিত হইলে স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই পরিতৃপ্ত হইত। ভারতীয়গণ মিতাচারী ছিল। তাহারা অনেক সময় পার্থিব বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিত। তাহাদের বাক্যে ও কার্য্যে সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত।

ভারতবাসীর গুণাবলী

অলবেরুনীর সময়ে (খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে) ভারতবাসীর তাদৃশ উন্নত চরিত্র কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

এই গুণোপেত জাতির সামাজিক ব্যবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান সামাজিক ক্রিয়া বিবাহ; কত বয়সে পাত্রপাত্রীর বিবাহ হইত, তৎসম্বন্ধে পর্য্যাটকগণের বৃত্তান্তে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কেবল অলবেরুনী লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণ পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া দ্বাদশ বর্ষানধিকা কুমারীর পাণি গ্রহণ করিতেন। অন্যান্য বৃত্তান্ত স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও অনুমিত হয় যে, স্ত্রী-পুরুষের যৌবন বিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। ষ্ট্রাবো কর্ত্তৃক উল্লিখিত পাত্র নির্ব্বাচন প্রণালী পাঠ করিলে স্বয়ংবর প্রথার স্মৃতি উদয় হইয়া থাকে। চৈনিক পরিব্রাজকগণ অসবর্ণ বিবাহের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রথা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সকল যুগেই পুরুষের বহু বিবাহ সংঘটিত হইত। বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। ভারত নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে আলেকজণ্ডারের সহচর লিখিয়াছেন যে, আর্য্যরমণী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়া দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী পর্য্যাটকদের প্রদত্ত বিবরণানুসারে তাঁহাদের জ্ঞানার্জ্জনের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়াছিল। আরব্য-লেখকগণের বিবরণ পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, রাজান্তঃপুরিকাগণ অনবগুণ্ঠনে রাজসভায় আগমন করিতেন। সর্ব্বশ্রেণীর পর্য্যাটকবৃন্দ সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন যে, সহমরণ ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা। কেবল যে রমণী বৃন্দই আত্মনাশে অভ্যস্তা ছিলেন, তাহা নহে; ভারতীয় পুরুষবর্গও জরাগ্রস্ত অথবা পীড়াগ্রস্ত হইয়া আত্মনাশ করিতেন; প্রয়াগ তীর্থে গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জ্জন পুণ্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

সামাজিক অবস্থা

সম্পূর্ণ।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত

মোগল-বংশ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।)

সুবৃহৎ গ্রন্থ, কাপড়ের বান্ধাই,

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে চেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর শাহজাহান, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি সমুদয় মোগল-সম্রাটের বিবরণ এবং মোগলজাতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি, মোগল-সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী, অধঃপতন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় অতি প্রাঞ্জল-ভাষায় বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে আবুল ফজল, নিজাম উদ্দীন, বদায়ুনি, ফেরিস্তা, খাফি-খাঁ এবং গোলাম হোসেন প্রভৃতি বিখ্যাত মোসলমান ঐতিহাসিকবৃন্দের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই। কতিপয় সুবিখ্যাত সমালোচকের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইতিহাস লিখিবার দুইটা পদ্ধতি আছে। এক রাজকীয় ঘটনা বিবৃতি; দ্বিতীয় সামাজিক বিবর্ত্তনের বিবৃতি। রামপ্রাণ বাবুর পুস্তক দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহার পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার প্রশংসা করিতেছি; কিন্তু পরিশ্রম যে সর্ব্বথা সার্থক হইয়াছে, এ কথা বলিতে পারিতেছি না। তাহা সম্ভবও নয়। চেঙ্গিস্ খাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারতবর্ষের সম্রাট্ আলমগীর পর্য্যন্ত সকল ঘটনার যথাযথ আখ্যান ও ব্যাখ্যা,

এইটুকু পুস্তকে তাহা সম্ভব নয়। দিল্লীর বাদসাহদিগের যে চরিত্র চিত্রণ পাইলাম, তাহা মনোজ্ঞ; কিন্তু তৃপ্তিকর নহে। উপরেই বলিয়াছি, তাহা এত ছোট পুস্তকে সম্ভব নয়। যাহা সম্ভব, তাহার জন্য রামপ্রাণ বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি ও আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ভরসা করি, যাহার সাধ্য আছে তিনি এই পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। তাহাতে সময় এবং অর্থ কিছুরই অপব্যয় হইবে না।—উপাসনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

We all knew that Babu Ram Pran had been writing this book. For chapters of the book were published in Bengalee Magazines announcing the advent in our midst of a laborious and careful student of Indian History. Baboo Ram Pran has written the history of India during the Moghul period, and his labour has been richly rewarded because the accounts of the period are far from scarce. * * * Babu Ram Pran lacks imagination, but not laboriousness. He is always direct and to the point and compresses much information within small space. He weighs evidence very carefully, and is always interesting; on the whole the book is a very successful production.—Calcutta Review, April, 1905.

* * রামপ্রাণ বাবুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সবিশেষ প্রশংসার্হ। ঐতিহাসিক তথ্যগুলি গুছাইয়া বেশ সরল ও সুললিত ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট আছে। ইতিহাস অনুশীলন ও চর্চ্চা দ্বারা রামপ্রাণ বাবু যথেষ্ট কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়াছেন।—বঙ্গবাসী, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩১১।

* * একজন সুনিপুণ Non Moslem সাহিত্য শিল্পীকে মুসলমানের জীর্ণ কীর্ত্তিস্তম্ভে যোগ্য তুলিকায় নূতন করিয়া রং ফলাইবার জন্য বিপুল কষ্ট স্বীকার করিতে দেখিলে, বাস্তবিকই হর্ষোৎসাহে অভিভূত হইতে হয়। প্রীতিগতপ্রাণ রামপ্রাণ বাবু যে উদার উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত, তাহা তৎপ্রণীত হজরত মোহাম্মদ পুস্তকই আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার নূতন গ্রন্থ মোগলবংশেও তাহাই স্পষ্টতর প্রতীয়মান হইল। অধিকন্তু "অধঃপতিত ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন জন্য হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন আবশ্যক" ইহা উল্লেখ করিয়া, গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এজন্যও "মোগল ইতিহাস আমাদের প্রণিধান যোগ্য।" যেহেতু "হিন্দু মুসলমানের জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতীতি জন্মিলে, সম্মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে, আশা করা যায়।" * * রামপ্রাণ বাবুর এ ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য নহে। যে সকল সূক্ষ্ম মোগলতত্ত্ব তিনি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং বাঙ্গলা ঐতিহাসিক-সাহিত্যের প্রকোষ্ঠে মোগলবংশ যে উচ্চ স্থানের যোগ্য, তাহাতে আর সন্দেহই নাই। মোগলবংশের ভাষা প্রাঞ্জল এবং ইতিহাসের অনুরূপ চিত্তাকর্ষী। রচনা-প্রণালী সৌন্দর্য্যবত্তায় গরীয়সী। "বস্তুতঃ আমার শক্তি সামান্য, ভাষা দরিদ্র এবং লিপিকৌশল অকিঞ্চিৎকর।" লেখকের এ উক্তি, বিনীত ত্রুটী স্বীকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। গ্রন্থে এ উক্তির বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হইবে।

আর একটী বিষয়ে রামপ্রাণ বাবু বেশ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। হিন্দুর লেখনী, মুসলমানী নামগুলি বাঙ্গালায় যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছে, ইহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। খরম, খদিসা, রজক প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ বারান্তরে সংশোধিত হইলেই এ সম্বন্ধে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইবে। কৃতী মুসলমান ঐতিহাসিকগণের সংক্ষিপ্ত-জীবনী-সম্বলিত পরিশিষ্ট মোগল-বংশের সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যই সাধন করিয়াছে।

মোগলবংশ কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে থাকিবার পুস্তক নহে। তাহা বিশ্বজনীন সমাচারলাভের যোগ্য। রামপ্রাণ বাবুর লেখনী ধন্য হউক। তিনি হতভাগ্য মুসলমানসমাজের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের পথে সুদীর্ঘকাল ব্রতী ও শক্তিসম্পন্ন থাকুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। —নবনূর, ফাল্গুন, ১৩১১।

ইতিহাসপাঠেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। —বসুমতি, ২২ শে মাঘ, ১৩১১।

For a petty long time the History of the Moghul Emperors, the Moghul Vansa, by Babu Ram Pran Gupta of Tangail is lying on our table, and we regret, up to now we failed to have our say on it for want of space and time. We have gone through the handy volume, and can confidently say that with its very few defects here and there, it is the best record of the Moghul Period. The author has ample capacity to deal with the matters with both grace and elegance. His style is happy, smooth and flowing. His delineation of the causes of the decline and fall of the Moghul Empire reflects great credit. The book is replete with facts ;

and we are sure, it will be read as a holiday reading * *—Amritabazar Patrika, Feb. 22, 1905.

শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় যে প্রকার যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে মোগল-ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষতঃ মুসলমানজাতি এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। * * মোগলবংশ পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ইহার পরিশিষ্টে মুসলমান ঐতিহাসিক-বৃন্দের জীবনীগুলি মনোজ্ঞ হইয়াছে। রাম বাবুর মোগল-ইতিহাস সঙ্কলনের পরিশ্রম জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী অমর হউক, তিনি মুসলমানের সত্য ইতিহাস প্রচার করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করুন।—সুলতান, ১৩ই আশ্বিন, ১৩১২।

রামপ্রাণ বাবু বঙ্গসাহিত্য-সমাজে পরিচিত, অনেক মাসিক পত্রে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। মোগলবংশে তাঁহার পূর্ব্বখ্যাতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। * * রামপ্রাণ বাবু বঙ্গীয় পাঠকের কৌতূহলতৃপ্তির জন্য মোগলবংশ লিখিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে বহুপরিমাণে সফলকাম হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। * * আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, রামপ্রাণ বাবু সংকীর্ণ আদর্শে ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই, এইজন্য মোগলবংশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। মোগলবংশ পাঠ করিলে, রাজত্ব সম্বন্ধে হিন্দুগণের অনেক ভ্রম দূর হইবে। * রামপ্রাণ বাবু ইংরাজী ও পারস্যভাষায় লিখিত বহু পুস্তকের

সাহায্য গ্রহণে দেখাইয়াছেন, অধিকাংশ মোগল-সম্রাট্ প্রজা-বৎসল ছিলেন, সমভাবে হিন্দু মুসলমানের উন্নতি এবং মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। মোগলবংশ পাঠে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষভাব দূর হইয়া উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। যিনি এই শুভ উদ্দেশ্যে পুস্তক লিখিয়া থাকেন, তাঁহার লেখনীধারণ সার্থক ; রামপ্রাণ বাবু বাঙ্গালীজাতির একজন অকৃত্রিম সুহৃদ।

রামপ্রাণ বাবুর লিপিকৌশল প্রশংসনীয়, ভাষা বিশুদ্ধ এবং মার্জ্জিত। তিনি মোগল-রাজত্ব সম্বন্ধে গভীর তমসাচ্ছন্ন বহু তত্ত্বের সন্ধান লইয়াছেন, শ্রম ও যত্নে কুণ্ঠিত হন নাই। * * * মোগলবংশ বঙ্গ-সাহিত্যে সুস্থান পাইবার যোগ্য।—চারু মিহির, ১৪ই পৌষ, ১৩১২।

সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এখানি বঙ্গদেশে যথেষ্ট আদৃত হইবে।—প্রবাসী, চৈত্র, ১৩১১।

কে বলে বাঙ্গালা ভাষা কেবলই নাটক নভেল লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে ? যাঁহারা এইরূপ অসঙ্গত উক্তি দ্বারা আমাদিগের প্রাণারাধ্য মাতৃভাষার অখ্যাতি খ্যাপন করেন, তাঁহারা রামপ্রাণ বাবুর মোগল বংশ লইয়া মাসেক কাল পরিশ্রম করুন। আমরা "মাসেক কাল" এই শব্দটি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিয়াছি। মোগল বংশ সম্বন্ধে ইংরেজীতে অসংখ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। রামপ্রাণ বাবু কোন গ্রন্থেরই অনুবাদ করেন নাই। অথচ সকল গ্রন্থেরই সার সত্য উদ্ধার করিয়া স্বাধীন ভাবে আপনার মত ও সিদ্ধান্ত খ্যাপন করিতে যত্নবান হইয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাংশেই বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি এবং বাঙ্গালীর শিক্ষার পথে আনুকূল্য করিবে। * * ইদানীং বঙ্গে কতিপয় সুকৃতি লেখক ঐতিহাসিক পণ্ডিত বলিয়া আদর পাইয়াছেন। "মোগল বংশ" রচয়িতা শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত তাঁহাদিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য।—বান্ধব, ১৩১২।

রিয়াজ-উস-সালাতিন।

(দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে)

সুবৃহৎ গ্রন্থ, ৩৯৫ পৃষ্ঠা; কাগজের মলাট;

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

রিয়াজ-উস-সালাতিন ফার্সী ভাষায় লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত কতিপয় মৌলবীর সাহায্যে ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইহার ভূমিকা ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়দংশের পাদটীকা লিখিয়া দিয়াছেন। রামপ্রাণ বাবুর অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। উহার ভাষা প্রাঞ্জল ও গম্ভীর, ইতিহাসের পক্ষে সর্ব্বথা উপযোগিনী। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে অনেক সময়েই মনে থাকে না যে, আমরা অনুবাদ পাঠ করিতেছি। ইহা কম প্রশংসার কথা নহে।—সঞ্জীবনী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

* * We have absolutely no hesitation in stating that Mr. Gupta has shown the rare and

happy knack of expressing his ideas in a chaste and elegant style in his mother tongue. On its intrinsic merit, the translation under review is likely to find a prominent place in the historic literature of Bengal. * * * In short, the work reflects credit upon the diligent translator, whose reputation as a careful student of the Mahomedan period of the History of India has, for sometime past, been established in Bengal.—Indian World, July, 1906.

গুপ্ত মহাশয়ের অনুবাদ বিশদ, প্রাঞ্জল, এবং সরল ও সুললিত হইয়াছে। সুলতান, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪।

We wish, we had space enough to quote the exquisite portions of the book to show, how faithfully the author has performed the onerous task, and how beautifully have the rare and dry bones, been blended into a most harmonious and pleasing sketch—Amritabazar Patrika, May 27, 1907.

On a previous occasion we congratulated Babu Ram Pran on a book on the Moghuls in India. The book under review fully maintains the author's reputation. The book itself is extremely useful, and the notes by the translator are learned and accurate.—Calcutta Review.

Babu Ram Pan Gupta has made a valuable contribution to the historical lore of Bengal by translating in Bengali Golam Hossein's Riaz-us-

salatin. * * We have no hesitation in commending it to the favourable acceptance of our readers ; and we doubt not, on its own merit, it will be received with open arms by the Students of History.—The Bengalee. January 29, 1906.

রিয়াজ পড়িয়া মনে হইল যে, রামপ্রাণ বাবু এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার উত্তম অতীব প্রশংসনীয়।—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪।

এরূপ একখানি সর্ব্বজনমান্য প্রামাণিক ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া রামপ্রাণ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং আমাদের সকলেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। আমরা পরম সমাদরে বঙ্গ-সাহিত্যে এই পুস্তকের অভ্যর্থনা করিতেছি। রামপ্রাণ বাবু এই পুস্তকের জন্য প্রকৃত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।—উপাসনা, ৮ম সংখ্যা, ১৩১৪।

ব্রতমালা।

তিনখানা উৎকৃষ্ট হাফটোন চিত্র সম্বলিত।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

রামপ্রাণ বাবু এই ব্রতকথা সংগ্রহ করিয়া ভালই করিয়াছেন। * * এই সংগ্রহের জন্য রামপ্রাণ বাবু প্রশংসা পাইবার যোগ্য। বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া আমরা পুরুষকে বুঝিতে পারি ; কিন্তু স্ত্রীলোককে বুঝিতে না পারিলে সংসারের আধ খানা বুঝা যায় না। ব্রতকথা পড়িয়া আমরা স্ত্রীলোকদিগকে

বুঝিতে পারি, তাহাতে আমাদের ইতিহাস অধ্যয়ন সার্থক হয়।—উপাসনা, ১০ম সংখ্যা, ১৩১৫।

পাঠান রাজবৃত্ত।

২৩৯ পৃষ্ঠা ; মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে দিল্লীর পাঠান বংশীয় সুলতানগণের মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে. পাঠান রাজবৃত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিদ্যালয় সমূহের পুরস্কার ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত হইয়াছে।

ইস্‌লাম কাহিনী।

২৬৯ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা মাত্র।

বঙ্গবিখ্যাত পীর ও মুরশেদ মওলানা আবুবকর

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত বাবু রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত ইস্‌লাম কাহিনী নামক গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থকার এই পুস্তকের প্রথমে আমাদিগের অন্তিমের কাণ্ডারী হজরত মহম্মদ মোস্তফার (দঃ) জীবনী সংক্ষেপে লিখিয়া খোলফায় রাশেদিন প্রভৃতির জীবনী লিখিয়াছেন। পরে উম্মিয়া ও আব্বাস বংশের ইতিহাস লিখিয়া উপসংহার করিয়াছেন। পুস্তকখানি বিস্তৃত হইলে ভাল হইত। যাহাহউক, মোটের উপরে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধন্যবাদের পাত্র। এই পুস্তকে পড়িবার, পড়াইবার, শিখিবার, শিখাইবার অনেক জিনিস আছে। প্রত্যেক হিন্দু মুসলমানের ইস্‌লাম কাহিনী পাঠ করা কর্ত্তব্য।

সুপ্রসিদ্ধ ইস্‌লাম প্রচারক ও গ্রন্থকার মৌলবী শেখ জমির উদ্দীন

রিয়াজ-উস-সালাতিন ও মোগল বংশ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের কৃত ইস্‌লাম কাহিনী নামক গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আনন্দ সাগরে আপ্লুত হইলাম। * *

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শেখ রেয়াজ উদ্দীন আহাম্মদ

* * The book will be of great use both to teachers and learners * *

প্রসিদ্ধ আরব্য ভাষাবিদ মৌলভী আজিজ উদ্দীন

* * লেখক বহুসংখ্যক মোসলমানি ইতিহাস অবলম্বন করিয়া এই কেতাব রচনা করিয়াছেন। ইহা পড়িবার জিনিস ও সকলের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

খ্যাতনামা মৌলবী জামাল উদ্দীন

* * প্রত্যেক হিন্দু মোসলমানের ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

নবনূর (আষাঢ়, ১৩১০)

"মোহাম্মদ" নামক প্রবন্ধ আরতির বক্ষে এবার কোহিনূরের ন্যায় দীপ্তি বিকাশ করিতেছে। লেখক অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে এমন সুকৌশলে মহাপুরুষের গৌরবোজ্জ্বল জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করিতেছেন যে, আমরা তাহা বহুবার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই, আরও পড়িবার সাধ হইয়াছে। তাই সমাগত বন্ধু বান্ধবদিগকে পড়িয়া শুনাইয়া

নিজকে ধন্য মনে করিয়াছি। এই নিবন্ধটির অজ্ঞাত-নামা লেখক যিনিই হউন, তিনি মোসলমান সমাজের একান্ত ধন্য-বাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি মোসলমানের ধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই পুণ্যব্রত ঋষির ন্যায় অন্যকে সে জ্ঞান বিতরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার অমৃত নিষ্যন্দিনী লেখনীর উপর পারিজাত বর্ষিত হউক। আমরা বঙ্গ ভাষার প্রত্যেক মোসলমান পাঠককে এই প্রবন্ধটি যত্নের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় অধঃ-পতনের যুগে এইরূপ প্রবন্ধ অনুশীলনে বহু উপকারের সম্ভাবনা আছে। *

ভারতমহিলা (পৌষ ১৩১৮)

রামপ্রাণ বাবু বাঙ্গালা ভাষায় এই * * গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে বিস্তর গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

* * ইস্‌লাম কাহিনী পড়িয়া আমরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছি। * *

প্রবাসী (মাঘ, ১৩১৮)

যাহারা (ইস্‌লাম) [illegible]র মূলতত্ত্ব এবং ইতিহাসের সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা আমাদের ধন্য-

* ইস্‌লাম কাহিনীর প্রথম প্রবন্ধ মোহাম্মদ আরতি নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশি[illegible] মাসিকপত্র নবনূরে এই সমালোচনা হইয়াছিল।

বাদের পাত্র। * * সমালোচ্য পুস্তকে হজরত মোহাম্মদ কর্ত্তৃক ইস্‌লাম প্রবর্ত্তন হইতে খলিফাগণ কর্ত্তৃক ইস্‌লামের প্রচার ও সংরক্ষণের একটি সমগ্র ধারাবাহিক ইতিহাস ২৩ খানি বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক বাঙ্গালী হিন্দু মোসলমানের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য।

Amrita Bazar Patrika (January 29. 1912.)

We have read with interest the nice handy book Islam Kahini by Babu Rampran Gupta of Tangail. The style is lucid, fluent and faultless. The book ought to be in every library and in the hands of every pious Moslem in Bengal. The accounts narrated seem to us to be sacred heritage of every Mussalman.

সুপ্রভাত (জ্যৈষ্ঠ. ১৩১৯)

গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বেই মোগল বংশ প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়া ঐতিহাসিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইস্‌লাম কাহিনীতে মোহাম্মদ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের বিবরণ সরল এবং স্বচ্ছ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে পাঠকগণ প্রভূত জ্ঞান লাভ করিবেন।

মোস্‌লেম হিতৈষী (২রা চৈত্র, ১৩১৮)

রামপ্রাণ বাবু যে একজন সিদ্ধহস্ত ইতিহাস লেখক, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি মোগল বংশ এবং রিয়াজ উস সালাতিন প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় মোসলমান সমাজে বিশেষ

পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সুপক্ক লেখনী প্রসূত ইস্‌লাম কাহিনী সম্বন্ধে অধিক কথা লেখাই নিষ্প্রয়োজন।

চারুমিহির (৩রা বৈশাখ, ১৩১৯)

রামপ্রাণ বাবু সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; পাঠক ইস্‌লাম কাহিনীর সর্ব্বত্র তাঁহার সত্যানুরাগ এবং নিরপেক্ষ ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। বাস্তবিক ইস্‌লাম কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। * * * ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে ইস্‌লাম কাহিনী মনোরম; ইহা উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। রামপ্রাণ বাবুর লিপিশক্তি সামান্য নহে; তাঁহার ভাষায় আবিলতা বা কৃত্রিমতা নাই, তাহা সরল, স্বাভাবিক এবং বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। * * বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য,— রামপ্রাণ বাবুর ন্যায় কৃতি লেখকগণ ইহার সেবায় শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। ৩রা বৈশাখ ১৩১৯।

হজরত মোহাম্মদ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

দুইখানা উৎকৃষ্ট চিত্র সম্বলিত।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

এই গ্রন্থে মহাপুরুষ মোহাম্মদের পবিত্র জীবনের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত শিক্ষা লাভ হয়। হজরত মোহাম্মদ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিদ্যালয় সমূহের পুরস্কার ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত হইয়াছে।

রামপ্রাণ বাবুর পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস—
২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি, এ,
পাবলিসার এণ্ড বুকসেলার, ঢাকা।

কটন লাইব্রেরী—
ঢাকা।

শ্রীযুক্ত মহানন্দ বর্দ্ধন—
পোঃ আঃ মামুদনগর (টাঙ্গাইল)